প্রকাশক ঃ—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :—
শ্রীরাধারমণ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :—
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮

লেখিকার অন্যান্য বই ঃ—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব)

মুখপত্র

'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতে'র চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হল। প্রথম তিনটি পর্ব দেশ বিদেশের পাঠকবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় ও তাঁদের প্রেরণায় চতুর্থ পর্বটি লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জনা করবেন।

এই সংখ্যায় বাল্মীকির রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত ছাড়াও এ যুগের কয়েকজন প্রথিতযশা কবি মহাকবির রচনা সম্ভার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার রচনা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে চেষ্টা করেছি। অবশ্য আমার এই নতুন প্রয়াসের সফলতার বিচার পাঠকবৃন্দই করবেন।

সে যুগের মহাকবিদের সঙ্গে এ যুগেব মহাকবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য দেখানোই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নতুন ভাব ও কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তাঁরা এ দুই অমর মহাকাব্যকে যেন নতুন সজ্জায় সাজিয়েছেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান্ধারীর আবেদন' ও কবি নবীন সেনের 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' তিনটি খণ্ডকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশকে যে নব রূপ দিয়েছে—তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরে আমার গ্রন্থটিকে হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছি।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচয় সাপেক্ষ নন। কবি নবীন সেনও এ যুগের পাঠকদের নিকট অপরিচিত নন তাঁর স্বাদেশিকতা ও কাব্য প্রতিভার জন্য।

দীর্ঘ ৭৫ বৎসর পূর্বে কবি নবীন সেন তাঁর এই মহাকাব্য ত্রয়ে আর্য অনার্যের ভেদাভেদ মুছে ফেলবার যে প্রথম প্রয়াস ঘটিয়েছিলেন, তাঁরই উত্তর পুরুষদের বিংশ শতাব্দীতে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন তাঁর সেই প্রয়াসের প্রতিফলন বা অভিব্যক্তি। তাই এই মহাকাব্য হতে সে যুগ ও এ যুগের

চিন্তাধারার মধ্যেও যে সেতু বন্ধন আছে—তা উপলব্ধি করা যেতে পারে
সুভদ্রার মুখেই তিনি আর্য অনার্যের ভেদ মানুষের সৃষ্ট – তা প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন যুগে জন্ম নিয়েছেন বিভিন্ন কবি, মহাকবি। কিন্তু যুগধর্মের তারতম্যে একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তাঁদের কাব্যের মধ্যে ডেকে এনেছেন প্রকাণ্ড বিপ্লব। তাই বাল্মীকি, কৃত্তিবাসের রাক্ষস রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ মাইকেল মধুসূদনের কলমে এমন ভাবে চিত্রিত হয়েছে—সেখানে তাঁদের পাশে দেবতা রাম লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

তেমনি সে যুগের মহাকবিদের লেখনীতে 'সরমা' 'সুভদ্রা' চরিত্র উপেক্ষিত হলেও মহাকবি মধুসূদন দত্ত ও কবি নবীন সেনের তুলিতে তাঁরা এক অনুপম রূপে পাঠকদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়েছেন। তাই যুগের পরিবর্তনে কবিদের চিন্তাধারার বিবর্তনে চরিত্র সৃষ্টির মাধুর্য যে কি অপরূপ রূপ নেয় তার ছিঁটেফোঁটা উদাহরণ দেবার প্রলোভন আমি সংযত করতে পারিনি।

আশা করি বিভিন্ন কবির কল্পনা অবলম্বনে আমার চরিত্রগুলির চিত্রায়ণে যে বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে তা আমার প্রিয় পাঠকদের আনন্দ দেবে। তাঁদের কাছে সুখপাঠ্য হয়ে উঠবে আমার এই ক্ষুদ্র বইটি।

হয়ত অনেক সমালোচক এই কবিদের কাব্যকে নিছক কল্পনার প্রক্ষেপণ বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন। কিন্তু আজ অবধি কোনটি মূল রামায়ণ বা মহাভারত বা কোন অংশটুকু প্রক্ষেপণ তা হলফ্ করে কেউ বলতে পারেননি সংস্কৃত সাহিত্যেও অনেক কবি রামায়ণের বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে গছেন। ভবভূতির উত্তররামচরিত্র ও রাম চরিত্রে বাল্মীকি রামায়ণের রাম চরিত্র হতে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। তাই যদি হয়—তবে এ যুগের কবি, মহাকবিদের চিন্তাধারায় রামায়ণ মহাভারতের যে বিবর্তন ঘটেছে—তা'তো যুগের দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকৃত দর্পণ। সুদূরপ্রসারী কল্পনা অবলম্বনে তাঁরা যে দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের মধ্যে মানবতার মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বা আর্য অনার্যের ভেদাভেদে যবনিকা টানবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন—তারই সার্থকতা কি বর্তমান যুগে লক্ষণীয় নয়?

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

মহাভারত রামায়ণও কবিদের রচনার সনাতন উৎস। এই দুই কাব্য নিয়ে

পূর্বে অনেক রচনার সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অতএব কোন কবির রচনাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা স্পর্ধা মাত্র।

তাই বলছি বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিভিন্ন যুগের কবি মহাকবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে চরিত্রচিত্রণে যে বিচিত্রতা দেখিয়েছি—এটাও আমার গ্রন্থের অন্যতম অভিনবত্ব।

আমার প্রথম তিন পর্বের সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে স্বামী প্রণবানন্দের প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবা সঙ্ঘের 'প্রণব' পত্রিকায় তা উদ্ধৃত করলাম।

শিপ্রা দত্ত

গান্ধারী ও মন্দোদরী

What is the worst of woes that wait on age? What stamps the wrinkle deepen the brow?—To view each loved one blotted from life's page, and be alone on earth—Byron.

দুর্যোধনের জননী, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ও ইন্দ্রজিতের মাতা, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী যেমন নারী জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার চরম সোপানে উঠেছিলেন, তেমনি দুঃখ দৈন্যের শেষ স্তরে পড়ে মর্ত্যে তাঁদের জীবনের লীলা খেলার যবনিকা পড়ে। সুখে যেমন তাঁরা সমান ছিলেন, দুঃখেও তাঁরা সম দুঃখিনী। ইংরেজ কবি George Gardon Noel Byron এর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই দুই রাজমহিষীর জীবন কাহিনীতে পাওয়া যায়। রাজ ঐশ্বর্য রাজমহিষীর সব প্রকারের সম্মান, শত পুত্রের জননী, বহু পৌত্র পৌত্রী দ্বারা সমাবৃত গান্ধারীর রাজসংসার যেন বিধাতার অভিশাপে এক ফুৎকারে বিলীন হয়ে গেল। গান্ধারী ও তাঁর অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে নিয়ে চলার জন্য তাঁদের আদরের শত সন্তান ও বহু পৌত্র ও জামাইর কেউ-ই অবশিষ্ট রইল না। তেমনি রাক্ষসরাজ রাবণের প্রধান মহিষী মন্দোদরীর শত শত পুত্র পৌত্র সকলেই প্রাণ হারিয়েছিল লঙ্কার যুদ্ধে। তাই উভয়েরই জীবন সায়াহ্নে জীবন পাতা শূন্য হয়েছিল। একমাত্র বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্র ব্যতীত গান্ধারী হারিয়েছিলেন আপন অন্য সব প্রিয়জনদের। বংশে তাঁর দেউটি জ্বালাবার আর কেউ ছিল না। তেমনি মন্দোদরী হারিয়েছিলেন স্বামী সহ সব সন্তানদের। রাবণ বংশে আর কেউ

ছিল না। উভয়েই প্রিয়তম সন্তানদের হারিয়ে লুপ্ত বংশের শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প বিহীন একটি জরাজীর্ণ কাণ্ডের মতই যেন তাঁরা জীবিত ছিলেন। জীবন সন্ধ্যায় এর চেয়ে অধিকতর দুঃখ আর কি হতে পারে?

বীর ভীম যখন গান্ধারীর নিকট দুঃশাসন ও দুর্যোধনকে বধ করে তাঁদের নিষ্ঠুর আচরণের দোহাই দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছিলেন তখন গান্ধারীর বেদনাবিধুর হৃদয় মথিত করে যে কান্না আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার রেশ আজও পাঠকদের কানে বাজে। সর্বহারা গান্ধারী খেদ করে বলেছিলেন—

> বৃদ্ধস্যাস্য শতং পুত্রান্ নিঘ্নংস্ত্বমপরাজিতঃ।
> কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাল্পমপরাধিতম্॥
> সন্তানমাবয়োস্তাত বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।
> কথমন্ধদ্বয়স্যাস্য যষ্টিরেকা ন বর্জিতা। (স্ত্রী) ১৫।২১-২২

—এই বৃদ্ধের শত পুত্রকে বধ করার সময়ে অল্প অপরাধ করেছে এমন কোন একজনকে তুমি বাঁচতে দিলে না। আমরা উভয়েই বৃদ্ধ। আমাদের রাজ্যও হরণ করেছ, আমাদের এই অবস্থায় অন্ধের যষ্টির মত আমাদের একটি ছেলেকে কেন অব্যাহতি দিলে না?

কবি Byron যেন সমদুঃখী, তাই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জীবন পাতা থেকে প্রিয়জনকে একে একে হারিয়ে যেতে দেখা মানব জীবনের চরম দুঃখ। রানী মন্দোদরীও স্বামী পুত্র হারিয়ে এরূপ ভাবে কেঁদেছিলেন।

মহাভারত মহাকাব্যে গান্ধারীর ও রামায়ণ মহাকাব্যে মন্দোদরীর জীবনে দুর্ভাগ্যের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং উভয়ের দুরাদৃষ্টের জন্য দায়ী তাঁদের স্ব স্ব স্বামী ও পুত্রগণ।

গান্ধারী গান্ধার রাজা সুবলের কন্যা ও কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী দুর্যোধনাদি শত পুত্রের জননী।

মন্দোদরীর মা হেমা নামে অপ্সরা, বাবা ময়দানব। মন্দোদরী

রাক্ষসরাজ রাবণের রাজমহিষী। গান্ধারী রাজ্ঞী না হয়েও রাজ্ঞীর সম্মানে অধিষ্ঠিতা, তিনি রাজমাতা।

Purity of heart is the noblest inheritance, and love the fairest ornament of women—Claudius

রোমান সম্রাট Marcus Aurelius Claudius এর এই উক্তিটি যেন গান্ধারীর চরিত্রের অভিজ্ঞান পত্র। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্য্য তাঁকে রাজরাণীর গৌরবের চেয়েও অধিকতর মহীয়সী করেছিল।

ধর্মশীলা গান্ধারীর কথা ব্যাসদেব প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে গান্ধারী শতপুত্রের জননী হবেন এই বর লাভ করেন গান্ধারীর এ বর প্রাপ্তির কথা শুনে ভীষ্ম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন।

গান্ধারী যখন শুনলেন জন্মান্ধ রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির তখন তিনি স্বেচ্ছায় একখণ্ড পট্টবস্ত্র পুরু করে ভাজ করে নিজের দৃষ্টি শক্তিকে অবরুদ্ধ করলেন এই মহৎ উদ্দেশ্যে যেন তিনি পতিব্রতা হয়ে থাকতে পারেন। নিজে চক্ষুষ্মতী ও স্বামী চক্ষুহীন—এ প্রভেদ যেন কোন সময়ে তাঁর মনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা না জাগায়।

গান্ধারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। তাঁর বিচিত্র জীবনের এই বৈশিষ্ট্য এই মানবীকে দেবীর আসনে বসিয়েছিল।

গান্ধারী ও মন্দোদরী উভয়েই কঠোর পূজা ব্রতাদির দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদে বহু সন্তানের জননী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বামী পুত্রদের অধর্ম ও অন্যায়ের পথে বিচরণের ফলে জীবন সন্ধ্যায় উভয়ে নিঃসন্তান হয়ে চোখের জলে মেদিনী ভাসিয়েছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে কবি গান্ধারী চরিত্র অন্য ভাবে এঁকেছেন। কুমারী অবস্থা হতেই গান্ধারীর সন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল, যার

জন্য তিনি মহাদেবের পূজা করে শত পুত্রের বর লাভ করেন। বিবাহোত্তর জীবনেও তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার অনুবৃত্তি পাওয়া যায়।

ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল সুতা॥
তাঁর সেবাবশে বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষযুত।
মহা বলবান্ স্বামী সমান,
পাইবা শতেক সুত॥ (আঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতেও আছে গান্ধারীর সেবায় তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে বর দিতে চাইলে, গান্ধারী তাঁর পতির ন্যায় শত পুত্রের বর প্রার্থনা করে ছিলেন। (সা বব্রে সদৃশ ভর্ত্তুঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ।)

যথাসময়ে তিনি সন্তান সম্ভবা হলেন। কিন্তু দুবছরেও তাঁর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না। অন্য দিকে কুন্তী একটি পুত্র লাভ করেন। এই সংবাদে গান্ধারী ঈর্ষা বশতঃ নিজের উদরে আঘাত করে গর্ভপাত করবার চেষ্টা করেন। নিজ মুখে ব্যাসদেবের কাছে তা তিনি স্বীকারও করেছেন। কুন্তীর প্রতি গান্ধারীর এইরূপ ঈর্ষার দৃষ্টান্ত কাশীদাসী মহাভারতে অন্যএও দেখা যায়।

গান্ধারীর গর্ভপাতের ফলে লোহার ন্যায় কঠিন একটি মাংস পিণ্ড ভূমিষ্ঠ হলো। তিনি তা ফেলে দিতে উদ্যত হলে, এমন সময় ব্যাসদেব এসে বললেন, তাঁর বাক্য কখনো মিথ্যে হবে না। তাঁর উপদেশে গান্ধারী ঐ মাংসপিণ্ড শীতল জলে ডুবিয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গুষ্ঠ পর্ব প্রমাণ এক শত একটি ভ্রূণ পৃথক হল। সেই ভ্রূণগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্ম গ্রহণ করলেন। এক মাসের মধ্যে তাঁর এক শত পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করল। এই কন্যার নাম দুঃশলা। দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথ।

কাশীদাসী মহাভারতে গান্ধারী চরিত্রে হিংসা ঈর্ষা স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। কুন্তীকে একদিন স্বয়ম্ভূর পাষণ লিঙ্গকে পূজা করতে দেখে ঈর্ষা দগ্ধ গান্ধারী বলেছিলেন :—

রাঁড়ি এত গর্ব তোর।
কিমতে পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি॥ (বিঃ)

তখন কুন্তী এবং কুন্তী পুত্ররা চিরকাল তাঁদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত। এমন কি কুন্তীর দেবতার পূজাতে গান্ধারী অসহিষ্ণু। কুন্তী জানালেন যেদিন হতে তিনি কুরু কুলের বধূ হয়ে প্রবেশ করেছেন, সেদিন হতেই তিনি পূজা করছেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সকলেই তা জানেন। তা সত্ত্বেও গান্ধারী তাঁর ফল-ফুল ছুঁড়ে ফেলে শাসিয়ে বললেন, যেন ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি শিব পূজা করবার স্পর্দ্ধা না করেন।

গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার॥
সবাকার অনুমতি পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে॥
দূর কর ফল পুষ্প যাহ এথা হতে।
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে॥ (বিঃ)

গান্ধারীর এরূপ অন্যায় দাবী যেন শূলপাণিও সহ্য করতে পারলেন না। তিনি স্বয়ং এ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে জ'নালেন তাঁদের দুজনার মধ্যে যিনি পরদিন সর্ব প্রথম সহস্র সুগন্ধী সুবর্ণ চাঁপা দিয়ে তাঁর পূজা করতে পারবেন, তিনিই ঐ রাজ্যের রাজমাতা হবেন।

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
(কুন্তীকে) মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস॥

নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চাম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন। (বিঃ)

পরাশ্রিতা বিধবা কুন্তীর প্রতি গান্ধারীর এই রূপ আচরণ কেবল নিষ্ঠুরই নয়, অশোভনও বটে। গান্ধারীর ধারণা শূলপাণির সর্ত্ত দরিদ্র কুন্তীর সামর্থ্যের বাইরে। তাই গর্বে তিনি উৎফুল্ল। এবং পরিহাস করে কুন্তীকে বললেন, মহেশ্বর এখন তোমারই হলো। অর্থাৎ গান্ধারী রাজজননী আর কুন্তী স্বামী হীনা কুরু গুরু আশ্রিতা। সহস্র স্বুবর্ণ চাঁপা যোগাড় করা কুন্তীর পক্ষে অসাধ্য। গান্ধারী পুত্র দুর্যোধনকে সহস্র স্বর্ণ চাঁপা যোগাড় করার আবদার ধরলেন ;—

শুনি দুর্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কর্মিগণ॥
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ॥ (বিঃ)

গান্ধারীর আদেশে দুর্যোধন ভাণ্ডার হতে শত মণ স্বর্ণ মণি মুক্তা বের করে দিলেন এবং সহস্র সহস্র কর্মীকে কণক চাঁপা তৈরীর কাজে নিযুক্ত করলেন।

অন্য দিকে দুঃখিনী কুন্তী বিষাদ সাগরে মগ্ন। স্বুগন্ধী সহস্র কণক চাঁপা যোগাড় তাঁর পক্ষে স্বপ্ন মাত্র। পুত্ররা খেতে এসে দেখলেন জননী রন্ধন করেননি। তাঁদের কথারও কোন প্রত্যুত্তর মাতা দিচ্ছেন না। অর্জুন কুন্তীর পায়ে ধরে অনেক মিনতি করলে, অবশেষে তিনি তাঁর দুঃখের কারণ পুত্রদের জানালেন।

উত্তরে অর্জুন বলেন—

............মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা॥
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হতে দিবে কোথা পাবে ধন॥ (বিঃ)

অর্জুন সহস্র কণক চাঁপা এনে দেবেন মাকে কথা দিলেন। অর্জুনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে জননী কুন্তী রন্ধন করে সন্তানদের খেতে দিলেন নিজেও গ্রহণ করলেন। অবশেষে প্রভাতে অর্জুন :—

বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি ॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
সুগন্ধী কণক-পদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥
বাহির ভিতর আর দেউল উদ্যান।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল নাহি রাহ স্থান ॥ (বিঃ)

উপরোক্ত মতে অর্জুন শিব মন্দিরকে কণক চম্পকময় করে দিলেন। প্রসন্ন মনে কুন্তী ভোরে সর্বাগ্রে মহেশের পূজা সম্পন্ন করলেন।

তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে (কুন্তী) বব দিল ॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কব মম পূজা ॥
পরে ... ... প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কণক পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥
কুসুম চন্দন আর বহু উপহারে।
নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে ॥
শিরের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত ॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষন্ন বদন। (বিঃ)

কুন্তীকে গান্ধারী জিজ্ঞেস করলে কুন্তী জানালেন এই ফুল দিয়ে তিনি শিবের পূজা সাঙ্গ করেছেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বর দিয়ে নিজের জায়গায় মহেশ্বর ফিরে গেছেন।

শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প জলে ফেলে।
গৃহে গিয়া পুত্রগণে অতি মন্দ বলে॥
সাধু কুন্তী সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল॥ (বিঃ)

এখানে গান্ধারীকে একেবারে হিংসার প্রতি মূর্ত্তি করে চিত্রিত করা হয়েছে। সাধ্বী কুন্তীর প্রতি রূঢ় হয়ে তিনি নিজ পুত্রদের পরাজয়ের গ্লানি মিটালেন। কাশীদাসী মহাভারতে গান্ধারী চরিত্রে এইরূপ কালিমা লেপনের কোন হেতু নির্ণয় করা যায় না। বেদব্যাসের মহাভারতে এইরূপ কোন কাহিনীর উল্লেখ নেই। সুতরাং এইটি সম্পূর্ণ কবি কল্পনা মাত্র ও প্রক্ষেপণ। কুন্তী পাণ্ডব জননী এবং পাণ্ডবরা সর্বজন প্রিয়। হয়ত সেইজন্যই কাশীদাসও একটু পক্ষপাত করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ এই জন্য তাঁর জীবিতাবস্থায় দুর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন। দুর্যোধন চরিত্রে দেখা গেছে, সারা জীবন তিনি পাণ্ডবদের হিংসা ঈর্ষ্যা করেছেন। পরশ্রীকাতর দুর্যোধন পাণ্ডবদের কোন প্রকার প্রাধান্য সহ্য করতে পারেননি। দুর্যোধনের এই ঈর্ষ্যার কারণ তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী চরিত্রে সত্য ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রকার ঈর্ষ্যা, হিংসা বা নীচতার স্থান ছিল না।

Victor Hago র—Man have sight, women insght. গান্ধারী ও মন্দোদরী সম্বন্ধে এই সুচিন্তিত অভিমত খুবই প্রযোজ্য।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর সুহৃদবর্গের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র যখন কুন্তী ও নববধূ দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনলেন, তখন দ্রৌপদীকে দেখে গান্ধারী দিব্য চোখে যেন দেখেছিলেন—

পুত্রাণাং মম পাঞ্চালী মৃত্যুরেবেত্যমন্যত। (আঃ) ২০৬।২২

—এই পাঞ্চালী আমার পুত্রদের যেন মৃত্যুর কারণ মনে হচ্ছে।

দ্রৌপদীর রূপবহ্নিতে যেন গান্ধারীর পুত্ররা ভস্মীভূত হবেন

তিনি পূর্বাহ্নেই তা অনুমান করেছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে সন্তানদের দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে রাখবার জন্য বিদুরকে বলেছিলেন—

কুন্তীং রাজসুতাং ক্ষত্তঃ সবধূং সপরিচ্ছদাম্।
পাণ্ডোর্নিবেশনং শীঘ্রং নীয়তাং যদি রোচতে॥

... ...

যথাসুখং তথা কুন্তী রংস্যতে স্বগৃহে সুতৈঃ॥ (আঃ) ২০৬।২২

—হে ক্ষত্ত, তুমি যদি উচিত মনে কর তবে পোষাক পরিচ্ছদে বিভূষিত করে বধূর সঙ্গে কুন্তীকে শীঘ্রই পাণ্ডুর প্রাসাদে নিয়ে যাও, যাতে সে ভাবতে পারে যে পুত্রদের সঙ্গে নিজের গৃহেই বাস করছে।

এখানে কেবলমাত্র গান্ধারীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যত্র ধৃতরাষ্ট্র কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন নয়, তাঁর অনুভূতিও যেন ছিল না। গান্ধারী অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তা পারেন নি।

গান্ধারী ও মন্দোদরী উভয়েই বংশ নাশের ভয়ে গর্হিত কর্ম হতে নিজ নিজ স্বামী পুত্রদের নিরস্ত করতে প্রভূত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্র স্নেহ এবং অদম্য লোভ এবং রাবণের ধর্মে বিমুখতা ও কামান্ধতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে উভয়েই নির্বংশ হয়েছিল।

রাবণ যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন মন্দোদরীও এই কুলক্ষয় সংগ্রাম হতে স্বামীকে বিরত হতে বলেছিলেন।

আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ থাকুক গৃহবাস॥ (লঃ)

মেয়েদের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা পুরুষদের থেকে বেশী।

ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই জন্মান্ধতার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ঈর্ষণীয় প্রতিপত্তি

দুর্যোধনকে সুস্থির হয়ে রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত করেছিল। মাতুল শকুনির কুপরামর্শে পাণ্ডবদের পাশা খেলায় হারিয়ে যখন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য পণে লাভ করছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের জয়ে আত্মহারা, কেবল জিজ্ঞাসা করছিলেন, এবার কি জয় করা গেল? এবার কি জয় করা গেল?

পুত্র স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের জয়ের পৈশাচিক উল্লাসে যখন উন্মত্ত প্রায়, তখন জননী গান্ধারী অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে অন্তঃপুরে শোকাতুরা হয়ে ক্রন্দনরতা। কি রকম বিপরীত ছবি !!!

এখানে ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর পাশে গান্ধারীর ধর্মের প্রতি গোঁড়ামি স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে এক প্রকাণ্ড ব্যবধান নির্দেশ করে। ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী মিলন যেন দুই বিপরীত চরিত্রের সহ অবস্থান।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হতে প্রতীতি জন্মে যে ধৃতরাষ্ট্র স্বভাবতঃ ধর্মজ্ঞান বর্জিত, হিংসা ঈর্ষার দ্বারা তাঁর মন পরিপূর্ণ। কিন্তু অধর্মের সঙ্গে গান্ধারী কখনও আপোষ করেন নি। তাই জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে ধর্মনিষ্ঠা গান্ধারী বললেন 'যতো ধর্ম স্ততোজয়ঃ'। ছেলেকে আশীর্বাদ করে বলতে পারলেন না, 'তোমার জয় হোক'।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে কেশাকর্ষণ করে বলপূর্বক টেনে আনলেন এবং কর্ণের নির্দেশে দুঃশাসন তাঁকে বিবস্ত্র করবার জন্য সবলে তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন, তখন পুত্রদের পাপকর্মের জন্য তাঁদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছবি যেন গান্ধারীর মানস পটে ফুটে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে অশুভ লক্ষণ ও শব্দ তাঁকে অস্থির করে তুললো। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে দ্রৌপদীকে বর দিয়ে শান্ত করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর আর্ত কণ্ঠ আমরা পুনরায় শুনলাম যখন দুর্যোধনের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাণ্ডবদের পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত।
নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংসনঃ ॥ (সঃ) ৭৫।২

—দুর্যোধন জন্মাবামাত্রেই মহামতি বিদুর বলেছিলেন যে এই পুত্র কুল নাশক হবে। সুতরাং ইহাকে এখনই পরলোকে প্রেরণ করা উচিত।

এই পুত্র জন্ম গ্রহণের পরই শৃগালের মত কর্কশ কণ্ঠে ডেকেছিল। সুতরাং এই পুত্রের জন্য সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস হবে।

মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টনামভিমংস্থা মতিং প্রভো ॥ (সঃ) ৭৫।৪

—হে ভারত, তুমি নিজ দোষে মহাসাগরে নিমজ্জিত হোয় না। হে প্রভু, তুমি অশিষ্ট এই বালকদের বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিও না।

মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।
বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্ ॥
(সঃ) ৭৫।৫

—তুমি স্বয়ং এই কুলের ভয়াবহ বিনাশের কাবণ হইও না। বদ্ধ সেতুকে কে বিনাশ করতে চায় ও শান্ত অগ্নিকে কে প্রজ্জলিত করতে চায়।

পাণ্ডবরা শান্ত হয়েছে, আবার কেন তাদের ক্রুদ্ধ করছ? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারনি, এখন তার ফলে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

The intuitions of women are better and readier than those of men; her quick decisions without conscious reasons, are frequently for superior to a man's most carefnl deductions—ইংরেজ শিল্পী William Aikman এর এই উক্তিটি যেন গান্ধারী চরিত্রের এক নির্ভুল সমীক্ষা।

দূরদর্শিনী এই নারী কুরুবংশের সমুহ বিপদের আশঙ্কার সঙ্কেত

তাঁর স্বামীর গোচরে আনলেন। এমন কি ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্কার দিতেও তিনি কোন কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ।
ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন॥ (সঃ) ৭৫।৭

—শাস্ত্র দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে শাসন করে কখনও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে বা অক্যাণের পথ হতে নিবৃত্ত করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে রাজা, বৃদ্ধের বালবুদ্ধি অর্থাৎ বালকদের ন্যায় দুষ্টবুদ্ধি হওয়া কখনই উচিত নয়।

ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষু।
তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ॥
তথা তে ন কৃতং রাজন পুত্রস্নেহান্নরাধিপ।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় যৎ॥ (সঃ) ৭৫।৮-৯

—আমার মত অনুসারে এই কুল কলঙ্ককে ত্যাগ কর। হে রাজন্. পুত্র স্নেহে তুমি তা না করাতেই এখন কুলক্ষয়কর ফল প্রাপ্ত হচ্ছ। তুমিই পুত্রদের চালাও। তারা যেন তোমাকে পরিচালনা না করে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখে বিদীর্ণ হৃদয়ে তোমার পুত্ররা সম্পদ লাভ করলে তোমাকেও পরিত্যাগ করতে পারে সুতরাং তুমি আমার কথায় এই কুলাঙ্গার পুত্রকে পরিত্যাগ কর।

হে নরপতি, তুমি যদি পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আমার কথানুসারে কাজ না কর, তুমি কুলনাশের জন্যই কাজ করছ বুঝতে হবে। তাহলে তার ফলও অচিরেই লাভ করবে।

কাশীদাসী মহাভারতে গান্ধারী বলেছেন—

বৃদ্ধ হৈয়ে তুমি কেন হও অল্পমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন॥

মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র-বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে॥
ধনে বংশে বৃদ্ধ হইয়াছে হে রাজন।
সর্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর কেন কাজ।
পশ্চাতে কি হৈবে নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্মে অর্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
... ...
মহাদুঃখ পায় প্রভু কহি যে তোমারে।
পুন আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে॥ (সঃ)

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করে আরও বলেছিলেন—তোমার শান্তি, ধর্ম ও ন্যায় বুদ্ধি জাগ্রত হোক। তুমি প্রমাদগ্রস্ত হও না। অন্যায় ভাবে যে লক্ষ্মী লাভ হয়, তা সমূলে ধ্বংস করে। প্রথমতঃ তিনি মৃদু থাকলেও ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পুত্র পৌত্রাদিকেও তিনি ধ্বংস করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অতি বিনীতভাবে পাণ্ডবদের পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করতে বারণ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গান্ধারীর আবেদনে" গান্ধারীর বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

গান্ধারী কুপুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে বললে, ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিয়েছিলেন, ধর্ম যে লঙ্ঘন করেছে, ধর্মই তাকে শাসন করবে। কিন্তু তিনি পিতা কি করে সন্তানকে ত্যাগ করবেন ?

ধৃতরাষ্ট্রের এড়িয়ে চলা জবাবে ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধারী বললেন—

মাতা আমি নহি ? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ড তলে বহি নাহি তারে ?
... ...
বহু বর্ষ ছিল না সে আমাকে আঁকড়ি

তুই ক্ষুদ্র বাহু বৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ ? তবু কহি মহারাজ,
এই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

পিতার চেয়েও সন্তানের উপর মাতার দাবী অধিক কেন সুন্দর ভাবে কবি এখানে গান্ধারীর মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজের অনু পরমানু দিয়ে যে সন্তানকে জননী কেবল জন্মই দেননি, কত স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বড় করে তুলেছেন, অতি আদরের হলেও কুপুত্র বলে তাকে ত্যাগ করতে স্বামীকে অনুরোধ করতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করছেন না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—কী রাখিব তারে ত্যাগ করি ?
গান্ধারী —ধর্ম তব।
ধৃতরাষ্ট্র —কী দিবে তোমার ধর্ম ?
গান্ধারী — দুঃখ নব নব
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পাণে
জিনি লয়ে চিরদিন রহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?

এত সহজ সরল ভাবে এমন অপূর্ব সত্য কবি গান্ধারীর মুখে দিয়েছেন। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন যদিও ধর্মের পথ যে পিচ্ছিল, কণ্টকপূর্ণ, তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। অধর্মের সঙ্গে ধর্মের সন্ধি কখনও সম্ভব নয়।

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র, স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।

ছল লব্ধ পাপস্ফীত রাজ্য ধন জনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখ ভার
করুক বহন।

এখানে গান্ধারীর এক করুণ ব্যাকুলতার ছবি আমরা দেখতে পাই। সন্তানকে বিষের নাড়ু নিয়ে খেলতে দেখলে স্নেহময়ী জননী যেমন ছুটে যেয়ে তা কেড়ে নিয়ে শিশুকে কাঁদান, গান্ধারী ও তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে স্নেহময়ী জননীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললেন।

পাপলব্ধ ঐশ্বর্য্য যা ছল চাতুরীর দ্বারা লাভ করা হয়েছে তা পেয়ে পুত্র দুর্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল। দুর্যোধনকে ঐ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে দিতে নিষেধ করে গান্ধারী পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁকেও (দুর্যোধন) নির্বাসনে পাঠাবার জন্য উপদেশ দিলেন।

কি সুন্দর ভাবে জননী বলছেন—

কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে

দুরাত্মা পুত্রকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তাকে অধর্মের আশ্রয় থেকে ধর্মের পথে টেনে আনবার জন্যই দুঃখী মাতার ভারাক্রান্ত হৃদয় ব্যাকুল ও উদ্বেলিত।

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে বললেন—

তুমি রাজা রাজ—অধিরাজ,
বিধাতার বাম হস্ত ; ধর্মরক্ষা কাজ
তোমা—'পরে সমর্পিত, শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কী তাহার করিবে বিধান ?
ধৃতরাষ্ট্র জানালেন—নির্বাসন দণ্ড।

জোর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যদি পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে অপরাধী পুত্রের বিচার না করেন তবে এতকাল তিনি রাজবিচারে যাদের দণ্ড দিয়েছেন সেই দণ্ডের যাতনা দণ্ডদাতাকে ভোগ করতে হবে।

এ যুগের কবি গান্ধারীকে আদর্শ করে কেবল কুপুত্রদের জন্য জননীর ব্যথার ভাষা দেননি, লজ্জায় প্রপীড়িত জননী-হৃদয়ের এক নিখুঁত ছবিও এঁকেছেন।

ঐ যুগের কবি বেদব্যাসের গান্ধারী চরিত্রকে এ যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বলিষ্ঠ রূপ দিয়ে যুগোপযোগী করে চিহ্নিত করেছেন। কবির গান্ধারী নির্ভীক, ন্যায় ও ধর্মের এক একনিষ্ঠ পূজারী, স্পষ্টবাদী এবং যথার্থই পূজার্হ। ধিক্কৃত করেছেন তিনি রথী মহারথীদের।

কিন্তু গান্ধারীর কাতর অনুরোধ, অকাট্য যুক্তি ও সব সাধু পরামর্শ উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কুলের অন্ত বা ধ্বংস হোক, আমি তা নিবারণ করতে পারবো না। আমার পুত্রদের ইচ্ছা মত কাজ হোক, পাণ্ডবরা ফিরে আসুক এবং আমার পুত্ররা পাণ্ডবদের সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলা করুক।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের চরিত্রের কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য? একজন দৃঢ়ভাবে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে অপরাধী নিজ সন্তানের নির্বাসন দণ্ড চাইতে কুণ্ঠিত নন। অন্য জন 'যা ঘটবে তা ঘটবে' এ প্রবচনের উপর নির্ভর করে ধর্মাধর্ম নির্বিচারে পথ চলেছেন। একজন জেনে শুনে পায়ে পায়ে অধর্মের দিকে এগিয়ে চলেছেন। অন্যজন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য আত্মজকে নির্বাসন দিতেও দ্বিধা করছেন না। নারী চরিত্র স্বভাবতঃ কোমল ও সন্তান স্নেহে অন্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিপরীত দৃশ্য। সন্তান স্নেহে গান্ধারীর মাতৃ-হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও সংসারের রাজ্যের ও অন্যান্য সন্তানদের মঙ্গলের জন্য পাপী দুর্যোধনকে বর্জন করবার জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ

দিচ্ছেন। কিন্তু সন্তান স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অধর্ম করছেন জেনেও, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন একমাত্র পুত্র দুর্যোধনের আবদারে।

বনবাসের প্রতিশ্রুত ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে, পাণ্ডবরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন দ্রুপদ রাজার পুরোহিতের মাধ্যমে। দুর্যোধন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের অভিমত জানতে পাঠালেন। সঞ্জয় ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র গোপনে তাঁর থেকে উভয় পক্ষের সৈন্যের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সঞ্জয় বললেন, নির্জনে আপনার কাছে কিছু বলব না। কারণ আপনি ঈর্ষ্যা দমন করতে পারছেন না। মহর্ষি ব্যাসদেব এবং গান্ধারীর সামনে আপনাকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের অভিপ্রায় জানাতে পারি। কারণ তাঁরা ধর্মজ্ঞ ও বিবেকী।

সঞ্জয়ের এই অভিমত নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা গান্ধারীই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ঠে সকলের কাছে অধিকতর সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন।

অবশেষে সঞ্জয় সর্বসমক্ষে জানালেন যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে জানিয়েছেন শান্তিই তাঁদের কাম্য, তবে অর্দ্ধরাজ্য অথবা পাঁচ ভ্রাতাকে অন্ততঃ পাঁচটি গ্রাম দিতে হবে। অন্যথা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্যই তাঁরা প্রস্তুত।

সঞ্জয়ের মুখে নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জুনের শক্তির কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে দুর্যোধনকে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হতে বললেন। কিন্তু দুর্যোধন সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বললেন—তোমার দুর্জন পুত্র গুরুজনদের কথা না শুনে অধঃপাতে যাচ্ছে।

ধ্বংসের মুখে পৌছে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের হুঁশ হয়েছে গান্ধারীর দুর্জন পুত্র অধঃপাতে যাচ্ছে। এদ্দিন পুত্ররা তাঁরই পুত্র ছিল। এখন যখন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে এসেছে, তখন তোমার (গান্ধারীর) দুর্জন পুত্র।

গান্ধারী দুর্যোধনকে বললেন—

ঐশ্বর্য্যকাম দুষ্টাত্মন বৃদ্ধানং শাসনতিভা।
ঐশ্বর্য্য জীবিতে হিত্বা পিতরং মঞ্চ বল্লিশ॥
বর্দ্ধয়ন্ দুহৃর্দাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্।
নিহতো ভীমসেনেন স্মার্ত্তাসি বচনং পিতুঃ॥ (উঃ)

—হে বৃদ্ধদের শাসন অতিক্রমকারী, ঐশ্বর্য্যকামী দুষ্টাত্মা, তুমি ঐশ্বর্য্য, জীবন, পিতা এবং আমাকেও হারাবে। শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করে আমাকে শোকানলে দগ্ধ করবে, ভীমসেনের হাতে যখন নিহত হবে, তখন পিতার বাক্য স্মরণ করবে

জননী হয়ে এরূপ স্পষ্ট তিরস্কার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের শেষ চেষ্টা করবার জন্য কৃষ্ণ হস্তিনায় কুরু সভায় উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণের হিতোপদেশ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রের শান্তির বাণী সবই ব্যর্থ হল।

উপায়ান্তর না দেখে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে রাজসভায় আনবার জন্য বিদুরকে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্রের ধারণা ধর্মশীলা গান্ধারী পুত্র দুর্যোধনকে সুপথে ফেরাতে পারবেন।

উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করছে যে ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীর প্রবলতর শক্তির কথা জ্ঞাত ছিলেন।

অবাধ্য অশিষ্ট লোভী পুত্র সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করে সভাগৃহ ত্যাগ করেছে—এ খবর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানতে পারলেন। তিনি দুর্যোধনকে শীঘ্র আনবার জন্য আদেশ দিলেন। অধার্ম্মিক অশিষ্ট ব্যক্তি কখনও রাজ্য লাভ করতে পারে না। তথাপি এই দুর্বিনীত রাজ্য লাভ করছে। তিনি স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বললেন—

আপ্তু্মাপ্তং তথাপীদমবিনীতেন সর্বথা।
ত্বং হেবাত্র ভৃষাং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ॥
যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞামনুবর্ত্তসে। (উঃ) ১২৯।১১

—মহারাজ, তোমার এই পুত্রই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেইজন্য

বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য তুমিই ভর্ৎসনার যোগ্য। কারণ তুমি তার অভিপ্রায় পাপপূর্ণ জেনেও সর্বদা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছো বা অনুসরণ করেছো।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর এ রকম কটাক্ষ উপস্থিত পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণে তিনি সক্ষম এ সত্যই প্রকাশ করে।

অশক্যঃস্থ ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্ত্তয়িতুং বলাৎ।
রাষ্ট্রপ্রদানে মূঢ়স্থ বালিশস্থ দুরাত্মনঃ॥ (উঃ) ১২৯।১৩

—মূঢ়, দুর্জন পরিবেষ্টিত এই দুরাত্মাকে তুমি রাজ্য সমর্পণ করায় আজ তোমাকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

দুর্যোধন তাঁর আদেশে সভাকক্ষে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে বললেন—

দুর্যোধন যদাহ ত্বাং পিতা ভরতসত্তম।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ ক্ষত্তা সুহৃদাং কুরু তদ্ বচঃ॥ (উঃ) ১২৯।২০

—দুর্যোধন, ভারত শ্রেষ্ঠ তোমার পিতা, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও বিদুর তোমার এ সমস্ত সুহৃদ তোমাকে যা বলেছেন, তুমি তাঁদের কথা গ্রহণ কর।

কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে রাজ্য প্রাপ্তি, রক্ষা বা উপভোগ করতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে জয় করে না, সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যভোগ করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মনকে জয় করেছে, সেই ব্যক্তিই রাজ্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে সমর্থ।

কাম-ক্রোধৌ হি পুরুষমর্থেভ্যো ব্যপকর্ষতঃ।
তৌ তু শত্রু বিনির্জিত্য রাজা বিজয়তে মহীম্॥ (উঃ) ১২৯।২৪

—কাম ও ক্রোধ মানুষকে ধন হতে দূরে নিয়ে যায়। এই দুই শত্রুকে জয় করতে পারলে রাজা এই পৃথিবীকে জয় করতে পারে।

পাণ্ডবরা পরস্পর সংগঠিত থাকায় একীভূত হয়ে গেছে। তারা অত্যন্ত জ্ঞানী শৌর্য্যশালী বীর এবং শত্রুসংহারে সমর্থ। তুমি তাদের

সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে এই পৃথিবীর রাজ্য উপভোগ করতে পারবে।

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যা বলেছেন, তা যথার্থ সত্য। প্রকৃত পক্ষে এই কৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়। (সত্যমজেয়ৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ)। সুতরাং কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও। কৃষ্ণ প্রসন্ন হলে পর উভয় পক্ষই সুখী হতে পারবে।

যদি তুমি নিজের মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করতে ইচ্ছুক থাক, তবে সেই পাণ্ডবদের যথোচিত ভাগ অর্দ্ধরাজ্য তাদের প্রদান কর। এরূপে গান্ধারী পুত্রকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে বললেন, যুদ্ধে মঙ্গল হয় না। ধর্ম ও অর্থ নষ্ট হয়। যুদ্ধ কিছুমাত্র সুখের কারণ নয়, কোন পক্ষ জিতবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তুমি যুদ্ধ করো না।

তিনি দুর্যোধনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, তুমি মনে করেছ ভীষ্ম, দ্রোণাদির মত বীরেরা তোমার পক্ষে। সুতরাং তোমার জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু তোমার সেই আশাও ব্যর্থ হবে। কারণ তাঁদের নিকট তোমরা ও পাণ্ডবরা সমান স্নেহভাজন।

এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের ছিল না।

রাজপিণ্ড ভয়াদেতে যদি হাস্যন্তি জীবিতম্।

ন হি শক্ষ্যন্তি রাজানং যুধিষ্ঠিরমুদীক্ষিতম্॥ (উঃ) ১২৯।৫৩

—রাজার অন্ন খাচ্ছেন, এই ভয়ে যদিও তাঁরা তোমার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করবেন; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা কখনই বক্র দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন না।

এখানে গান্ধারী কেবলমাত্র তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেননি তাঁর দূরদৃষ্টি ও দীব্যদৃষ্টিরও পরিচয় রেখেছেন। এটা অতি নির্মম সত্য যে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয় বীরগণ যদিও দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন কিন্তু অন্তরে তাঁরা কেউ পাণ্ডবদের অহিত কামনা করেননি।

কিন্তু এবারও দুর্যোধন মাতৃ আজ্ঞা উপেক্ষা করে সভাকক্ষ হতে বেরিয়ে গেলেন। কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কৃষ্ণকে বন্দী করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

কৃষ্ণ শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসভার ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন। তাঁর উক্তি হতে জানা যায় গান্ধারী আরও কত রূঢ় ভাষায় দুর্যোধনকে পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে আদেশ করেছিলেন।

গান্ধারী কেবল প্রখর বুদ্ধিমতী বা ধর্মপরায়ণা নন, তিনি আদর্শ মাতাও। যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তিনি পুত্র দুর্যোধনকে বিধ্বংসী সমর হতে বিরত করতে চেষ্টা করেন। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধেও তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

তিনি হস্তিনাপুরের রাজসভায় সর্বসমক্ষে পুত্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বলেছেন—এই রাজসভায় যে সব নৃপতি ব্রহ্মর্ষি ও সভ্যগণ উপস্থিত আছেন, দুর্জন পরিবেষ্টিত তোমার মত পাপীর অপরাধের কথা তাঁরা সকলে শুনুন। কুরুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্ররই রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে, এটাই কুলধর্ম।

রাজ্যং কুরূণামনুপূর্বভোজ্যং
ক্রমাগতো নঃ কুলধর্ম এষঃ।
ত্বং পাপবুদ্ধেঽতিনৃশংসকর্মন্
রাজ্যং কুরূণামনয়াদ্ বিহংসি॥ (উঃ) ১৪৮।৩০

—আমাদের মধ্যে বংশ পরম্পরা কুলধর্ম এই যে, এই কুরুরাজ্য আনুপূর্বিক, অর্থাৎ যথাক্রমে উপভোগ করবে। অত্যন্ত নৃশংস কর্মকারী পাপবুদ্ধি দুর্যোধন, তুমি কিন্তু অনায়াসে এই রাজ্য বিনাশ করছ।

এই রাজ্যের অধিকারী রূপে বুদ্ধিমান ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর অনুজ দূরদর্শী বিদুর বর্তমান আছেন। দুর্যোধন এই দুইজনকে অতিক্রম করে নিজেই প্রভুত্ব হাতে নিতে চাচ্ছে।

ভীষ্মের জীবিতাবস্থায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর রাজ্যের অধিকারী হতে পারেন না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম যেহেতু রাজ্য গ্রহণ করবেন না, তাই তাঁরা রাজ্যাধিকারী।

রাজ্যং তু পাণ্ডোরিদমপ্রধৃষ্যং
তস্যাদ্য পুত্রাঃ প্রভবন্তি নান্যে।
রাজং তদেতন্নিখিলং পাণ্ডবানাং
পৈতামহং পুত্রপৌত্রানুগামী॥ (উঃ) ১৪৮৷৩৩

—প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্য মহারাজ পাণ্ডুর। তাঁরই পুত্র ইহার ন্যায্য অধিকারী। অন্য কেউ নয়। অতএব এই সমগ্র রাজ্য পাণ্ডবগণেরই। কারণ পিতা পিতামহের রাজ্য পুত্র পৌত্রগণই লাভ করে থাকে।

এখন পাণ্ডুপুত্রদেরই এই রাজ্যে অধিকার অন্য কারো নয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ও সাহায্যে সমগ্র রাজ্য শাসন করুক। এরূপ যুক্তিতে গান্ধারীর কেবল লোভহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধর্ম আচরণের জন্য স্বামী ও পুত্রকে এইরূপ ভর্ৎসনা তাঁর চরিত্রকে মহীয়ান করেছে এবং বীর রমণীদের সারিতে তাঁর নাম উজ্জ্বল দীপ্তিতে চিরকাল শোভা পাবে। তাঁর এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উক্তি তাঁর দৃঢ় নির্ভীক চরিত্র প্রকাশ করে, তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি সাধারণ নারীর মত হতভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েই নিবৃত্ত হননি। বরং বিপথগামীদের সংশোধন করবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেছেন।

মন্দোদরী চরিত্রও গান্ধারী চরিত্রের সঙ্গে সমভাবে প্রশংসনীয়, মন্দোদরী যদিও গান্ধারীর মত সর্বসমক্ষে স্বামী পুত্রকে ধিক্কার দেননি। উভয়ই কুলক্ষয় নিবারণ উদ্দেশ্যে ধর্মের পথ আশ্রয় করতে স্বামী পুত্রকে বারংবার অনুরোধ করেছেন।

দুর্যোধন যুদ্ধে যাবার পূর্বে গান্ধারীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে, উত্তরে গান্ধারী বললেন—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

আঠার-দিন-স্থায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাত্রার সময় প্রতিদিন দুর্যোধন মাতার আশীর্বাদ চাইলে, প্রত্যেকদিন গান্ধারীর আশীর্বচন ছিল—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

গান্ধারী প্রাণ মন খুলে দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করে বলতে পারেননি—পুত্র, জয়ী হয়ে ফিরে এস।

জননীর স্নেহ প্রস্রবণ স্বভাবতঃ পুত্রের জয় ও যশ কামনা করে। এই ঈপ্সা প্রবল হয়, ব্যাকুল হয়—বিশেষ করে পুত্র যখন মরণ আহবে যাচ্ছে। তিনি জানতেন কুপুত্র সুপুত্র দুইই মায়ের কাছে সমান। কিন্তু তাঁর স্নেহ অন্ধ নয়। সতত তাঁর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ ও ধর্মের সঙ্গে এক প্রবল দ্বন্দ্ব চলে। এবং ধর্মেরই জয় হয়। গান্ধারী জানেন দুর্যোধন যে যুদ্ধের কারণ সে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়। তিনি ধর্মের বিরোধিতা করতে অক্ষম, তাই তিনি প্রাণ খুলে পুত্রের জয়াকাঙ্ক্ষা করতে পারেননি। ধর্মের জয় হোক—এই শাশ্বতবাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে।

যুদ্ধ জয়ের পর যুধিষ্ঠির উগ্র তপস্বিনী গান্ধারীর অভিশাপের আশঙ্কায় ভীত হয়েছিলেন। কারণ তিনি ক্রুদ্ধা হলে ত্রিলোক ভস্ম করতে পারেন। যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কারণ এরূপ দুঃসংবাদের সংঘাত সহ্য করতে একমাত্র কৃষ্ণই সমর্থ। কৃষ্ণ গান্ধারীকে বললেন—তোমার মত সতী সুচরিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। পাণ্ডবপক্ষ হতে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যখন হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তুমি আমার সদিচ্ছা বুঝতে পেরেছিলে এবং তোমার ছেলেকে আমার কথামত কাজ করতে বলেছিলে। তোমার পুত্র তোমার কথায় কর্ণপাত না করায় তুমি কঠোর ভাষায় বলেছিলে—

শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ (শঃ) ৬৩।৬২

—মূঢ়, আমার বাক্য শোন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।

তোমার ঐ স্পষ্ট উক্তি দুর্যোধন গ্রহণ করেনি। তোমার সেই

বাক্য আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। ঐ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল তুমি জানতে। তুমি শোক কর না।

বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ॥

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি কেশব।

অধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম ॥

সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দ্দন। (শঃ) ৬৩।৬৫-৬৬

—বাসুদেবের কথা শুনে গান্ধারী বললেন—মহাবাহু কেশব, তুমি যে কথা বললে, তা যথার্থই। এখন আমার মন অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং এই ব্যথা বহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়ে পড়েছে। (অতএব পাণ্ডবদের অনিষ্টের কথা আমি চিন্তা করেছিলাম) জনার্দ্দন, কিন্তু এই সময় তোমার বাক্য শুনে আমার বুদ্ধি স্থির হয়েছে—ক্রোধ শান্ত হয়েছে।

মহর্ষি বেদব্যাস যখন ধ্যানে জানতে পারলেন গান্ধারী পাণ্ডবদের শাপান্ত করতে মনস্থ করেছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, গত আঠার দিনে জয়াভিলাষী হয়ে তোমার পুত্র দুর্যোধন প্রতিদিন তোমার নিকট গিয়ে এই কথা বলতো, মা, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তুমি আশীর্বাদ কর, তখন তুমি উত্তরে বলতে—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

ন চাপ্যতীতাং গান্ধারি বাচং তে বিতথামহম্।

স্মরামি ভাষমাণায়স্তথা প্রাণিহিতা হ্যসি ॥ (স্ত্রী) ১৪।১০

—গান্ধারী, অতীতে তুমি কখনও মিথ্যা বলেছ তা আমার স্মরণ হয় না এবং তুমি সর্বদা প্রাণিগণের হিত কর্মেই নিরত আছো।

তুমি তো পূর্বে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলে। ক্ষমাই তোমার বৈশিষ্ঠ। অধর্ম পরিত্যাগ কর। কারণ যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। নিজের ধর্ম ও কথিত বাক্য স্মরণ করে তুমি ক্রোধ সংবরণ কর।

গান্ধারী বললেন—

ভগবন্নাভ্যসূয়ামি নৈতানিচ্ছামি নশ্যতঃ।

পুত্রশোকেন তু বলাম্মনো বিহ্বলতীব মে ॥ (স্ত্রী) ১৭।১৪

—ভগবান, আমি কারো প্রতি কোন অসূয়া ভাব পোষণ করি না। এবং তাদের বিনাশও কামনা করি না। পুত্র শোক আমাকে ব্যাকুল করেছে।

মাতৃহৃদয়ের পুত্রশোকেব চিরন্তন ব্যথা গান্ধারীকেও অভিভূত করেছে। কিন্তু তিনি কর্তব্য বিস্মৃত হননি।

তিনি আরও বললেন, কুন্তীর পুত্ররা যেমন কুন্তীর দ্বারা রক্ষণীয়, তেমনি আমারও কর্ত্তবা এদের রক্ষা করা। ধৃতরাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্য এদের রক্ষা করা।

অন্যায় যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছে এবং তাতে মৃত্যু হয়েছে জেনে ভীমকে গান্ধারী ভর্ৎসনা করলে ভীম কৌরব পক্ষের সমস্ত অন্যায় কার্যের পর্য্যায় ক্রমে বর্ণনা করলে তিনি বার বার আক্ষেপ করে বলেছেন—

পুত্র শোকে আর মোর না রহে জীবন ॥
কুপুত্র সুপুত্র হোক মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ ॥
... ...
মারিলে অন্যায় করি পুত্র দুর্যোধনে ॥
নাভি নিম্নে অনুচিত করিতে প্রহার।
কি হেতু করিলে তবে হেন অবিচার ॥
... ...
কি দোষে মারিলে দুঃশাসনের নিধন ॥
মারিয়া করিলে তুমি তার রক্ত পান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান ॥ (স্ত্রী)

কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কভুও নয়। এই শাশ্বত সত্যের

প্রমাণ পাই গান্ধারীর বিলাপে। তিনি জানেন তাঁর পুত্ররা দুর্জন ও পাপিষ্ঠ। তা সত্বেও তাদের পরাজয় ও শত্রু হস্তে নির্মম ভাবে নিধনের সংবাদে মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ প্রস্রবণ বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অবিরাম অশ্রুধারা দিয়ে তিনি শতপুত্র ও পৌত্রের শোকের তর্পণ করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একশত পুত্রকেই নিধন করা হয়েছে। এই আক্ষেপ বার বার গান্ধারী করেছেন। কিন্তু অল্প অপরাধী একটি পুত্রকেও অন্ধদ্বয়ের যষ্ঠিরূপে অবশিষ্ট রাখা হয়নি।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের সঙ্গে অপরাধীর মত শোকাতুরা গান্ধারীর সামনে হাজির হয়ে সমস্ত আত্মীয় বন্ধুদের হত্যার জন্য নিজেকে অভিযুক্ত করে বিনম্র ভাবে বললেন, মা, আমিই অপরাধী, আমাকে অভিশাপ দাও।

ক্ষমাময়ী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করে অবিচলিত ভাষায় স্বীকার করলেন যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবরা দায়ী নন। কুন্তী যেমন পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী তিনিও সেইরূপ। তাঁর পুত্রদের প্রবল শত্রু পাণ্ডুপুত্রদের তিনি নিজের তনয় বলে কোলে তুলে নিলেন।

আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর ভয় নাহি শুন পাণ্ডুর কুমার।
সে কর্ম করহ হবে যে যুক্তি তোমার ॥ (স্ত্রী)

তপঃসিদ্ধা গান্ধারীকে প্রণাম করবার জন্য যুধিষ্ঠির নত মস্তক হলে, সেই সময় গান্ধারী চক্ষুর আবরণ বস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগের দিকে এক ঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করলে যুধিষ্ঠিরের সুশ্রী নখ কুৎসিত হয়ে গেল।

গান্ধারী বলেছেন—

দুর্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য।
কর্ণ দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তোঽয়ং কুরুসংক্ষয় ॥ (স্ত্রী) ১৪।১৬

—দুর্যোধন, সুবল নন্দন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধ কুরুকুল ক্ষয়কারী এই যুদ্ধের কারণ।

এখানে গান্ধারী চরিত্র অনুপম। শত পুত্রহারা শোকাতুরা জননী গান্ধারীর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে তাঁর চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তা, সত্যপ্রিয়তা ও ধর্মানুরাগীতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্পষ্ট উক্তি তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্রের সাক্ষ্য।

বেদব্যাসের বরে দিব্য দৃষ্টি লাভ করে গান্ধারী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধাদের দেখে এবং রোরুদ্যমানা বধূদের দেখে বিলাপ করতে করতে কৃষ্ণকে বললেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী কর্ণ, ভীষ্ম, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যের ন্যায় বীরদের প্রাণহীন দেহ দ্বারা এই রণভূমি শোভিত। এই বীরদের সুবর্ণময় কবচ, পদক, মণি, অঙ্গদ, কেয়ুর ও হার দ্বারা রণক্ষেত্র বিভূষিত হয়েছে।

পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ বিনাশে মধুসূদন।
পঞ্চানাপি ভূতানামহং বধমচিন্তয়ম্॥ (স্ত্রী) ১৬।২৬

—মধুসূদন, এই পাঞ্চাল ও কৌরব বীররা নিহত হওয়ায় আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, পঞ্চভূতের বিনাশ হয়ে গেছে।

এই বীরদের রক্তাপ্লুত দেহ—গরুড় ও গৃধ্র এদের পা ধরে খাচ্ছে। এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং অভিমন্যুর ন্যায় অবধ্য বীরেরাও নিহত হবে কে এই চিন্তা করে ছিল? (অবধ্য কল্পান নিহতান্ গতসত্বান চেতসঃ।) হায়, অচৈতন্য ও প্রাণহীন হয়ে তাঁরা এ স্থানে পড়ে আছেন। গৃধ্র, শ্যেন, কুকুর ও শৃগালদের খাদ্যে পরিণত হয়েছেন। দুর্যোধনের অধীন হয়ে এই সব অমর্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় শান্ত হয়ে গেছেন। এদের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর। যারা পূর্বে কোমল শয্যায় শয়ন করত, তারা সকলে নিহত হয়ে আজ আস্তরণহীন কঠিন ভূমিতে শুয়ে আছে। স্তুতি পাঠক বন্দীরা যাদের সর্বদা নিজ নিজ বাক্য দ্বারা আনন্দিত করত, আজ শিবাদের অমঙ্গলময় নানাবিধ ভয়ঙ্কর

শব্দ তাদের বন্দনা করছে। এই সব বীর পূর্বে নিজ নিজ দেহে চন্দন ও অগুরু লেপন করে শয্যায় শয়ন করতেন তারা আজ শ্মশানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

এই ভাবে গান্ধারী নিহত বীরদের অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনা করে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণকে সম্বোধন করে পুত্রশোকে ব্যাকুল এইভাবে আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমানা গান্ধারী যুদ্ধ স্থলে নিহত পুত্র দুর্যোধনকে দেখলেন। নিহত দুর্যোধনকে দেখে শোকাকুল গান্ধারী বনে ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে পুত্রকে চীৎকার করে ডেকে ডেকে আহ্বান করতে করতে মৃতদেহ আলিঙ্গন করে বিলাপ করতে লাগলেন। মৃত্যুর দ্বারা যেন দুর্যোধন মাতৃহৃদয় জয় করেছেন।

কাশীদাসী মহাভারতে পুত্র শোকাতুরা গান্ধারীর বিলাপ বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী।

আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্যোধন ॥

... ...

যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধুলায় লুটে দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
এক কালে এত শোক সহিতে না পারি ॥
পুত্র শোক শেল সম বাজিছে হৃদয়ে। (স্ত্রী)

মাতৃহৃদয়ের ব্যথার মূর্চ্ছনা অনুরণিত হয়েছে গান্ধারীর বিলাপে :—

সংসারের মধ্যে শোক আছে যত আর।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে এক তার ॥

গর্ভধারী হয়ে সেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের বেদন ॥
এ শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।

... ...

মহাবলান্ত মোর শতেক নন্দন ·
কি দিয়া বুঝাবে মোরে বল নারায়ণ ॥ (স্ত্রী)

মাতৃহৃদয়ের পুত্র শোকের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি হয়েছে এই বিলাপে। রাজঐশ্বর্য্য ভোগী পুত্রের পরিণাম নিজ চোখে দেখে আক্ষেপ করে গান্ধারী বিলাপ করে আরো বলেছেন—

মহারাজ দুর্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি মণ্ডলে ॥
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
দেখিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা। (স্ত্রী)

এই বিলাপের মধ্য দিয়ে বীর জননীর বীর পুত্রের জন্য খেদোক্তি বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক।

রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম করিয়া সমর ॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃত্যু সম্মুখে সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি দুঃখ খেদ কোন কমে ॥ (স্ত্রী)

দুঃখের সাগরে ডুবেও গান্ধারীর বড় অহঙ্কার তাঁর পুত্রেরা ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষা করেছেন যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই বীরগাথা ক্ষত্রিয় সন্তানেরা জন্মলগ্ন থেকে শুনে থাকে। পুত্র বীর হও, বীরের মত মৃত্যু বরণ কর।

সর্বদা আত্মীয় বন্ধু বীর পরিবেষ্টিত পুত্রকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একাকী পড়ে থাকতে দেখে গান্ধারী বিলাপ করে বলেছেন—

দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনির সঙ্গে কেন না দেখি রাজন।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু—নন্দন॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা নৃপ মহাশয়।
একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
একাদশ অক্ষৌহিনী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়॥ (স্ত্রী)

জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ও একাকী শায়িত দেখে গান্ধারী খুঁজে বেড়াচ্ছেন শকুনি কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি বন্ধুদের যারা দুর্যোধনের নিত্য সহচর ছিল এবং বিধ্বংসী এই সংগ্রামের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে বলা হয়েছে দুর্যোধনের কণ্ঠের বিশাল অস্থি মাংসে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর কণ্ঠে হার ও পদক তখন বিদ্যমান। সেই আচরণ ভূষিত পুত্রের বক্ষঃস্থল অশ্রুসিক্ত করে গান্ধারী শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান কৃষ্ণকে বললেন—

জ্ঞাতিগণের ক্ষয়কারী এই ভীষণ সংগ্রাম যখন উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় এই নৃপতি দুর্যোধন আমাকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলেছে—মা, জ্ঞাতিদের এই সংগ্রামে আপনি আমাকে জয়লাভের আশীর্বাদ করুন। আমি তখনই বুঝেছিলাম যে আমার উপর গুরুতর সঙ্কট আসছে। তাই আমি তাকে বলেছিলাম 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়'। পুত্র, যদি তুমি যুদ্ধ করতে করতে বীর ধর্ম হতে চ্যুত না হও, তবে নিশ্চয়ই অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত দেবলোক প্রাপ্ত হবে।

মাধব, দুর্যোধনের পরাজয়ের বিষয় আমি পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলাম।

সেজন্য আমার এই দুর্যোধনের জন্য শোক হচ্ছে না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোকমগ্ন হচ্ছি। তাঁর সমস্ত বান্ধবরা নিহত।

গান্ধারীর এই উক্তি তাঁর পরবর্তী অবস্থার বিপরীত। পুত্র দুর্যোধনের জন্য কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে জেনেও মাতৃহৃদয় তার জন্য ব্যথায় ব্যাকুল। যদিও মুখে কৃষ্ণকে তিনি বললেন যে দুর্যোধনের জন্য তাঁর কোন দুঃখ নেই। একটু পরেই কুরুক্ষেত্র শ্মশানে দুর্যোধনের অসহায় জীবনহীন দেহ দেখে তিনি আবার বিলাপ করে মাধবকে বললেন, মাধব, অমর্ষী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ রণদুর্মদ এবং বীর শয্যায় শায়িত আমার এই পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। যে রাজাদের অগ্রগমন করত, সে আজ ভূলুণ্ঠিত।

…পশ্য কালস্য পর্যয়ম্॥ (স্ত্রী) ১৭।১১

—কালের বিপরীত গতি দেখ।

নিশ্চয়ই বীর দুর্যোধন সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে যা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই বীর সেবিত শয্যায় সে সম্মুখে মুখ রেখে শয়ন করে রয়েছে। পূর্বে যার পাশে সুন্দরী স্ত্রীরা উপবেশন করে তার মনোরঞ্জন করতো, আজ বীর শয্যায় সেই বীরের মনোরঞ্জন করছে অশিব শিবারা। যার পার্শ্বে পূর্বে রাজারা উপবেশন করে তার আনন্দ দান করতো, আজ নিহত ধরাশায়ী সেই বীর বহু শকুনি পরিবেষ্টিত। পূর্বে যুবতী স্ত্রীরা যার পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর পাখা দ্বারা ব্যজন করত, আজ তাকে পক্ষীরা তাদের পক্ষ দ্বারা বাতাস করছে।

এষ শেতে মহাবাহুর্বলবান সত্য বিক্রমঃ।
সিংহেনেব দ্বিপঃ সংখ্যে ভীমসেনেন পাতিতঃ॥ (স্ত্রী) ১৭।১৬

—এই মহাবাহু সত্যপরাক্রমী বলবান বীর দুর্যোধন ভীমের দ্বারা ভূপাতিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের দ্বারা নিহত গজরাজের ন্যায় শয়ন করে আছে।

যে বীর পূর্বে একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যকে পরিচালনা করতো,

সে আজ নিজেই ধর্ম বিরুদ্ধ কাজের জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এক সিংহের দ্বারা নিহত অপর সিংহের ন্যায় ভীমের হাতে এই মহাবল, মহাধনুর্ধর দুর্যোধন নিহত হয়ে শয়ন করে আছে।

গান্ধারী বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন—এই দুষ্ট ও মন্দ ভাগ্য বালক বিদুর এবং নিজের পিতাকে অপমান করে বৃদ্ধদের অবমাননার পাপে মৃত্যুর বশীভূত হয়েছে। তের বৎসর যাবৎ এ সমগ্র পৃথিবী নিষ্কণ্টক ভাবে পালন করেছিল, আমার সেই পুত্র পৃথিবীপতি দুর্যোধন আজ ধরাতলে শয্যা নিয়েছে।

ধর্মের বন্ধন এতদিন যে হৃদয়কে নিষ্করুণ করেছিল, সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর দুর্যোধনের প্রাণহীন দেহ দীন দুঃখীর দেহের মত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতে দেখে গান্ধারীর দুঃখ প্রবল ভাবে প্রকাশ পেলো।

অপশ্যং কৃষ্ণ পৃথিবীং ধার্ত্তরাষ্ট্রানুশাসিতাম্।
পূর্ণাং হস্তি গবাশ্বৈশ্চ বার্ষ্ণেয় ন তু তাচ্চিরম্॥ (স্ত্রী) ১৮।২২

—বৃষ্ণি বংশভূষণ কৃষ্ণ, আমি দুর্যোধনের দ্বারা শাসিত এই পৃথিবীকে হস্তি, অশ্ব ও গো দ্বারা পরিপূর্ণ দেখেছিলাম, কিন্তু সেই রাজ্য চিরস্থায়ী হল না।

আজ আমি সেই পৃথিবীকে দেখছি যে সে অন্যের দ্বারা শাসিত হয়ে হস্তী, অশ্ব ও গোহীনা হয়ে গেছে। সুতরাং আমি আর কিজন্য জীবন ধারণ করব? (কিং নু জীবামি)।

ইদং কষ্টতরং পশ্য পুত্রস্যাপি বধান্মম।
যদিমাঃ পর্যুপাসন্তে হতান্ শূরান্ রণে স্ত্রিয়ঃ॥ (স্ত্রী) ১৮।২৪

—আমার পক্ষে পুত্র বধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হচ্ছে যে এই স্ত্রীরা সমরক্ষেত্রে এসে নিজ নিজ বীর পতির নিকট বসে রোদন করছে। এদের অবস্থা দেখ।

কথং তু শতধা নেদং হৃদয়ং মম দীর্যতে।
পশ্যন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে॥ (স্ত্রী) ১৮।২৭

—রণভূমিতে এই আমার পুত্র নিজের পুত্রের সঙ্গে নিহত হয়েছে।

একে এই অবস্থায় দেখে আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না ?

যদি সত্যগমাঃ সন্তি যদি বৈ শ্রুতয়স্তথা।

ধ্রুবং লোকানবাপ্তোঽয়ং নৃপো বাহুবলাজ্জিতান ॥ (স্ত্রী) ১৮।৩২

—যদি বেদ শাস্ত্র সত্যি হয়, তবে রাজা নিশ্চয়ই স্বীয় বাহুবলে অর্জিত পুণ্যলোক পেয়েছে।

গান্ধারী পুত্রের জীবিতকালে আশীর্বাদ করে পুত্রের জয় কামনা করতে পারেননি। মৃত্যুর পর পুত্রের উন্নত জীবন হোক তাঁর এই অভিলাষ।

অন্যান্য পুত্রদের জন্যও গান্ধারী বিলাপ করছেন। দুর্যোধনের অপকর্মের জন্য একদিকে যেমন গান্ধারীর হৃদয় বিরূপ, তেমনি অন্যদিকে পুত্রস্নেহে অন্ধ জননী বীর পুত্রশোকে আকুল হয়ে তার মরণোত্তর সুখী জীবনের কল্পনা করছেন।

দুঃশাসনের মৃতদেহ দেখে গান্ধারী বলেছেন এই সেই পুত্র দুঃশাসন ভীম যাকে নিহত করে রক্ত পান করেছে। দ্যূতক্রীড়ার সময় দ্রৌপদী দুঃশাসনের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েছিল বলেই ভীমকে দিয়ে দুঃশাসনকে গদার দ্বারা হত্যা করিয়েছে। আমার এই পুত্র নিজের ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয় কাজ করবার ইচ্ছায় সভাতে পাশা খেলায় পরাজিত দ্রৌপদীকে বলেছিল, পাঞ্চালী, তুমি নকুল, সহদেব এবং অর্জুনের সঙ্গে আমাদের দাসী হয়েছো। অতএব শীঘ্র তুমি আমাদের গৃহে প্রবেশ কর।

কৃষ্ণ, সেই সময় আমি দুর্যোধনকে সাবধান করে বলেছিলাম, পুত্র, শকুনি মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়েছে। তুমি এই নীচমতি কলহপ্রিয় মাতুলের সঙ্গ ত্যাগ কর, এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। তুমি জান না ভীম কি রকম অমর্ষণ বা প্রতিহিংসাপরায়ণ বা তা জেনেও প্রজ্বলিত উল্কার দ্বারা হস্তীকে প্রহার করবার ন্যায় তুমি বাক্যবাণে তাকে পীড়া দিচ্ছ। এইভাবে নির্জনে আমি তাদের সকলকে কতই

না সাবধান করেছি। কিন্তু আমার দুরন্ত সন্তানরা আমার হিত কথা শোনেনি। গান্ধারীর কেবলমাত্র দূরদৃষ্টি ছিল না, লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। দুষ্টবুদ্ধি ভাই শকুনি সম্বন্ধেও তিনি সময় মত দুর্যোধনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

গান্ধারী কেবল নিজের সন্তান পুত্র পৌত্র জামাতার শোকেই কাতর হননি। তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন

অধ্যর্ধগুণমাহুর্যং বলে শৌর্যে চ কেশব।

পিত্রা ত্বয়া চ দাশার্হ দৃপ্তং সিংহমিবোৎকটম্॥ (স্ত্রী) ২০।১

—কেশব, যে বীর বল ও শৌর্যে নিজ পিতা এবং তোমা অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক বলে বিদিত, যে বীর প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় উগ্র, যে একাকী আমার পুত্রদের ব্যূহ ভেদ করেছিল, সেই বীর অভিমন্যু অপরের মৃত্যুস্বরূপ হয়েও স্বয়ংই মৃত্যুর অধীন হয়েছে। কিন্তু তার কান্তি এখনও ম্লান হয়নি।

বিরাট কন্যা, অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা অভিমন্যুর জন্য আর্তস্বরে রোদন করছিল এবং অভিমন্যুর দেহে হাত বুলাচ্ছিল। অভিমন্যুর জন্য বিলাপরত উত্তরার প্রতি গান্ধারী কৃষ্ণর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

স্বস্ত্রীয়ং বাসুদেবস্য পুত্রং গাণ্ডীবধন্বনঃ।

কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জঘ্নুরেতে মহারথাঃ॥ (স্ত্রী) ২০।১৭

—তুমি বাসুদেবের ভাগ্নে এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র। রণভূমিতে তোমাকে এই মহারথীরা কিভাবে নিহত করল ?

অতঃপর গান্ধারী মৃত কর্ণের দিকে কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এই মহাধনুর্ধর মহারথী কর্ণ অর্জুনের তেজে নির্বাপিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শান্ত হয়ে শয়ন করেছে। কর্ণ বহু অতিরথ বীরদের সংহার করে এখন নিজেই ভূতলে শয়ন করে আছে। অর্জুনের ভয়ে আমার মহারথী পুত্ররা যাকে অগ্রে রেখে যূথপতিকে সম্মুখে রেখে সঙ্ঘর্ষ-রত হস্তীদের ন্যায় পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল, সেই বীর কর্ণকে অর্জুন নিহত করেছে। দেখ তার

স্ত্রীরা কেশ উন্মুক্ত করে বিলাপ করছে। যে কর্ণের ভয়ে যুধিষ্ঠির তের বৎসর নিদ্রা ত্যাগ করেছিল, দুর্যোধনের শরণাগত সেই কর্ণ আজ নিহত।

নিজ নিজ স্ত্রীর দ্বারা পরিবৃত অবন্তী দেশপতি জয়দ্রথকে দেখে এবং নিজ কন্যা দুঃশলাকে লক্ষ্য করে গান্ধারী কৃষ্ণকে বিলাপ করে বলছেন—অর্জুন যাকে নিহত করেছে সেই বীর বন্ধুহীন জয়দ্রথ আজ গৃধ্র ও শৃগালের ভক্ষ্য বস্তু। বহু যোদ্ধাকে সংহার করে এই ভূপাল বীর মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেছেন। পুত্রশোকাতুর অর্জুন নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে জয়দ্রথকে বিনাশ করেছে। যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে কেকয়গণের সঙ্গে পলায়ন করেছিল, সেই দিনই সে পাণ্ডবদের দ্বারা নিহত হোত। কিন্তু দুঃশলার কথা স্মরণ করে জয়দ্রথকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণ, পাণ্ডবরা আজ কেন তাকে আবার সম্মান করে আমার কন্যার কথা মনে করে অব্যাহত দিল না। আমার পক্ষে এর অধিক দুঃখ আর কি? আমার কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে আর আমার পুত্রবধূরা অনাথা হয়েছে।

এইভাবে তিনি শল্য, ভগদত্ত প্রভৃতি সকলের শব দেখিয়ে কৃষ্ণকে তাদের বীরত্ব ও তাদের হতভাগী স্ত্রীদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

গান্ধারী পুত্রদের ও জামাতার জন্য শোক করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুষ্কর্মের উল্লেখ করতে ভুলেননি। এতে মনে হয় তাঁরা যে আপন আপন কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছেন, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন ও পূর্বাহ্নেই এমন অশুভ পরিণতির কথা জানতেন, তবু মাতৃহৃদয়ের ব্যথা কোন প্রকারেই ঢাকা যায় না।

শৌর্যে ও বীর্যে যাঁর তুলনা নেই সেই ভীষ্ম আহত হয়ে শরশয্যায় শয়ন করে আছেন। ইনি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, ব্রহ্মচারী, সর্বজ্ঞ। পরলোক ও ইহলোক সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা সর্বপ্রকার

আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধানে সমর্থ। মানুষ হয়েও তিনি দেবতুল্য। এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে গান্ধারী বললেন—

নাস্তি যুদ্ধে কৃতী কশ্চিন্ন বিদ্বান ন পরাক্রমী।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মঃ শেতেঽদ্য নিহতঃ শরৈঃ॥ (স্ত্রী) ২৩।২২

—যখন এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মও আজ শত্রুদের বাণ দ্বারা নিহত-প্রায় হয়ে শায়িত রয়েছেন, তখন স্বীকার করতে হবে যে যুদ্ধে কেউই পণ্ডিত নন, কেউই অভিজ্ঞ নন এবং কেউ পরাক্রমীও নন।

গান্ধারী দ্রোণাচার্য, ভূরিশ্রবা পত্নীদের তাদের পতিদের মৃতদেহ পার্শ্বে বসে থাকতে দেখে তাদের প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শোক প্রকাশ করতে থাকেন।

কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে গান্ধারীয় করুণাময়ী নারীর পূর্ণাবয়ব মুক্তি লাভ করেছে।

গান্ধারী যদিও যুধিষ্ঠিরকে কোন প্রকার অভিশাপ দেননি, কিন্তু কৃষ্ণকেই পরোক্ষে কুরুবংশ ধ্বংস করার জন্য দায়ী বলে অভিযুক্ত করে অভিশাপ দিয়েছেন।

কারণ যদিও এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যা পেয়েছে, কিন্তু সম্যকভাবে বিচার করলে প্রকাশ পায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ছলনা মাত্র। অবধ্য সমস্ত দুর্ধর্ষ কুরুবীরদের ছলনার দ্বারা নিহত করা হয়েছে এবং বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে প্রত্যেক ছলনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছেন। এইজন্য গান্ধারী নির্ভীক ভাবে কৃষ্ণকে গান্ধারীর শতপুত্র ও আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু রাজাদের বিনাশের জন্য দায়ী করে বলেছেন—

আপনি করিলে নষ্ট দৈবকীকুমার॥
এক শত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল অর্ধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল॥

তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সবাকারে কর চক্রপাণি॥
তোমা হতে আসি প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।

... ...

তুমি বল দুর্যোধন ধর্ম নাহি জানে।
কর্মেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।

... ...

তুমি কর্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ।
যেমন যাহারে তুমি করাইলে ভোগ॥
সেই মত দুর্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃভেদ শিখাইলে পরম যতনে॥

... ...

তোমাকে না দিয়ে দোষ দিব আর কারে॥

... ...

তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদ বারতা॥
এখন জানিনু তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল॥

... ...

যাবৎ শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥

ক্ষত্রিয় ধরমে যুদ্ধ করিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত॥ (স্ত্রী)

সর্বলোকমান্য কৃষ্ণকেই কুরুকুল ধ্বংসের কারণ বলে চিহ্নিত করতে গান্ধারীর মত ধর্মপ্রাণা নারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কৃষ্ণকে আরও অভিযুক্ত করে বলেছেন দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হল, তখন কৃষ্ণ যদি নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করতেন বা এই যুদ্ধে যদি তিনি অংশ গ্রহণ না করতেন, তবে তিনি যথার্থ বন্ধুর কাজ করতেন এবং তাঁর কীর্তি অক্ষুণ্ণ থাকতো।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কৃষ্ণ কেন এই যুদ্ধ বাধতে দিলেন? তাঁর সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে। উভয় পক্ষই তাঁর বাধ্য, বন্ধু। তথাপি তিনি কুরুকুলের এই বিনাশে উদাসীন হলেন।

গান্ধারীর এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বার বার বলা সত্ত্বেও দুর্যোধন কৃষ্ণের প্রস্তাবিত সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অন্য পক্ষে দুর্যোধন চতুষ্টয় জনার্দনকে বন্দী করবার ষড়যন্ত্র করছিলেন। যথার্থই কৃষ্ণের প্ররোচনায় নানা ছলে পাণ্ডবরা কুরুকুল ধ্বংস করেছেন।

স্বয়ং নারায়ণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ধর্মশীলা গান্ধারী উত্থাপন করেছেন, যথার্থই তার যথাযথ প্রত্যুত্তর দেওয়া কৃষ্ণের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

শোকে বিহ্বল হয়ে গান্ধারীর মুখ দিয়ে একটিও অসংযত উক্তি বের হয়নি। এমন সুন্দর সুন্দর যুক্তির সাহায্যে যথার্থ বিদুষী ধার্মিকা নারীর পক্ষেই এরূপ অসম সাহসের কথা বলা সম্ভব হয়েছে।

কৃষ্ণ-গান্ধারী অনুবেদনে গান্ধারী চরিত্রের অন্য একটি উজ্জ্বল দিক পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। শোকের আবেগে সংবৃত গান্ধারীর অন্য একটি রূপ দেখা যায়। তিনি কৃষ্ণকে এক দুস্তর অভিশাপ দিয়ে বললেন—

পতি শুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জিতম।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর ॥ (স্ত্রী) ২৫।৪২

—পতি শুশ্রূষার দ্বারা আমি যে যৎকিঞ্চিৎ তপোবল অর্জন করেছি, তার দ্বারা হে গদাচক্রধর, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হতে কৃষ্ণ হইবে নিধন ॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে দিনু অভিশাপ ॥
মোর বধূ যেন মত করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুরু-পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে ॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার!
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥ (স্ত্রী)

কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ একমাত্র কৃষ্ণই রোধ করতে পারতেন, তা না করে বরং তাঁর মন্ত্রণায় সরল পাণ্ডবেরা অন্যায় ভাবে রথী মহারথীদের যুদ্ধে নিহত করেছেন। সেইজন্য গান্ধারী তাঁকে অভিসম্পাত দিয়ে বললেন, যে কৃষ্ণর বংশও পরস্পর জ্ঞাতি বধে লিপ্ত হবে। এবং তখন হতে পঁয়ত্রিশ বছর পরে কৃষ্ণও আত্মীয় পরিজন হারিয়ে বনে ভ্রমণ করতে করতে কুৎসিত ভাবে নিহত হবেন। এবং কৃষ্ণের বংশের মহিলারাও কুরুবংশের মহিলাদের মত সর্বহারা হয়ে বিলাপে মেদিনী বিদীর্ণ করবে।

গান্ধারীর মত বিদুষী, ধর্মনিষ্ঠা, মহানুভব মহিলার মুখ হতে এরূপ কঠিন অভিশাপ তাঁর গভীর শোকেরই অভিব্যক্তি।

শত পুত্রহারা জননীর শোক জর্জরিত অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। শোকাতুরা জননীর এইরূপ অভিশাপ ক্ষমার্হ।

কৃষ্ণ যদিও এই অভিশাপের জন্য গান্ধারীকে ভৎসনা করেছিলেন, কিন্তু এই অভিশাপ যে ব্যর্থ হবে না তা তিনি জানতেন। সতী নারীর অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। কৃষ্ণ চরিত্র বিশ্লেষণে বিশদ ভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণের জীবন সায়াহ্নে গান্ধারী সম্বন্ধে বলেছিলেন—

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্তা তদিদং সমুপাগমৎ॥ (মৌ) ২।২১

—পুত্রশোকে সন্তপ্তা হতবান্ধবা গান্ধারী শোকে কাতর হয়ে যা বলেছেন, তার সূচনা দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ নৃপতির অবস্থার কথা ভেবে চিন্তায় বিহ্বল গান্ধারী বিলাপ করে বলেছেন—

বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজার॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাবে আগুন। (স্ত্রী)

দুর্যোধনের অপকীর্তির কথা স্মরণ করে শোকাতুরা জননী আক্ষেপ করে ভীমকে সম্বোধন করে বলেছেন—

পুত্রশোকে আজি মম দহে কলেবর॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্যোধন॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান॥ (স্ত্রী)

গান্ধারীর মর্মভেদী এই বিলাপ সকলের সমবেদনা কেড়ে নেয়। শতপুত্রহারা জননীর অন্তরের ব্যথা কবি কাশীদাসকে এমন ব্যাকুল করেছে যেন তিনিও গান্ধারীর সঙ্গে বিলাপ করছেন। স্বীয় পুত্রের দুষ্কর্মের কথা উদ্ধৃত করে পীড়িত জনকে তিনি যেভাবে অভয় বাণী শোনাচ্ছেন তা হৃদয় বিদারক। গান্ধারীর বিলাপ সত্যই শোকাতুরা জননীর একান্ত অন্তরের কথা।

গান্ধারীর শোক মুহূর্তে পঞ্চ পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে

কুন্তী গান্ধারীর কাছে গেলেন, গান্ধারী সস্নেহে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

যথৈবাহং তথৈব ত্বং কো নাবাশ্বাসয়িষ্যতি।

মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্॥ (স্ত্রী ১৫।৪৩

—তোমার যা দশা আমার দশাও সমান। কে আমাকে সান্ত্বনা দেবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনাশ হলো। শোকে আমরা আজ সমান, কে কাকে সান্ত্বনা দেবে?

এইরূপ ক্ষমা ও উদারতা নারী চরিত্রে অতি দুর্লভ। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীই গান্ধারীর শতপুত্রের হত্যাকারী। তথাপি দ্রৌপদীর প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তে তাঁর পঞ্চ পুত্র নিধনের জন্য এই যে সমবেদনা তা যথার্থই গান্ধারীর উদার মনেরই পরিচয় দেয়।

আত্মীয় পরিজনের পারলৌকিক কর্ম সমাধা করে গান্ধারী যখন হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন, তখন তিনি মুণিগণকে সম্বোধন করে বললেন—

যুধিষ্ঠিরে রাজা কর হস্তিনা ভুবনে॥ (স্ত্রী)

অনুতপ্ত যুধিষ্ঠিরকে বসে থাকতে দেখে গান্ধারী তার উদ্দেশ্যে যে উক্তি করেছিলেন সেটাই বোধ হয় গান্ধারী চরিত্রের সব চেয়ে মাধুর্য-পূর্ণ অভিব্যক্তি।

কি কারণে দুঃখ কর ধর্মের নন্দন।
তোমা হতে বসুমতী হইবে শোভন॥
নিজ দোষে হত হইল মোর পুত্রগণ।
ক্রন্দন করি যে আমি মায়ার কারণ॥
তোমার কি নীতি আর বুঝাইব আমি।
ধর্মপুত্র হও তুমি ধার্মিক সুবীর॥ (স্ত্রী)

গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে বলেন যে মায়াবিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর পুত্রদের জন্য বিলাপ করছেন। তাঁর পুত্রেরা নিজের দোষে হত

হয়েছেন। অনুতপ্ত যুধিষ্ঠিরের প্রতি শত পুত্র বিধুরা জননীর এই স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাণী গান্ধারী চরিত্রকে অতুলনীয় করে ফুটিয়ে তুলেছে। এই ক্ষমা সুন্দর অভিব্যক্তি গান্ধারী চরিত্রে স্থানে স্থানে যে সামান্য ধৈর্যচ্যুতি দেখা গেছে, তা ম্লান করে, এই নারীকে মহীয়সী করে তুলেছে।

যুধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তুষ্ট হলেন। গান্ধারীও পুত্রশোক ভুলে পাণ্ডবদের নিজ পুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবদের মঙ্গলার্থে হোম ও স্বস্ত্যয়ণ করতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডু পুত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পুত্রদের কাছে পাননি।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধির ফলে পূর্বে যা ঘটেছিল, ভীম তা ভুলতে পারলেন না। এইভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত হল। ভীম প্রকাশ্য ভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কর্ম করতেন। একদিন ভীম বন্ধুদের নিকট গর্ব করে দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে পুত্র ও বান্ধবসহ হত্যা করার কথা বলেছিলেন। এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনতে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী স্থান কাল বুঝে নীরব রইলেন। একমাত্র গান্ধারী ব্যতীত অপর কেউ তা জানতে পারেনি।

তিনি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে বনগমন করলেন। কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয়ও তাঁদের অনুগমন করেন। এঁদের বনগমনের কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীসহ আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হয়ে রক্ষ, হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যসহ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গিয়ে একমাস সুখে তাঁদের সঙ্গে বাস করেন।

একদিন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে জানালেন তাঁর হৃদয় এখনও হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য বিদীর্ণ হচ্ছে। তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। গান্ধারী শোকগ্রস্ত হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন—

যোড়শমানি বর্ষাণি গতানি মুনিপুঙ্গব।

অস্য রাজ্ঞো হতান্ পুত্রান্ শোচতে ন শমো বিভো॥ (আশ্র) ২৯।৩৮

—মুনিবর, এই মহারাজের নিহত পুত্রদের জন্য শোক করতে আমাদের আজ ষোল বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর শান্তি লাভ হলো না।

এই ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। আপনি নিজের তপোবলে আজ সর্বপ্রকারে সবলোক সৃষ্টি করতে পারেন।

কিমু লোকান্তরগতান্ রাজ্ঞো দর্শয়িতুং সুতান॥ (আশ্র) ২৯।৪০

—এই রাজার লোকান্তরগত পুত্রদের সাক্ষাৎ ঘটান আপনার পক্ষে কি অসম্ভব?

ইয়ঞ্চ দ্রৌপদী কৃষ্ণা হতজ্ঞাতি সুতা ভৃশম।

শোচত্যতীব সর্বানাং স্নুষাণাং দয়িতা স্নুষা॥ (আশ্র) ২৯।৪১

—এই দ্রৌপদী কৃষ্ণা আমার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে অধিক প্রিয়। এই দীনা বধূর ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হয়েছে। সেইজন্য সে অত্যন্ত শোক করছে।

কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা সর্বদা নিজের পুত্র অভিমন্যুর বধে সন্তপ্ত হয়ে অত্যন্ত শোকমগ্ন রয়েছে।

মহারাজের যে শতপুত্র রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছে, তাদের এই সব পত্নীরা দুঃখ ও শোকের আঘাত সহ্য করতে করতে আমাদের শোক বৃদ্ধি করছে। এরা শোকে কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ঘিরে বসে আছে। এইরূপে তিনি শোক সন্তপ্ত সকলের হয়ে ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন, তাঁদের স্বর্গগত আত্মীয়দের দর্শন ঘটাতে।

কেবলমাত্র নিজের পুত্র পৌত্রাদি নয়, নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি যে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ইত্যাদি পাণ্ডব বধূদের জন্য ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেছিলেন, এতে গান্ধারী চরিত্রের মহত্ত্বই

প্রকাশ পেয়েছে। যাদের জন্য তিনি আজ নির্বংশ হয়েছেন, সেই সব আত্মীয়দের দুঃখের ভাগ নিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

ব্যাসদেব গান্ধারীকে বললেন তিনি তাঁদের মৃত আত্মীয়দের দর্শন করাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তৎপূর্বে তিনি কুরু-পাণ্ডব সকলের পূর্ব জন্মের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি আরও বললেন যে এটা দেবতাদেরই কাজ এবং এই পরিণতিও অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই জন্য দেবতাদের সব অংশই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

গন্ধর্ব, অপ্সরা, পিশাচ, গুহ্যক, রাক্ষস, পুণ্যজন, সিদ্ধ, দেবর্ষি, দেবতা, দানব সকলেই এই স্থানে অবতীর্ণ হয়ে এই কুরুক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন।

গন্ধর্বরাজো যো ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র ইতি শ্রুতঃ
স এব মানুষে লোকে ধৃতরাষ্ট্রঃ পতিস্তব ॥ (আশ্র। ৩১।৮

—গন্ধর্বলোকে যিনি বুদ্ধিমান গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত, তিনিই মনুষ্যলোকে তোমার পতি ধৃতরাষ্ট্র রূপে জন্ম নিয়েছে।

মরুদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজা পাণ্ডু, বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশ।

কলিং দুর্যোধনং বিদ্ধি শকুনিং দ্বাপরং তথা।
দুঃশাসনাদীন্ বিদ্ধি ত্বং রাক্ষসান্ শুভদর্শনে ॥ (আশ্র) ৩১।১০

—দুর্যোধন কলিযুগ, শকুনি দ্বাপর যুগ বলে জানবে। শুভদর্শনে তুমি নিজের দুঃশাসনাদি পুত্রদের রাক্ষস বলে জানবে।

ভীমকে মরুদেব অংশ, অর্জুনকে নর ঋষি বলে জানবে। কৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি অবতার। নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়। যে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল, সেই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু চন্দ্রের অংশ। দ্রৌপদীর সঙ্গে যে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হতে উদ্ভূত হয়েছিল সে অগ্নির শুভ অংশ, শিখণ্ডীরূপে এক রাক্ষস জন্মেছিলেন। দ্রোণাচার্য বৃহস্পতি ও অশ্বত্থামা রুদ্রের অংশ, ভীষ্ম মনুষ্যযোনিতে অবতীর্ণ বসু।

এঁরা সকলেই নিজেদেব কাজ সম্পন্ন করে স্বর্গলোকে চলে গেছেন। তোমাদের সকলের অন্তরে এঁদের জন্য যে দুঃখ রয়েছে, তা আমি আজ দূর করব' তোমরা সকলে গঙ্গাতীরে যাও, সেখানে নিহত আত্মীয়দের দেখতে পাবে।

তাঁরা গঙ্গাতীরে গেলেন এবং সেইখানে নিহত আত্মীয়দেব দর্শন লাভ করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠিব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, আপনি আমাকে ত্যাগ কববেন না আমি এখানে থেকে আপনার ও দুই মাতার সেবা করব। এই কথা শুনে ধৃতবাষ্ট্র বললেন, আজ হতে পিতৃপুরুষের পিণ্ড, সুযশ ও এই কুলের ভারও তোমাব উপর প্রতিষ্ঠিত হল। আজ কিংবা কাল তুমি অবশ্যি চলে যাবে আর বিলম্ব কব না। সঙ্গে সঙ্গে মাতা গান্ধারীও যুধিষ্ঠিবকে বললেন—

ত্বদ্যধীনং কুরুকুলং পিণ্ডশ্চ শ্বশুবস্য মে।।
গম্যতাং পুত্র পর্য্যাপ্তমেতাবৎ পূজিতা বয়ম্।
রাজা যদাহ তৎ কার্য্যং ত্বযা পুত্র পিতুর্বচঃ।।

(আশ্র) ৩৬।২৫-২৬

—এই সম্পূর্ণ কুরুবংশ এখন তোমার অধীন। আমাব শ্বশুরের পিণ্ডও তোমাবই উপর নির্ভর করছে। পুত্র, অতএব তুমি যাও। আমাদের পর্য্যাপ্ত সেবা কবেছ। তোমার দ্বাবা আমাদের সেবা শুশ্রূষা সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজা যা আজ্ঞা করেছেন, তাই কব। পিতার আজ্ঞা পালন করা তোমার উচিত।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে তাঁব অনুগামীদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করলেন।

যুধিষ্ঠিররা রাজ্যে ফিরে আসার দুই বৎসর পর একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন তাঁরা বন হতে প্রত্যাগমন করলে পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় সহ কুরুক্ষেত্র হতে গঙ্গাদ্বারে গমন করেন। সেখানে তাঁরা কঠোর তপস্যা শুরু করেন। ধৃতরাষ্ট্র কেবল

বায়ু সেবন করে মৌন ব্রত অবলম্বন করে মুখে প্রস্তর খণ্ড নিয়ে দিনপাত করছিলেন। (বীটং মুখে সমাধায় বায়ু ভক্ষোহভবন্মুনিঃ।)

গান্ধারী তু জলাহারা কুন্তী মাসোপবাসিনী। (আশ্র) ৩৭।১৪

—গান্ধারী কেবল জলপান করে। কুন্তী একমাস উপবাসান্তে একদিন ভোজন করে সময় অতিবাহিত করছিলেন।

এবং সঞ্জয় ষষ্ঠকাল অতিবাহিত করে একবার ভোজন করতেন।

একদিন সেই বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হল। সেই দাবাগ্নিতে সেই বন সম্পূর্ণ দগ্ধ হল। তপস্যায় দুর্বল ক্ষীণকায় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী পলায়নে অক্ষম হয়ে সেই দাবাগ্নিতে দগ্ধ হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে সঞ্জয় সেই বন ত্যাগ করেছিলেন। নারদ এই সংবাদ সঞ্জয়ের নিকট হতে পেয়েছেন।

স্বামীর সঙ্গে এই ভাবে যোগাসনে হুতাশনে আত্মাহুতি দিয়ে সতী নারী গান্ধারীর এই সহমরণ তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর করেছে।

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ রাজমহিষী ও ইন্দ্রজিৎ জননী মন্দোদরী বেদব্যাসের মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র পত্নী ও কৌরব জননী গান্ধারীর সমতুল্য প্রাধান্য লাভ করেননি। বাল্মীকি রামায়ণে সীতা চরিত্রের পাশে মন্দোদরী চরিত্র নিষ্প্রভ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরীকে তবু কয়েকবার দেখা গেছে, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পর পাঠকবর্গ মন্দোদরীকে কেবল রোরুদ্যমানা দেখতে পান।

গান্ধারীর মত মন্দোদরীও নির্ভীক ও দূরদর্শী ছিলেন।

রাবণ যখন কোন প্রকারে সীতাকে প্রলুব্ধ করে আপন বশে আনতে পারলেন না, তখন তিনি অধৈর্য্য হয়ে সীতাকে এক বৎসর তাঁর মন স্থির করবার জন্য সময় দিলেন। সেই এক বৎসরের দশমাস গত হলে রাবণ প্রচার করলেন যে অবশিষ্ট দুই মাসের মধ্যেও যদি সীতা তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করেন তবে তিনি সমুচিত শাস্তি পাবেন। এরূপ ভয় প্রদর্শনের উত্তরে সীতা স্বামী বিষ্ণু অবতারের সঙ্গে রাবণের তুলনা চলে না বলে রাবণকে অবজ্ঞা করলেন। তিনি নানা শ্লেষোক্তি দ্বারা রাবণকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কাটতে উদ্যত হলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় মন্দোদরী রাবণকে ভৎ‍র্সনা করে বললেন—

দেবতা গন্ধর্ব নহে জাতি যে মানসী।
কত বড় দেখি প্রভু জানকী রূপসী॥ (লঃ)

দেবতা, গন্ধর্ব নয়। সামান্য মানবীর জন্য রাবণের এই উন্মত্ততা শোভনীয় নয়।

কিন্তু রাবণ তখন সীতাকে দেখে উন্মত্ত। খাণ্ডা ফেলে উন্মাদের মত সীতাকে স্পর্শ করতে গেলে—

মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে ॥
নলকুবেরের শাপ পাসরিলে মনে ।
নারীরে ধরিলে বলে মরিবে পরাণে ॥ (সু:)

নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে কোন নারীর অসম্মতি সত্ত্বেও তাকে বলপূর্বক স্পর্শ করলে, রাবণের দশানন ভূলুণ্ঠিত হবে। সাবধানী পত্নী দুশ্চরিত্র স্বামীকে ঐ অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

রাবণ যখন অশোক বনে সীতাকে কাটবার জন্য খড়্গ তুলেছিলেন, তখন মন্দোদরীই পিছন থেকে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন—

পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ।
... ...
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত ॥
... ...
পাপেতে মজ না তাহে বধ করে নারী ॥ (ল:)

মন্দোদরী বার বার স্বামীকে এভাবে অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন, যেমন বারংবার গান্ধারী দুর্যোধনের পাপ কর্মে প্রশ্রয় দিতে ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করেছেন।

মন্দোদরীর এরূপ আচরণে তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে। পরস্ত্রীর প্রতি এবম্প্রকার উন্মত্ততায় স্বামীর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক স্বাভাবিক, তৎস্থলে স্বামীকে রক্ষা করবার আকুল চেষ্টা তাঁর মহত্বের ও উদারতার স্বাক্ষর।

এই দুই মহাকাব্যের এই নারীদ্বয়ের মধ্যে যে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কুলধারক বীরদের মধ্যে সেই দূরদৃষ্টির অভাবের জন্যই কুরুবংশ ও রাবণ বংশ ধ্বংস হয়েছিল।

মন্দোদরী চরিত্রও গান্ধারীর সমতুল্য প্রশংসনীয়। মন্দোদরী যদিও গান্ধারীর মত সর্বসমক্ষে স্বামী পুত্রকে ধিক্কার দেননি, কিন্তু

উভয় কুলক্ষয়ী যুদ্ধ হতে বিরত থেকে ধর্ম পথে চলতে স্বামী পুত্রকে কত অনুরোধ করেছেন।

ইন্দ্রজিৎ যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাবার পূর্বে মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে জননী মন্দোদরীকে প্রণাম করলেন, তখন জননী তাঁর দুই হাত ধরে বললেন ঃ—

……………আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্য ফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে॥
তোমা পুত্র গর্ভে ধরি হই পাটরাণী।
. . ..
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায়॥
নিত্য নিত্য মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত সহি মনস্তাপ॥
রামের সীতা রামে দেহ করহ পিরীতি।
মজিল কনক-লঙ্কা নাহি অব্যাহতি॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা হৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার॥
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর॥
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর—বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে॥
সীতা ফিরে দেন রাজা শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই করহ ঘোষণা॥ (লঃ)

গান্ধারীর মত তিনিও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সঙ্গে সন্ধি করবার পরামর্শ

দিয়েছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন যেমন গান্ধারীর, তেমনি স্বামী রাবণ বা পুত্র ইন্দ্রজিৎ মন্দোদরীর কথায় কর্ণপাত করেননি। গান্ধারী ও মন্দোদরী উভয় রাজমহিষী শিবের অনুগতা। গঙ্গাধরের অনুগ্রহে উভয়েই পুত্র পৌত্রে অত্যন্ত ভাগ্যবতী ছিলেন। কিন্তু পুত্রহারা হলেন তাঁরা পুত্রদের ও স্বামীদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণে উপেক্ষিতা মন্দোদরীকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে এঁকেছেন।

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে ইন্দ্রজিৎ যখন মাতার আশীর্বাদ মানসে তাঁর খোঁজ করছিলেন, তখন ত্রিজটা রাক্ষসী মন্দোদরী সম্বন্ধে তাঁকে বলল—

শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ। তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি।
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে।
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে
কার বা এ হেন মাতা ?

রাক্ষসপত্নী হলেও, এ ক্ষেত্রে গান্ধারীর থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না। পুত্রের হিতের জন্য তিনিও গান্ধারীর মত সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশের অধিনায়ক দেবাদিদেব মহাদেবের পদাশ্রিতা।

ইন্দ্রজিৎ যখন তাঁর দেখা পেয়ে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করলেন, তখন মন্দোদরী অশ্রু সিক্ত নয়নে বললেন—

কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ-শশী
আমার, দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ। মত্ত লোভে-মদে
সবন্ধু বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,

ক্ষুধায় কাতর, ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা। নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে।
এ কনক—লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে যেমন দুর্যোধনাদি পুত্ররা একের পর এক অন্যায় করে সবংশে নিধন হয়েছেন। গান্ধারী এ জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে কত অনুযোগ করেছেন তেমনি মন্দোদরীও পুত্রের নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করছেন যে তাঁর জন্য সোনার লঙ্কা ধ্বংস হবে। এখানে দুই বীর রাণীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্পষ্টবাদিতা প্রশংসার্হ।

উত্তরে ইন্দ্রজিৎ বললেন—

কেন, মা ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে! ও পদ-প্রাসাদে
চির-জয়ী-দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস। জানেন তাত বিভীষণ, দেবি।
তব পুত্র পরাক্রম, দম্ভোলি—নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী,
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র। কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?

সস্নেহে পুত্রের ললাটে সর্ব কল্যাণময় চুম্বন এঁকে মন্দোদরী বললেন—

মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,

নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে।
শুনেছি মৈথেলী নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে।
মায়াবী মানব রাম। কেমনে, বাছনি।
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে ?

মাতৃ হৃদয় অনাগত বিপদের ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গান্ধারী যেমন তাঁর ভ্রাতা শকুনিকেই কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য দায়ী করছিলেন। এখানেও তেমনি মন্দোদরী শূর্পণখাকেই রাবণ বংশ ধ্বংসের কারণ বলে নির্ণয় করছেন। গান্ধারী যেমন বার বার পাণ্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর শতপুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এখানেও মন্দোদরী রামের শক্তি সম্বন্ধে পুত্রকে সতর্ক করে এই মহাসমরে তিনি কিভাবে পুত্রকে বিদায় দেবেন তা বলে কাঁদতে থাকেন।

কিন্তু বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ বললেন—

কহিলা বীর-কুঞ্জর ;—পূর্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে ?
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি। হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে ; আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা

মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে।
ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী ! পূজি—ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি ! যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে !
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?

পুত্রের এই পৌরুষ উক্তিতেও জননী হৃদয়ের শঙ্কা দূর হলো না। তিন নয়ন জল মুছে—

উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ;—যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুণ এ কাল-রণে। এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই ! কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;—
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ।
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।

পুত্র বিরহ তিনি পুত্রবধুর মুখ দেখে ভুলবার সঙ্কল্প করলেন এবং পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য দেবতার চরণে প্রার্থনা জানালেন। জননীর পুত্রের জন্য এই আকুতি গান্ধারীর মধ্যেও দেখা যায়।

গান্ধারী অনেক ধীর স্থির। তাই যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দুর্যোধন যখন তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন, তিনি নির্ভীকভাবে বলতেন ধর্মের জয় হোক। কখনও বলেননি তোমার জয় হোক্ বা পুত্রকে বিদায় দেবার সময় এতটা আকুল হয়ে পড়েননি। ক্ষত্রিয় নারী ও রাক্ষস রমণীর মধ্যে এ পার্থক্য স্পষ্ট।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মত বীর পুত্রের শোকে জননী মন্দোদরীর বিলাপও পুত্র শোকাতুরা গান্ধারীর মত তেমনি করুণও মর্ম বিদারক :—

আমি নানা উপহারে, পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
... ...
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
... ...
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী॥ (লঃ)

বীর পুত্রের মৃত্যুতে শত্রুপক্ষের আনন্দ ও উল্লাস বেড়েছে। তাই আক্ষেপ করে মন্দোদরী বলেছেন :—

ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির। (লঃ)

এমন কীর্তিমান পুত্রের মৃত্যুতে মার অশ্রুধারা প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক। অন্যত্র মন্দোদরী বিলাপ করে বলেছেন :—

অযোনি সম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তার বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে॥

বজ্র যবে পুত্র করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
কোন লোক না যায় যেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার,
হায় পুত্র কি মোর জীবনে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি,
করিতে রাক্ষসকুল নাশ। (লঃ)

স্বামীর অপকীর্তির ফলে যোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে স্নেহময়ী জননীর করুণ বিলাপ পাঠকবর্গের হৃদয় স্পর্শ করে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে হনুমান যখন জ্যোতিষের বেশে রাবণের মৃত্যুবাণ সম্বন্ধে জানতে আসেন, মন্দোদরী সরল বিশ্বাসে তা তাঁর কাছে প্রকাশ করেন, ফলে হনুমান স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙ্গে রাবণের মৃত্যুবাণ নিয়ে যান।

রাবণ যখন তৃতীয় দিন যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখনও পুত্রহারা মন্দোদরী রাবণকে এই কুলক্ষয় যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হবার জন্য সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই কাল যুদ্ধ বন্ধ করতে বারবার পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মন্দোদরীর বিনয় নম্র ভাবও সুন্দরভাবে ফুটেছে।

পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর।
বিশ্রবা মুনির পুত্র পরম সুধীর॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে॥
... ...
আমি কি বুঝাব তোমায় হীন বুদ্ধি নারী।
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার॥
... ...
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য॥

কোন্ কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর॥
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ পরশে॥
শ্রীরাম মনুষ্য নয় বিষ্ণু অবতার।
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কার্য নাহি আর॥ (লঃ)

রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে যাবার পূর্বে রাবণকে যুদ্ধ হতে বিরত করতে—

মন্দোদরী বলে জানি ভাগ্য হলে হীন।
বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিত॥
সংসারের কর্তা রাম পতিত পাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন॥
সত্ত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রু ভাবে আইলেন মারিতে তোমারে॥
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে॥
যে জন পালন কর্তা সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥ (লঃ)

মন্দোদরীর এই উক্তিটি কি মধুর, বিধি যখন বাম হয়, তখন বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কি সুন্দর যুক্তি দিয়ে রাম ও সীতা যে স্বয়ং বিষ্ণু ও লক্ষ্মী তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক নানা অদ্ভুত অঘটন ও রামের অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করে মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন।

মন্দোদরীর মধ্যে গান্ধারীর তেজস্বিতার কোন আভাস নাই। সর্বত্র একটা বিনম্র ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুতে মন্দোদরীর বিলাপ বড় করুণ :—

আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাহ কোন স্থানে
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥ (লঃ)

ভক্তের বিপদে রাবণের আরাধ্য দেবদেবী শঙ্কর শঙ্করী কিছুই করলেন না বলে মন্দোদরী আক্ষেপ করেছেন, সীতার জন্যই এমন প্রলয় ঘটলো, শূর্পণখার পরামর্শে সীতা হরণ করে এই সর্বনাশ হয়েছে বলে আক্ষেপ করে বলেছেন :—

ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর বানরের রণে॥
... ...
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে॥
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায় কান্দে রাণী মন্দোদরী॥ (লঃ)

রাবণের মৃত্যুর পর বাল্মীকি রামায়ণেও মন্দোদরীর বিলাপের বর্ণনা আছে—

ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং এস্যত্যপি পুরন্দরঃ॥
ঋষয়শ্চ মহান্তোঽপি গন্ধর্বাশ্চ যশস্বিনঃ।
ননু নাম তবোদ্বেগাচ্চারণাশ্চ দিশো গতাঃ॥
স ত্বং মানুষ মাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জিতঃ।
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বরঃ॥ (লঃ) ১১৩।৩০৫

—তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমার সামনে দেবরাজ পুরন্দরও অবস্থান করতে ভয় পেতেন এবং মহর্ষি ও যশস্বী গন্ধর্বগণ তোমার ভয়ে দিগন্তে পলায়ন করতেন। এখন সেই তুমিই সামান্য মানুষ রামের

হাতে সম্মুখ রণে পরাজিত হলে, এতে তোমার লজ্জা হচ্ছে কি? তুমি বল এটা কি?

তুমি নিজ শক্তিবলে ত্রিলোক জয় করে বহু সম্পতি আহরণ করেছিলে। কিন্তু এখন একজন বনবাসী মানুষ তোমাকে নিহত করল—এটা অসহনীয়। তুমি ইচ্ছানুসারে বহু রকম রূপ ধারণ করে মানুষের অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচরণ করতে, সুতরাং রামের দ্বারা তোমার মৃত্যু কোন প্রকারে সম্ভবপর নয়। তুমি সর্বত্রই জয়লাভ করতে সেইজন্য এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এই মৃত্যু রামের কাজ বলে বিশ্বাস হচ্ছে না।

অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ।
মায়াং তব বিনাশায় বিধায়াপ্রতিতর্কিতাম্॥ (লঃ) ১১১।৯

—বোধহয় অতর্কিতে যম স্বয়ংই মায়াবলে রামরূপ ধারণ করে তোমাকে বধ করতে এসেছিলেন। তা তুমি জানতে পারনি।

মন্দোদরীর প্রবল পরাক্রান্ত স্বামীর মৃত্যুর উপলক্ষ সাধারণ একজন মানুষ। এ খেদ মন্দোদরীর বুকে প্রবল আঘাত দিল। যদিও তিনি রামকে মানুষরূপী নারায়ণ রূপে জানতেন, তবু প্রত্যক্ষতঃ তাঁকে মানুষ ভেবেই তাঁর এই দুঃখ।

মন্দোদরী পুনরায় স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ইন্দ্র এসে কি তোমাকে প্রচ্ছন্নরূপে বধ করলেন? অথবা তাই বা কিরূপে সম্ভব? তুমি দেবতাদের প্রবল শত্রু ও অতি তেজস্বী। রণক্ষেত্রে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবারই শক্তি ইন্দ্রের নেই। আমার মনে হচ্ছে রাম সামান্য মানুষ নয়। তিনি মহাযোগী, জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধন বিহীন, মহান হতেও মহান, সর্বান্তর্যামী, সৃষ্টিকর্তা, পরমপুরুষ, সনাতন ও পরমাত্মা হবেন।

মন্দোদরীও যে ধার্মিকা ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর বিলাপের মধ্যে।

তিনি বলেছেন—অনাদি পরমপুরুষ, শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু মানুষের রূপ ধরে ত্রিলোকের হিতকামনায় বানররূপী দেবগণের সহায়তায় তোমাকে বধ করেছেন। (মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্য পরাক্রমঃ)

স রাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্।
ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া॥

(যুঃ) ১১১।১৫

—রাক্ষস পরিবারের সঙ্গে মহাবল, মহাপরাক্রমী, ভয়াবহ ও দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করেছেন। পূর্বে ইন্দ্রিয়দের জয় করে পশ্চাৎ ত্রিলোক জয় করেছিলেন।

বোধহয় ইন্দ্রিয়রা সেই শত্রুতা স্মরণ করেই এখন তোমাকে পরাজিত করেছে। যখন জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর অসংখ্য রাক্ষসদের সঙ্গে নিহত হয়েছিল, আমি তখনই বুঝেছিলাম রাম সামান্য মানুষ নন (রামে ন মানুষঃ)।

সুরগণের দুষ্প্রবেশ্য এই লঙ্কানগরীতে হনুমান যখন বীর্যবলে প্রবেশ করেছিলেন, তখনই আমরা প্রথিত হয়ে বার বার বলেছিলাম—

ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া॥ (যুঃ) ১১১।১৮

—রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর।

তুমি তা শোননি। তারই ফল আজ ভোগ করলে। মনে হচ্ছে ঐশ্বর্য, স্বজনদের এবং নিজের বিনাশের জন্যই তুমি অকস্মাৎ বৈদেহীকে হরণ করেছিলেন। হা দুর্মতে, সীতা অরুন্ধতী ও রোহিনী অপেক্ষাও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ (অরুন্ধত্যা বিশিষ্টং তাং রোহিণ্যাশ্চপি দুর্মতে।)

বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম।

(যুঃ) ১১১।২১

—তিনি পৃথিবীর পৃথিবী, সৌন্দর্যগুণে লক্ষ্মীস্বরূপা।

সেই সীতাকে আনা তোমার উচিত হয়নি। তুমি তার সহবাস অভিলাষী হয়েছিলে, কিন্তু তা তোমার ভাগ্যে ঘটেনি।

কিন্তু ঃ—

পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো। (যুঃ) ১১১।২৩

—পতিব্রতা সীতার তপস্যানলে আমার স্বামী দগ্ধ হলেন।

তুমি যে সীতাকে হরণ করবার সময় দগ্ধ হওনি, কারণ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা তোমাকে ভয় করে চলেন।

শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমুগ্নুতে।
বিভীষণং সুখং প্রাপ্ত স্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্॥ (যুঃ) ১১১।২৬

—যারা সৎকর্ম করে তারা শুভফল এবং যারা পাপকর্ম করে, তারা অশুভ ফল পায়। যেমন বিভীষণ সুখী হল এবং তুমি এইরূপ দুঃখে পতিত হলে।

সীতা হরণই তোমার মৃত্যুর কারণ। যেহেতু বিনা কারণে কোন প্রাণীরই মৃত্যু হয় না। তুমি স্বয়ং সীতার নিমিত্ত মৃত্যুকে দূর হতে ডেকে এনেছিলে।

ত্বং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ।
ত্রৈলোক্যবস্তুভোক্তারং ত্রৈলোক্যোদ্বেগদং মহৎ॥
(যুঃ) ১১১।৪৮

—যিনি ত্রিলোকের ধনরত্ন ভোগ করতেন এবং ত্রিলোকবাসীকে উদ্বিগ্ন করতেন, সেই তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ হয়ে কি প্রকারে রামের হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুর বশীভূত হলে?

জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শঙ্করস্য চ।
দৃপ্তানাং নিগ্রহীতারমাবিষ্কৃত পরাক্রমম্॥ (যুঃ) ১১১।৪৯

—যিনি লোকপালদের জয় করেছেন, এমন কি শঙ্করও যাঁকে দেখলে ভয়ে চকিত হয়ে উঠতেন, গর্বিত ব্যক্তিরা যার হাতে নিগৃহীত হত, যিনি সর্বত্রই বিক্রম প্রকাশ করতেম, শক্তিশালী শত্রুকে বধ করে আত্মীয়দের রক্ষা করতেন এবং সহস্র সহস্র দানবেন্দ্রদের বধ করতেন, যিনি যুদ্ধে নিবাত কবচদের নিগ্রহ করেছেন, বহুবিধ যজ্ঞ

ভঙ্গ করেছেন। স্বজনদের রক্ষা করেছেন, ধর্ম ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা করে দিতেন, রণক্ষেত্রে যিনি মায়াজাল বিস্তার করতেন, দেব, দৈত্য ও মনুষ্যদের মধ্যে যেখানে ভাল সুন্দরী কন্যা পেতেন, তাকে হরণ করে আনতেন, শত্রু স্ত্রীদের শোকগ্রস্ত করতেন, দলপতি হয়ে ভয়ানক কাজ করতেন, তেমন প্রভাবশালী স্বামীকে রামের হাতে নিহত দেখেও আমি এখনও জীবিত আছি। হায় আমার প্রাণ কি কঠিন !! হে রাক্ষসেশ্বর, তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করতে এখন ভূতলে কি প্রকারে নিদ্রা যাচ্ছ ?

মন্দোদরীর এই শোক বিলাপ কুরুক্ষেত্রে মৃত দুর্যোধনাদি সন্তানদের জন্য গান্ধারীর বিলাপের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। রাবণ ও দুর্যোধন উভয়েই বীর। কিন্তু উভয়েরই শেষ শয্যা হলো রণাঙ্গনের কঠিন মাটিতে।

মন্দোদরী বিলাপ করে আরো বলেছেন—রাজকুমার ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণের হাতে নিহত হতে দেখে আমি তীব্র আঘাত পেয়েছিলাম, এখন আবার তোমার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হয়েছি।

হায় আমি সৌভাগ্যবতী হয়েও এখন বন্ধুজন ও তোমার অভাবে অনাথের ন্যায় অনন্তকাল শোক করব। তুমি অতি দুর্গম ও দীর্ঘ দূর পথে যাচ্ছ। অতএব এই দুঃখিনীকে সঙ্গে নাও। আমি তোমা বিনা জীবিত থাকতে চাই না। তোমার বিরহে আমি কাতর হয়ে বিলাপ করছি দেখেও, তুমি আমায় কোন প্রকার সম্ভাষণ না করে চলে যাচ্ছ !

আমি অবগুণ্ঠন খুলে নগর দ্বার হতে বহির্গত হয়ে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছি দেখেও কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছ না ?

মন্দোদরীর উপরের উক্তি, রাক্ষসরাজ রাবণের উশৃঙ্খল জীবন হলেও, তাঁর অন্তঃপুরে যে আভিজাত্য ছিল ও রাণীরা সম্ভ্রমে বসবাস রতেন তারই এক ছবি।

তিনি স্বামীর পাপ কর্মের কথা স্মরণ করে খেদ করে বলেছেন—

তুমি গুরুসেবা পরায়ণা ধর্মচারিণী কত পতিব্রতা সতীকে বিধবা করেছ তার ইয়ত্তা নেই। আমার মনে হচ্ছে শোকাতুরা সেই সব বিধবাদের অভিশাপেই এই ভাবে তুমি শত্রুর হাতে নিহত হলে। আজ তাদের অভিসম্পাতের ফল ফলেছে। চিরকাল নিজেকে বীর বলে জানতে এবং আত্মশক্তির দ্বারা ত্রিভুবনকেও আক্রমণ করেছিলে। তবে নারী হরণের ন্যায় হীন কাজে কেন তোমার প্রবৃত্তি হল ?

বোধ হয় তোমার কাল পূর্ণ হয়েছিল, তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সীতাহরণ রূপ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। এটা তোমার বিনাশের লক্ষণ। কারণ ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে তুমি এমন দুর্বলতা প্রকাশ করনি।

সত্যবাদী বিভীষণ জানকীকে হরণ করতে দেখে বলেছিলেন রাক্ষসদের বিনাশকাল উপস্থিত, এখন তাই ঘটল। মারীচ প্রভৃতি হিতৈষী সুহৃদবর্গ ও ভ্রাতৃগণ তোমার মঙ্গলের জন্য অনেক হিত কথা বলেছিলেন কিন্তু তুমি তা শোননি।

যে বিভীষণের স্বজন শত্রুতার সুযোগ পেয়ে রাম রাবণ বংশ ধ্বংস করেছিলেন, যাঁর জন্য রাবণের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, এই শোকে দুঃখেও তাঁর প্রতি মন্দোদরীর কোন বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়নি। বরং তাঁর সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করার পরিণামে রাক্ষসকুল ধ্বংস হওয়ার জন্য আক্ষেপ করেছেন। এখানেও মন্দোদরীর ন্যায়—নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্দোদরী বিলাপ করে রাবণের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি বল ও পৌরুষে ত্রিভুবনের মধ্যে বিখ্যাত ছিলে। সেজন্য তোমার জন্য শোক করা কর্তব্য নয়। কিন্তু স্ত্রী স্বভাব বশতঃ আমার বুদ্ধি শোকে অভিভূত হচ্ছে। তুমি নিজের পাপ পূণ্য নিয়ে তোমার গতি প্রাপ্ত হলে, আমি এখন তোমার বিরহে শোকে অভিভূত হচ্ছি।

মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন

তুমি নিজ শক্তির গর্বে তা গ্রাহ্য করনি বলেই এখন এইরূপ ফল লাভ করলে।

এই ভাবে শোক করতে করতে, মন্দোদরী স্বামীর বক্ষে মূর্ছিত হলেন। মন্দোদরীর এই অবস্থা দেখে তাঁর সপত্নীরা বললেন—

কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরধ্রুবা ॥
দশাবিভাগপর্য্যায়ে রাজ্ঞং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ।

(যুঃ) ১১১।৮৯-৯০

—দেবি, মানুষের আয়ু বা স্থিতি যে অনিত্য তা কি আপনি জানেন না ? বিশেষতঃ ভাগ্য বিপর্যয়ে চঞ্চল রাজলক্ষ্মী এরূপ হয়ে থাকেন।

সপত্নীদেব এই কথা শুনে মন্দোদরী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরী শোকে কাতর হয়ে বিলাপ করে বলেছেন :—

কারে দিয়া গেলে এ কনক লঙ্কাপুরী।
কারে দিয়ে যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী ॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে ॥
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥ (লঃ)

মন্দোদরী গান্ধারী অপেক্ষা অধিক হতভাগিনী। গান্ধারীর শত পুত্র ও আত্মীয় পরিজনের শোকের ভাগ নেবার জন্য তাঁর জন্মান্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গী ছিলেন। যাঁর সঙ্গে তিনি পরবর্তী জীবন একই সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন, কিন্তু মন্দোদরীর স্বামী, পুত্র সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর ব্যথার সাথী কেউ ছিল না —যিনি তাঁকে এই দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারেন বা তাঁর ব্যথার অংশ নিতে পারেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরীও অভিসম্পাত দিয়েছেন সীতাকে, যেমন গান্ধারী দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে। সীতা যখন স্বামী সমীপে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তখন শোকাতুরা মন্দোদরী সীতার উদ্দেশ্যে বলেন :—

তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥

... ...

আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে ॥
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টি তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥ (লঃ)

সীতার প্রতি মন্দোদরীর এই অভিশাপ অযৌক্তিক। এর দ্বারা মন্দোদরীর মনের নীচতা প্রকাশ পেয়েছে। নিরপরাধী লাঞ্ছিতা সীতার প্রতি তাঁর এই নির্মম উক্তি কোন প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নয়। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়েছে। এ কথা মন্দোদরী নিজেই যখন বার বার বলেছেন, তখন সীতাকে অভিসম্পাত দেওয়া কোন রকমেই সমীচীন হয়নি।

মন্দোদরীর এই অভিসম্পাতের মধ্য দিয়ে তাঁর নারী হৃদয়ের ঈর্ষাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যথা তিনি নিজেই বারংবার তাঁর পুত্র ও স্বামীকে বলেছেন রাবণ বংশ ধ্বংসের কারণ সীতা হরণ।

যদিও বাল্মীকি রামায়ণে মন্দোদরীকে মৃত স্বামীর বক্ষে বিলাপ করতে করতে অজ্ঞান হতে এবং পরে সপত্নীদের শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে রোদন করতে দেখা যায়, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে তারপর মন্দোদরী সম্বন্ধে আর কিছুই বলা হয়নি।

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী তাঁর স্বামীর হত্যাকারীকে দেখতে চাইলেন। কারণ মন্দোদরীর দৃঢ় বিশ্বাস রাম 'নারায়ণ'। রামকে মন্দোদরী প্রণাম করলে পর রাম

তাঁকে 'জন্মায়তী' হও বলে আশীর্বাদ করেন। শোকাতুরা মন্দোদরী তখন তাঁকে বলেন। স্বামীকে হত্যা করে 'জন্মায়তী' আশীর্বাদ করা উচিত নয়। রাম সত্যবাদী। কিন্তু এই আশীর্বাদ কি করে সত্য হবে? উত্তরে রাম বলেছিলেন :—

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা।
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত্ব ॥
রাবণের চিতা রহিবে সর্বথা।
চির কাল রবে আয়ত্বে ॥ (লঃ)

অন্যত্র বিভীষণের অভিষেকের পর রাম বিভীষণকে বলেছেন :—

মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে ॥
মন্দোদরী দিব তোমায় মম অঙ্গীকার।
রাজস্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার ॥
অতএব না ভাবিহ মৈত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন ॥ (লঃ)

গান্ধারী ও মন্দোদরী উভয়েই ধর্মশীলা নারী। উভয়েই যেন ধৈর্য্য ও সংযমের প্রতিমূর্তি। দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও তাঁদের ধর্ম বিচ্যুতি বা ধৈর্য্যচ্যুতি দেখা যায় না।

উভয়েই দূরদর্শিণী ছিলেন। সুতরাং উভয়েই তাঁদের স্বামীদের অনাগত ভবিষ্যৎ বিপদ হতে বারংবার সর্তক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা রাবণ কেউ-ই তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করায় উভয়ই নির্বংশ হন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন উভয়েরই। স্বামী সন্তান তাঁদের চোখের সামনে পায়ে পায়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেখেও, তাঁরা রাশ টেনে তাঁদের ধরে রাখতে পারেননি।

উভয়ই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ছিলেন। গান্ধারীর মধ্যে যে দীপ্তভাব

দেখা যায়, মন্দোদরীতে তার সম্পূর্ণ অভাব। পরন্তু মন্দোদরীর মধ্যে বিনম্র ভাবই অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে।

মন্দোদরী ও গান্ধারী জীবন আলোচনা করতে গিয়ে English Actor ও Dramatist William Havard এর একটি উক্তি মনে পড়ে—Misfortune does not always wait on vice, nor is success the constant guest of virtue.

ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ

True bravery is shown by performing without witness what one might be capable of doing before all the world—Rochefoucauld.

রামায়ণে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, মহাভারতে অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ও ভীমনন্দন ঘটোৎকচ উপরের উক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে দেবপ্রসাদ অর্জিত ইন্দ্রজিতের অমিত বিক্রম প্রদর্শন, কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে সুকুমার বালক অভিমন্যুর কৌরব সপ্তরথী রচিত চক্রব্যূহ ভেদ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাকালের মত ঘটোৎকচের আগমন এবং নির্বিশেষে কুরুসেনা নিধন, এবং যে ধ্বংস লীলার প্রতিরোধের জন্য অর্জুন বধের জন্য সুকল্পিতভাবে রক্ষিত একঘ্নী অস্ত্র কর্ণকে ঘটোৎকচের উপর প্রয়োগে বাধ্য করলে—পৃথিবীর বীরত্বের ইতিহাসে এই দুই শাশ্বত কাব্য গ্রন্থের মতই এ তিন বীরের বীর গাথা শাশ্বত হয়ে আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের—এই দুই মহাকাব্যের ত্রয়ী বীরের ভাগ্যের পরিণতি একই প্রকার হয়েছিল। তিন বীরই অল্প বয়সেই সমর ক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে প্রকৃত বীরের মত প্রাণ হারিয়েছেন। শৌর্যে বীর্যে তাঁরা সমতুল্য।

রাবণ ও মন্দোদরীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ। তাঁর অপর নাম মেঘনাদ। কথিত আছে ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি মেঘের মত গর্জন করেছিলেন, তাই পিতা রাবণ তাঁর নাম রেখেছিলেন মেঘনাদ। রাজদুলাল মেঘনাদের শৈশব লীলার কোন কাহিনী এ অমর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণকে পরাভূত হতে দেখে মেঘনাদ মায়ার দ্বারা ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে যান। প্রজাপতি ব্রহ্মা

ইন্দ্রকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে লঙ্কায় এসে মেঘনাদের বীর্য দেখে সন্তুষ্ট হয়ে রাবণকে বলেন যে, তাঁর পুত্র মেঘনাদ শক্তিতে পিতা রাবণকেও অতিক্রম করেছেন। তাঁর এই পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে খ্যাত হবেন, যেহেতু তিনি ইন্দ্রকে জয় করেছেন।

অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ ! বীর্য্যবান।
জগতীন্দ্রজিদিত্যের পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ (উঃ) ৩০।৫

—রাবণ তোমার এই পুত্র অত্যন্ত বীর। আজ হতে সে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হবে।

ইন্দ্রর মুক্তির পণ স্বরূপ দেবতারা তাঁর ইচ্ছামত বর তাকে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

ইন্দ্রর মুক্তিপণ স্বরূপ মেঘনাদ ব্রহ্মার থেকে অমরত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা এ সম্বন্ধে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে, তখন মেঘনাদ বলেন আমি যখন শত্রুকে জয় করবার জন্য যুদ্ধে যাত্রার পূর্বে মন্ত্রযুক্ত হবির আহুতিতে অগ্নিদেবের পূজা করবো, তখন অগ্নি হতে আমার জন্য এমন অশ্বযুক্ত রথ উঠবে যে, তাতে চড়লে কেউ আমাকে বিনাশ করতে পারবে না—এ বরই আমাকে দিন। যদি আমি যুদ্ধের জন্য জপ বা অগ্নিতে হোম ইত্যাদি করতে বসে তা সমাপ্ত না করে যুদ্ধের জন্য সমরাঙ্গনে যাই, তাহলে আমার বিনাশ ঘটবে।

সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান।
বিক্রমেণ ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্ত্তিতম্ ॥ (উঃ) ৩০।১৭

—দেব, সমস্ত লোক তপস্যা করে অমরত্ব বর লাভ করে থাকে; কিন্তু আমি পরাক্রম দ্বারা অমরত্ব বর লাভ করলাম।

ব্রহ্মা মেঘনাদকে ঐ প্রকার বর দিলেন। মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্তি দিলেন এবং দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে ঋত্বিকরূপে বরণ করে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় নিকুম্ভিলা নামক

উপবনে সাতটি যজ্ঞ করেছেন। মহেশ্বরের পূজা সম্পন্ন করে মহাদেবের আশীর্বাদে তিনি অনেক বর লাভ করেছিলেন, এবং তিনি যত্র তত্র গমনকারী একটি দিব্য রথ দিয়েছিলেন ও ইন্দ্রজিৎ তাঁর থেকে নানা মায়া বিদ্যা লাভ করেছিলেন। শুক্রাচার্য রাবণকে বললেন,

মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুংভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ ॥ (উঃ) ২৫।৯

—অতি দুর্লভ মাহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করলে সাক্ষাৎ ভগবান্ পশুপতির নিকট হতে আপনার পুত্র মেঘনাদ বহু বর লাভ করেছে।

অভিমন্যুও তাঁর পিতা অর্জুন থেকে সব রকম শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন এবং পিতার ন্যায়ই প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন।

মেঘনাদের বহু পত্নী ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে মাতৃ-সকাশে গেলেন তখন মন্দোদরী তাঁকে বলেছিলেন :—

রূপে গুণে বীর তুমি পরম সুন্দর।
দেব-দানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥
নয় হাজার নারী তব পরমা সুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী ॥ (লঃ)

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ প্রকৃত বীর ছিলেন। মন্দোদরী যখন তাঁকে এক রাত অন্তঃপুরে থেকে স্ত্রীদের সেবা গ্রহণ করতে বললেন, বীর ইন্দ্রজিৎ উত্তরে বলেন :—

যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি ॥
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে।
কোন লাজে গৃহ মাঝে থাকিব এক্ষণে ॥ (লঃ)

ইন্দ্রজিতের এই প্রকার উক্তি বীর জনোচিত বটে। সত্যিকার বীরকে কখনো এভাবে প্রলুব্ধ করা যায় না।

হনুমান লঙ্কায় সীতার সন্ধানে আসেন। সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের পর তিনি ভাবলেন, হঠাৎ লঙ্কায় এসে হঠাৎ এমনি ভাবে চলে গেলে রাবণ কিছুই জানতে পারবে না।

রামের কিঙ্কর যাবে সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস। (সুঃ)

যুগপৎ সীতার আনন্দ বিধানের জন্য ও রাবণ হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করবার জন্য তিনি অশোকবন ছারখার করেন, আম্রবন ভঞ্জন করেন ও বনরক্ষীদের সংহার করেন। রাবণ আটটি রাক্ষসকে হনুমানকে বন্দী করে আনতে পাঠালেন। হনুমান তাদেরও নিহত করেন। রাজপুত্র অক্ষকুমার পিতৃ আজ্ঞায় হনুমানকে বধ করতে গিয়ে নিজেই নিহত হয়। অবশেষে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে আজ্ঞা করে বলেন, হে প্রিয় পুত্র, তোমাকে সঙ্কটে পাঠানো আমার উচিত নয়, তথাপি রাজধর্মানুসারিগণের এবং ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এইরূপ বুদ্ধিই শাস্ত্রসম্মত। হে অরিন্দম, ক্ষত্রিয় ও রাজধর্মানুগামীগণের ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও সংগ্রামে নৈপুণ্য লাভ অবশ্য কর্তব্য অথচ রণে বিজয় লাভও একান্ত কাম্য। পিতাপুত্রের দৃষ্টিকোণ সমতুল্য।

পিতৃ আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধার্থে গেলেন। হনুমান ও ইন্দ্রজিৎ উভয়ে মুখোমুখি হলেন। হনুমান নিজ দেহ বড় করে বায়ু পথে বিচরণ করে ইন্দ্রজিতের সব শর ব্যর্থ করে দিলেন। এদিকে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বধ করবার কোন সুযোগ পেলেন না। আর হনুমানও ইন্দ্রজিৎকে কি ভাবে বধ করা যায় বুঝতে পারছে না। অথচ এই বীরদ্বয় পরস্পারের সম্মুখীন হয়ে অসহ্য বেগে যুদ্ধ করে চলেছেন। অবশেষে হনুমানের প্রতি নিপতিত সমস্ত শর ব্যর্থ হওয়ায়,

জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগ সমাহিতাত্মা ॥ (সু:) ৪৮।৩৪

—মহাত্মা (ইন্দ্রজিৎ) ধ্যান যোগে হনুমানের স্বরূপ জানবার জন্য অতিশয় চিন্তা করতে লাগলেন।

ধ্যানযোগে হনুমানের অবধ্যত্ব জানতে পেরে তিনি এই বানরকে নিগৃহীত করার জন্য বন্ধন করতে পারেন এরূপ চিন্তা করলেন। অস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানতে পেরে পবনপুত্র হনুমানকে অস্ত্র দ্বারা বন্ধন করলেন। অবশেষে হনুমান স্বেচ্ছায় সেই অস্ত্রে বদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। হনুমান ভাবলেন রাক্ষসরা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গেলে ভালই হবে। রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। রাক্ষসরা হনুমানকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করতে লাগল। হনুমান রাক্ষসদের রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হওয়া মাত্রই ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধন হতে মুক্ত হলেন। যেহেতু ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধন অন্য কোন বন্ধনের অনুকরণ করে না। ইন্দ্রজিৎ অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র বিমুক্ত বৃক্ষ বল্কল রজ্জুবদ্ধ বানরকে মন্ত্রিদের সঙ্গে উপবিষ্ট রাজা রাবণের দৃষ্টিগোচর করলেন (হনুমান চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমেষে ॥
কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ জিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ ॥
... ...
সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর ॥
দেখি হনুমানের সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥
পাতা লতা খাইস বেটা পরিস্ কাছুটি।
মরিবারে হেথা আসি করিস্ ছটফটি ॥

সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে॥ (স্বঃ)

হনুমান ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে প্রথমে পরস্পরের প্রতি গালাগালির পালা গেল। পরে প্রচণ্ড যুদ্ধ। উভয়েই সমান যোদ্ধা। অবশেষে

ইন্দ্রজিৎ বলে আমি পাশ অস্ত্র জানি।
পাশ অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি॥ (স্বঃ)

বিভীষণ যখন রাবণকে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে অনুরোধ করেন, তখন ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলেছিলেন—

কিন্নাম তে তাত কনিষ্ঠ বাক্য
মনর্থকং বৈ বহুভীত বচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্য্যাৎ॥ (লঃ) ১৫।২

—কনিষ্ঠতাত, অত্যন্ত ভীরুর মত আপনি কি বলছেন। যে ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ করেনি, তেমন ব্যক্তিও এ ধরণের কথা বলবে না। বা এ ধরণের কাজ করবে না।

বিভীষণের অনুরোধ রাজা রাবণের রাক্ষসকুলের উপযুক্ত নয়। ইন্দ্রজিৎ আক্ষেপ করে বলেন :—

সত্ত্বেন বীর্য্যেণ পরাক্রমেণ
ধৈর্য্যেণ শৌর্য্যেণ চ তেজসা চ।
এষঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো
বিভীষণস্তাতকনিষ্ঠ এষঃ॥ (লঃ) ১৫।৩

—আমাদের এই রাক্ষসকুলে একমাত্র এই কনিষ্ঠতাত বিভীষণই বল; বীর্য, পরাক্রম, ধৈর্য, শৌর্য এবং তেজোহীন।

সেই মানব রাজপুত্রদ্বয় কোন্ ছার? অতি সাধারণ এক রাক্ষসেই তাদের নিহত করতে পারে। ভীরু কাপুরুষ কি জন্য আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?

ইন্দ্রজিৎ মহা পরাক্রমশালী বীর এবং নিজের বীরত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন—

ত্রিলোকনাথো নন্নু দেবরাজঃ
শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ।
ভয়ার্দ্দিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ
সর্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ॥ (লঃ) ১৫৫

—ত্রিভুবনপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমি ধরাতলে নিবিষ্ট করেছিলাম। সেই সময় সমস্ত দেবতামণ্ডলী ভীত হয়ে দশদিকে পলায়ন করেছিলেন।

আমি বলপূর্বক ঐরাবত হস্তীর দন্তদ্বয় উৎপাটন করে তাকে ভূতলে নিপাতিত করলে সেই সময় সে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে থাকে। এই পরাক্রম দ্বারা আমি দেবতাদের সন্ত্রস্ত করেছিলাম। দেবতাদের দর্পহননকারী প্রধান প্রধান দৈত্যদের শোকজনক অত্যন্ত পরাক্রমশালী আমি কেন সাধারণ মানুষ রাজকুমারদ্বয়কে জয় করতে পারব না?

ইন্দ্রজিতের মতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে বশ্যতা স্বীকার করা কাপুরুষোচিত। ঐরূপ উক্তির মধ্যে ইন্দ্রজিতের বীর রাজপুত্রের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার অমিত শক্তির জন্য তাঁর অহমিকাও এখানে অস্পষ্ট নয়।

অন্যত্র ইন্দ্রজিৎ রাবণকে বলেছেন :—

আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্য জনে।
আজ্ঞা কর মোরে আমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥ (লঃ)

মন্দোদরী রাম রাবণের যুদ্ধের পরিণতি কি হবে তার পূর্বাভাষ দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে যেতে দেবেন না বলেন, কেন না :—

বানরে পোড়ায় লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার॥

বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর ॥
আনিল রামে সীতা করিয়া হরণ। (লঃ)

ইন্দ্রজিৎ জননীকে প্রবোধ দিয়ে পিতা রাবণের নিন্দা করতে বারণ করেন। পিতৃকার্য সম্পূর্ণ সমর্থন করে তিনি বলেন :—

জগতের কর্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্টলোক পালে জিনি দুর্জয় প্রতাপ ॥
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ সমাজে ॥
... ...
স্বামী নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥
... ...
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ।
বল দেখি পাপ না করেছে কোন্ জন ॥
... ...
কদাচার নাহি করে আছে কোন জন ॥
রাম যে মনুষ্য জাতি নহে ত গর্বিত।
আনিল তাহার নারী কোন অনুচিত ॥
খর-দূষণ মারিয়া হয়েছে রাম বৈরী।
ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী ॥ (লঃ)

অতএব রাবণ কোন গর্হিত কাজ করেন নি। বীরের চোখে পরনারী হরণ দোষণীয় নয়, পিতৃনিন্দা হতে বিরত থাকতে ইন্দ্রজিতের জননীকে অনুরোধের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, উপরন্তু ঐ ভক্তি অন্ধ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পিতার সব রকম দুষ্কর্মকেও তিনি সমর্থ করেছেন। সীতা হরণের যে যুক্তি ইন্দ্রজিৎ মাতার নিকট তুলে ধরলেন তা নৈতিক

দিক হতে কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য না হলেও ইন্দ্রজিতের নিকট ঐ যুক্তি অত্যন্ত প্রবল ও অকাট্য।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। রাবণ লঙ্কা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। নগরের প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে এক একজন বীর মহারথী রাক্ষসকে রক্ষার জন্য নিয়োগ করেছেন।

মায়াবী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দ্বার রক্ষা করবেন রাবণ এই নির্দেশ দিলেন।

প্রথম দিনে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যেমন ইন্দ্র বজ্রদ্বারা প্রহার করেন, তেমনি ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ শক্রসৈন্য বিদারণকারী বীর অঙ্গদকে গদার দ্বারা আঘাত করলেন, কিন্তু বালিপুত্র অঙ্গদ তার গদার দ্বারা ইন্দ্রজিতের সারথি ও অশ্বের সঙ্গে সুবর্ণ খচিত রথ চূর্ণ বিচূর্ণ করল। এইভাবে অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

রাত্রিতেও বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হয়। অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে আঘাত করে সত্বর তার সারথি ও অশ্বদের নিহত করল।

ইন্দ্রজিত্তু রথং ত্যক্ত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্গদেন মহায়স্তস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ (যুঃ) ৪৫।২৯

—অঙ্গদের দ্বারা অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় এবং মহাক্লেশে পতিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করে সেই স্থানে অন্তর্হিত হলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ বালিপুত্র অঙ্গদের হাতে পরাজিত হয়ে ইন্দ্রজিতের অত্যন্ত ক্রোধ হল। রণক্লিষ্ট পাপী ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত হলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকায় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিৎ তাকে বললেন—

মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় তোর কোন বাপে আজি রক্ষা করে॥

যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম করিস্ তার কাজ ॥
খাইব ঘাড়ের মাংস কামড়াইয়া মাস।
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ ॥
দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না করিস্ সাধ।
অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ ॥ (লঃ

এখানে ইন্দ্রজিতের কূট রাজনীতি জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রণকৌশলে পরাস্ত হয়ে ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার উদ্দেশ্যে রামের বালিবধের কাহিনী তুলে ধরেন, অঙ্গদের প্রবল পরাক্রমকে নিস্তেজ করবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে।

সব রকম রণনীতি ও রাজনীতিতে যে ইন্দ্রজিৎ দক্ষ, উপরোক্ত উক্তি হতে তা প্রতীয়মান হয়।

পরাজিত ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে—

মেঘের আড়ে থেকে মারি নব আর বানর ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিও সাধ ॥
নির্বল রাক্ষস মারি হরিষ অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর ॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চড়া। (লঃ)

অন্যত্র তিনি স্বয়ং রামকে উপেক্ষাচ্ছলে উপহাস করে নিজের শক্তির ও কৌশলের অহঙ্কার করে বলেছেন :—

মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস ॥
সহস্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে না দেখিবি নর আর বানর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি ॥ (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে বজ্রের ন্যায় তেজদীপ্ত শাণিত শর বর্ষণ করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রুষ্ট ইন্দ্রজিৎ ভীষণ সর্পময় বাণসমূহের দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলেন। তাঁদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হল। অদৃশ্যভাবে কূট যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করে সর্পাকারে বাণ বন্ধনে বন্ধন করল। বানররা দেখলো ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বীরদ্বয়কে সর্পাকার বাণের দ্বারা বন্দী করেছেন।

প্রকাশ রূপস্তু যদা ন শক্ত
স্তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্রঃ।
মায়াং প্রয়োক্তুং সমুপাজগাম
ববন্ধ তৌ রাজসুতৌ দুরাত্মা ॥ (যুঃ) ৫৪।৩৯

—রাক্ষসরাজপুত্র যখন প্রকাশ্য যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে পরাজিত করতে পারল না; তখন দুরাত্মা মায়ার দ্বারা ঐ রাজপুত্রদ্বয়কে বন্ধন করল।

ইন্দ্রজিতের বাণাঘাতে রাম-লক্ষ্মণ সংজ্ঞা হারালে বানররা শোকাভিভূত হলো। সর্বত্র মায়াচ্ছন্ন থাকায় বানররা ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলো না। কিন্তু বিভীষণ মায়াদৃষ্টি দ্বারা প্রচ্ছন্ন অপ্রতিমকর্মা ও রণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দেখলেন।

ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ।
উবাচ পরম প্রীতো হর্ষয়ন্ সর্ব রাক্ষসান্ ॥ (যুঃ) ৬৪।১১

—ইন্দ্রজিৎ উভয়কে (রাম লক্ষ্মণ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে শায়িত দেখে সমস্ত রাক্ষসদের আনন্দ বর্ধন করে নিজের পরাক্রম বর্ণনা করতে লাগলেন।

দূষণ ও খরহন্তা বীর রাম লক্ষ্মণ আমার বাণে নিহত হয়েছে। যদি মুনিগণ, দেবমণ্ডলী ও অসুরগণ উপস্থিত হয়, তাহলেও এই শর বন্ধন হতে উভয়কে মুক্ত করতে পারবে না। যার জন্য চিন্তিত ও

শোকার্ত আমার পিতা বিনিদ্র রজনী যাপন করছে, যার জন্য সমস্ত লঙ্কা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, আমি আমাদের সেই ভয়ঙ্কর শত্রুকে নিহত করেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও বানরদের সমস্ত পরাক্রম শরতের মেঘের মত নিষ্ফল হয়েছে। রাক্ষসদের এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ বানরদের পীড়িত করতে আরম্ভ করলেন।

এইখানে ইন্দ্রজিতের কবি সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস, তবুও তিনি যে শিক্ষিত উপরোক্ত উপমা নিচয়ে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতঃপর ইন্দ্রজিৎ নয় বাণের দ্বারা নীলকে আহত করেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদকে তিন বাণে ক্ষতবিক্ষত করলেন। এক বাণের দ্বারা জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করে, বেগবান হনুমানের প্রতি দশটি শর নিক্ষেপ করলেন। গবাক্ষ ও শরভঙ্গকেও দুটি বাণে আহত করলেন, তারপর ইন্দ্রজিৎ বহু শরের গোলাঙ্গুলেশ্বর গবাক্ষকে এবং অঙ্গদকে বিদীর্ণ করলেন। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ প্রধান প্রধান বানর যূথপতিকে আহত করে অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর বাণ বিদ্ধ বানরদের পীড়িত ও ভীত হতে দেখে ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করে বললেন—

শর বন্ধেন ঘোরেণ ময়া বদ্ধৌ চমূমুখে।
সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ॥ (যুঃ) ৬৪।২৪

—ওহে রাক্ষসরা, দেখ, আমি ভীষণ বাণ বন্ধনের দ্বারা এই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে এক সঙ্গে বন্দী করেছি।

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে রাক্ষসরা অত্যন্ত বিস্মিত ও হৃষ্ট হয়েছিল, এবং মহা সিংহনাদ করতে লাগল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ স্পন্দনহীন রামলক্ষ্মণকে মৃত মনে করে হৃষ্টচিত্তে রাবণকে এই শুভসংবাদ দিতে লঙ্কায় গেলেন। রাবণ যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করলেন—

যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর ॥

... ...

চূর্ণ কৈল রথছত্র মারিল সারথি ॥
আপনা রাখিতে আমি হইলাম কাতর।
প্রাণ ভয়ে পলাইলাম আকাশ উপর ॥

... ...

রাম লক্ষ্মণ বিন্ধিয়া করিলাম খান খান ॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্ত মাত্র না রাখিলাম শরীর ভিতর ॥

... ...

ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশে প্রচণ্ড প্রতাপ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
সাপ হয়ে চলে বাণ আকাশ ধরে ফণা।
হাত পায় গলায় বান্ধিল দুই জনা ॥
ত্রিভুবন মিলে যদি করে আকিঞ্চন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

তবু না খসিবে নাগ পাশের বন্ধন ॥ (লঃ)

এইখানে ইন্দ্রজিৎ নর ও বানরের সঙ্গে যুদ্ধ দেব দানবের যুদ্ধ থেকে কঠিন, তা স্বীকার করেন ও অকপটে স্বীয় পরাজয়ের কথা পিতৃ সমীপে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। দেবতা গন্ধর্বের তুলনায় নর ও বানরের শক্তি যে দুর্জয় তিনি তা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এইরূপ কিছু প্রকাশ পায়নি।

ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে কি ভাবে নাগ পাশ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তাও জানালেন। কিন্তু এই বন্ধন সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা-

বশতঃ তিনি ভেবেছিলেন যে নাগপাশ ছিন্ন করে রাম লক্ষ্মণ পুনরায় যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না।

বিজয়ের আনন্দে ইন্দ্রজিৎ আত্মহারা। বিনতার পুত্র মহাবল গরুড় জ্বলন্ত অগ্নির মত সে স্থানে উপস্থিত হলে নাগপাশের সমস্ত নাগ ছুটে পালিয়ে যায়। মহাবীর গরুড়ের স্পর্শ মাত্র রাম লক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত মিলিয়ে গেল এবং তাঁরা সুস্থ সবল হয়ে গা ঝেড়ে উঠলেন।

বাল্মীকি রামায়ণের মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কায় এসে পিতার সামনে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাবণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে অভিবাদন করে—

প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। (যুঃ) ৪৬।৪৬

—রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েছে—এই প্রিয় সংবাদ পিতাকে বললেন।

তাঁর শত্রুদ্বয় নিহত হয়েছে—এই কথা শুনে রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থিত রাবণ সানন্দে লাফ দিয়ে উঠে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। রাবণ হৃষ্টচিত্তে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জিজ্ঞেস করলেন। ইন্দ্রজিৎও যেভাবে রাম লক্ষ্মণকে বাণ বিদ্ধ করে নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ করেছিলেন, তা পিতার নিকট আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করলেন।

এই সংবাদ শুনে রাবণ আনন্দিত হয়ে পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করে লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করলে, রাবণ সীতাকে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়ে মৃত রাম লক্ষ্মণকে দেখাতে রাক্ষসীদের সঙ্গে রণভূমিতে পাঠালেন। তাঁদের দেখে সীতা কাঁদতে লাগলেন। রোরুদ্যমানা সীতাকে আশ্বাস দিয়ে ত্রিজটা রাক্ষসী জানালো যে রাম লক্ষ্মণ জীবিত হবেন। সীতাকে লঙ্কায় ফিরিয়ে আনা হলো। রাম লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে বিভীষণ বিলাপ করলে সুগ্রীব তাঁকে সান্ত্বনা দিল। গরুড় এসে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশ হতে মুক্ত করল।

রামের বন্ধন মুক্ত হবার সংবাদ পেয়ে রাবণ চিন্তিত হলেন। পুনরায় উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হলো। রাক্ষস বীররা বানর সেনাদের নিকট পরাস্ত হতে লাগলো। এমন কি লক্ষ্মণের শক্তি প্রহারে রাবণেরও সংজ্ঞা লোপ পায়। পরে চেতনা লাভ করে রামের নিকট পরাস্ত হয়ে লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

যুদ্ধে বার বার পরাজিত আত্মীয় বান্ধবের শোকে অভিভূত রাবণ চোখের জল সংবরণের চেষ্টা করছেন দেখে ইন্দ্রজিৎ তাকে সাহস দিয়ে বললেন—

> ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে।
> যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ॥ (যুঃ) ৭৩।৪

—হে তাত ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকাকালীন তোমার শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

এই উক্তির দ্বারা তিনি রাবণকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকেন এবং ইন্দ্রজিৎ নীলের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাকে বলেছেন ঃ—

> ....বেটা ভ্রমেছিলি বনে।
> কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে॥
> ... ...
> লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ॥
> গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
> মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম॥
> সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে।
> ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গরুড় নিশ্বাসে॥
> পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেন প্রাণ দান।
> ধিক্‌রে বানরা তার করিস্‌ বাখান॥ (লঃ)

এখানে তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার খেদ নীলের উপর যেন আরোপ করেছেন।

অতঃপর মেঘের অন্তরালে থেকে তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ বা বানর সেনা কোন রকমে ইন্দ্রজিতকে পরাভূত করতে পারছিলেন না। এর কারণ দেবতার বরে ইন্দ্রজিত যুদ্ধের প্রাক্কালে নিকুম্ভিলাতে যথাবিধি হোমার্চনা করে এবং অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলে—তিনি অবধ্য।

যুদ্ধে বানর নেতারা প্রত্যেকেই তাঁকে জানিয়ে দেয় যে সপুত্র রাবণকে নিধন করে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসানো হবে। নীল, অঙ্গদ, সুগ্রীবের ন্যায় হনুমানও একই প্রতিজ্ঞা বাণী শোনাল।

বাল্মীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন, তাঁর বাণাঘাতে কেউ প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। আজ আপনি লক্ষ্মণ সহ রামকে আমার শাণিত বাণজালে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত প্রাণহীন হয়ে ভূলুণ্ঠিত দেখবেন।

ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ
সুনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন
সন্তর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ॥ (যুঃ) ৭৩।৬

—আমার পৌরুষ ও দৈবযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা শুনুন—অদ্যই আমি লক্ষ্মণ সহ রামকে বাণে সন্তর্পিত করব।

আজ ইন্দ্র, যম, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাধ্যগণ বলি রাজের যজ্ঞে বিষ্ণুর ন্যায় আমার বিক্রম দেখতে পাবেন—এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশ নিয়ে ধনু ও খড়্গাদিযুক্ত উত্তম গাধা চালিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ইন্দ্রের রথের ন্যায় রথে আরোহণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করলে, অন্যান্য রাক্ষসরাও তাঁর অনুগমন করল। বৃহৎ সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত পুত্রকে যুদ্ধে গমন করতে দেখে রাবণ ইন্দ্রজিতকে বললেন, হে পুত্র, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রথী কেউ নেই। তুমি বাসবকে জয় করেছ। তোমার পক্ষে মানুষ আবার কি? তুমি নিশ্চয়ই রাঘবকে হত্যা করে আসবে।

ইন্দ্রজিৎ পিতার আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য নিকুম্ভিলায় উপনীত হয়ে নিজের রথের চতুর্দিকে রাক্ষসদের রেখে মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নিতে যথাবিধি হোম করলেন। অগ্নি স্বয়ং উঠে সেই হবি গ্রহণ করলেন, পরে ব্রাহ্মণ মন্ত্র বিশারদ ইন্দ্রজিৎ নিজের অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে অভিমন্ত্রিত করলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে এইরূপ আহুতি প্রদান পূর্বক ধনু, বাণ, অসি, মূল এবং অশ্ব ও রথসহ আকাশে অন্তর্হিত হলেন। সৈন্যদের সমরাসক্ত দেখে রাবণ নন্দন সকোপে বললেন —তোমরা বানর সংহার কামনায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ কর। ইন্দ্রজিৎও বানরদের ছেদন করতে লাগলেন। বানররাও ইন্দ্রজিতের প্রতি প্রস্তর ও বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগল। তখন ইন্দ্রজিত ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক এক বাণে পাঁচ-সাত বা নয়জন বানরকে আহত করলেন। ক্ষত বিক্ষত জ্ঞানহীন হয়ে বানররা পলায়ন করতে লাগল। রামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প নিয়ে বানররা ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করে বৃক্ষ, পর্বতাগ্র ও প্রস্তররাশি বর্ষণ করতে লাগল। অপর পক্ষে ইন্দ্রজিৎ সর্প, বিষতুল্য ও অগ্নি সদৃশ বাণ সমূহে সেই বানর সেনাদের বিদ্ধ করতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ প্রবল যুদ্ধ করে বানরদের প্রধানদেরও শরবিদ্ধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ মহারণে আকাশ মার্গে অন্তর্হিত থেকে বানর সৈন্যদের উপর উগ্র বাণজাল বর্ষণ করতে লাগলে সেই পর্বত প্রমাণ মায়া মোহিত বানররা ইন্দ্রজিতের বাণে পীড়িত হয়ে চীৎকার করে ভূতলে পতিত হতে লাগল। এই ভাবে, ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণ সহ বানরদের পরাজিত করে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাক্ষসরা তাঁকে সম্মানিত করল এবং তিনি রাবণের সমীপে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে হৃষ্টচিত্তে পিতা রাবণকে সমস্ত নিবেদন করলেন।

অন্যদিকে জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমান গেলেন এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

এই ওষধির গন্ধে রাম, লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানরেরা পুনরায় সুস্থ হলো।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিত বললেন—

হনুমানে গালি পাড়ে যত আরে মনে ॥
রামের ভরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিও সাধ ॥
ইন্দ্রজিত নাম মোর ত্রিভুবনে জানে।
কোন্ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে।
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে ॥ (লঃ)

এই অদৃশ্য শরাঘাতে বিপক্ষ পর্যুদস্ত হলো। ইন্দ্রজিৎ পুনরায় উল্লসিত হয়ে পিতাকে জয়ের বার্ত্তা শোনালেন এবং নিজের বিক্রমের কথাও বিশদ ভাবে বর্ণনা করে জানালেন বিপক্ষ দলের সব বীরই মৃত। এমন কি

ঘর পোড়া বানর গিয়াছে যম ঘরে। (লঃ)

অর্থাৎ যে হনুমান লঙ্কা পুড়িয়েছিল, তাঁরও মৃত্যু সংবাদ দিতে ভুল করেননি। কিন্তু ইন্দ্রজিতের এই হর্ষও অধিক কাল স্থায়ী হল না। রাক্ষস বীরেরা একে একে বানর সেনা ও রাঘব নন্দনদের হাতে নিহত হওয়ায় রাবণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিতকে বললেন, তুমি সর্ব প্রকারে বলবান। সুতরাং দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে এই শক্তিশালী ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে বধ কর, যাঁর পরাক্রমের তুলনা হয় না, তুমি সেই ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করেছ। দুজন মানুষকে যুদ্ধে জয় করতে পারবে না ?

পিতার আশীর্বাদ নিয়ে ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ যাত্রা করলেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপান্তে ইন্দ্রজিৎ আকাশে অন্তর্হিত হলেন। তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে ইন্দ্রজিৎ আক্ষেপ করে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণকে বলেছিলেন—

বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন॥
মরিয়া না মরে রাম এ কি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার॥ (লঃ)

যদিও নৈরাশ্যের সুর তার কথায় বেজে উঠছে, তবুও ইন্দ্রজিৎ নিরুদ্যম হননি, পরন্তু প্রবল বিক্রমে আবার শত্রুকে নাশ করবার নানা কৌশল চিন্তা ও অবলম্বন করতে লাগলেন।

রাম লক্ষ্মণ পুনরায় জীবিত হয়ে রাক্ষস বীরদের একের পর একেকে হত্যা করার সংবাদ পেয়ে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতকে পুনরায় যুদ্ধ গমনে আদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সর্ব প্রকারে পরাক্রমশালী। সুতরাং দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে এই শক্তিশালী ভ্রাতৃদ্বয়-রাম লক্ষ্মণকে বধ কর।

পিতার আদেশে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ ভূমিতে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করতে লাগলেন। সেই হুতাশনের উজ্জ্বল শিখাতে বিজয় সূচক চিহ্ন প্রকাশিত হল। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্নিতে আহুতি দানে দেব, দানব ও রাক্ষসদের তৃপ্তি সাধন করে অদৃশ্য শুভ লক্ষণ দেখে উত্তম রথে আরোহণ করলেন।

ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে হোম করে লঙ্কাপুরী থেকে বের হয়ে রাক্ষস মন্ত্র জপ করে অদৃশ্য ভাবে থেকে বললেন—

অদ্য হত্বা রণে যৌ তৌ মিথ্যা প্রব্রজিতৌ বনে।
জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণেঽধিকম্॥
অদ্য নির্বানরামুর্বীং হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্।
করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত॥ (যুঃ) ৮০।১৭-১৮

—আজ যুদ্ধে কপট সন্ন্যাসীদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে বধ করে পিতা রাবণকে উৎকৃষ্ট জয় প্রদান করব। রাম-লক্ষ্মণকে বধ করে পৃথিবীকে অদ্য বানরশূন্য এবং পিতার পরম প্রীতি সম্পাদন করব। এই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।

ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্যভাবে রাম-লক্ষ্মণকে শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন। রাম-লক্ষ্মণও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। মেঘাবৃত সূর্যের গতি যেমন অবগত হওয়া যায় না, তেমনি ইন্দ্রজিতের গতি, রূপ, ধনু অথবা বাণ কিছুই কেউ দেখতে পেলো না। কিন্তু ইন্দ্রজিতের বাণে শত শত বানর মরছে দেখে লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে চাইলেন।

রাম বললেন একজনের জন্য সমস্ত পৃথিবীর রাক্ষসকে বধ করা উচিত নয়।

নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি ॥ (যুঃ) ৮০।৩৮

যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, অঞ্জলিবদ্ধ, শরণাগত, পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে বধ করা উচিত নয়। এই রাক্ষসদের বধের জন্য আজ আমরা বিষধর সর্পতুল্য বেগগামী বাণসমূহ নিক্ষেপ করব। মায়াবী রাক্ষস ইন্দ্রজিতকে বানররা নিহত করবে। যদি ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ, মর্ত, রসাতল অথবা আকাশে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে তথাপি আমার অস্ত্রে দগ্ধ হয়ে প্রাণহীন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হবে। এই কথা বলে রাম বানরদের মধ্যে প্রবেশ করে এক নিষ্ঠুর ভয়ানক শত্রু বধের জন্য ইতস্তত: দেখতে লাগলেন।

রামের অভিসন্ধি জানতে পেরে ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হয়ে পুরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু রাবণি রাক্ষসদের নিধনের কথা চিন্তা করে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুরী হতে রাক্ষস পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দ্বার দিয়ে বের হলেন। বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে ইন্দ্রজিৎ মায়া প্রকাশ করলেন।

ইন্দ্রজিৎ কেবল যোদ্ধা নয়, বুদ্ধিমানও। তাই শত্রুর শক্তির কথা চিন্তা করে যেমন তিনি পশ্চাদপদ হতে দ্বিধা বোধ করেননি, তেমনি বীরত্বের অহমিকা তাঁকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয়নি। তাই পুনরায় দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে শত্রু অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারে হোক শত্রু নিপাত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

সম্মুখসমরে যা সম্ভব নয়, মায়ার আচ্ছাদনে সেই অভিষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন।

ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥ (যুঃ) ৮১।৫

—ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতার মূর্তি রথে রেখে বিশাল সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই মূর্তিকে বধ করতে উদ্যত হলেন।

ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতার কেশাকর্ষণ করে আসি নিষ্কাশন করেন, সেই মায়াময়ী সীতামূর্তি 'হা রাম' 'হা রাম' বলে ডাকতে থাকে। হনুমান এই দৃশ্য দেখে তিরস্কার করে (হনুমান চরিত্র দ্রষ্টব্য) প্রবল বেগে ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ করলে পর ইন্দ্রজিৎ তাঁকে বলেন :—

সুগ্রীবস্ত্বঞ্চ রামশ্চ যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তাং বধিষ্যামি বৈদেহীমদ্যৈব তব পশ্যতঃ ॥
ইমা হত্বা ততো রামং লক্ষ্মণং ত্বাঞ্চ বানর।
সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি তঞ্চানার্য্যং বিভীষণম্ ॥ (যুঃ) ৮১।২৬-২৭

—রাম সুগ্রীব এবং তুমি যেজন্য এখানে এসেছো, আজ তোমার চোখের সামনেই সেই বৈদেহীকে বধ করব। হে বানর, প্রথমে সীতাকে হত্যা করে, পরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অনার্য বিভীষণ ও তোমাকে বধ করব।

ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্তব্যমেব তৎ ॥ (যুঃ) ৮১।২৮

—হে বানর স্ত্রীবধ করা অকর্তব্য এই কথা যে বলেছ, তার উত্তরে বলতে হয় শত্রুগণের যা পীড়ার কারণ, তাই করণীয়।

তামিন্দ্রজিৎ স্ত্রিয়ং হত্বা হনুমন্তমুবাচ হ।
ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্ ॥
এবা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ ॥ (যুঃ) ৮১।৩১

—তখন ইন্দ্রজিৎ সেই স্ত্রীকে হত্যা করে হনুমানকে

বললেন, দেখ, অস্ত্রাঘাতে এই আমি এই রামপ্রিয়াকে বধ করলাম ; এখানেই বৈদেহী ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে, অতএব তোমাদের পরিশ্রম সব নিষ্ফল।

এরূপে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বিশাল খড়্গে হত্যা করে হৃষ্টচিত্তে নিজ রথে আরোহণ করে মহাশব্দে গর্জন করে উঠল। অদূরে অবস্থানকারী বানরেরা আকাশমার্গ আশ্রয়কারী ইন্দ্রজিতের সিংহনাদ শুনতে পেলো। এইভাবে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করে আনন্দিত হল। এবং বানরগণ তাকে প্রসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্তে যত্র তত্র পলায়ন করতে লাগল।

সীতার হত্যা সংবাদ শুনে শোকে রাম মূর্ছা গেলেন। লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দিলেন। (লক্ষ্মণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) ও রামকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। আকাশে বিচরণমান ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রবেশ করলেন।

বিভীষণ শোকাতুর রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের মায়ারহস্য উদঘাটন করে জানালেন ইন্দ্রজিৎ বানরদের মায়ায় মোহিত করেছে। হনুমান যা দেখেছেন তা মায়াময়ী সীতা। বিভীষণ রামকে ইন্দ্রজিতকে ব্রহ্মার বরের কথা জানিয়ে বললেন, নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ নির্বিঘ্ন করবার জন্য ইন্দ্রজিৎ মায়ার দ্বারা বানরদের মোহিত করে গেছে।

ইন্দ্রজিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রশংসার্হ। তিনি যে যুদ্ধে বিচক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, তা অবিসংবাদিত। তাই ছলে বলে কৌশলে রণক্ষেত্রে শত্রুকে ব্যাপৃত রেখে, অভিভূত করে, তিনি তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ করতে গেলেন।

বিভীষণ রামকে জানালেন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করে ফিরে আসলে কেউ-ই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। সুতরাং ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করবার পূর্বেই লক্ষ্মণের তাঁকে বধ করা উচিত।

ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস পরিবেষ্টিত হয়ে সবেমাত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, এমন সময় বানর সৈন্যগণ রাক্ষসগণকে আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে এবং বানরগণ রাক্ষসদের নিধন করতে থাকে।

নিজের সৈন্য বিধ্বস্ত হচ্ছে শুনে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা থেকে নির্গত হয়ে রথারোহণে এলেন এবং হনুমানকে দেখে সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, হনুমানের দিকে অগ্রসর হতে। অন্যথা সে রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস করবে।

হনুমান অত্যন্ত বেগে রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত করতে থাকলে সহস্র সহস্র রাক্ষস তার উপর শরবর্ষণ করতে লাগলো। হনুমানও ক্রুদ্ধ হয়ে বহু রাক্ষসসেনা নিহত করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ দেখলেন হনুমান পর্বতের মত অচল থেকে নিঃশঙ্কভাবে নিজের শত্রু সংহার করছেন। ইন্দ্রজিৎ তা দেখে সারথিকে বললেন, যেখানে ঐ বানর রয়েছে, সেখানে চল। তাকে উপেক্ষা করলে আমাদের রাক্ষসসৈন্যের ক্ষয় হবে। সারথি এই কথা শুনে ইন্দ্রজিতকে হনুমানের নিকট নিয়ে গেল।

হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বললেন, যদি বীর হয়ে থাক, তবে যুদ্ধ কর। এই বাহুযুদ্ধে যদি আমার আঘাত সহ্য করতে পার, তবে বুঝব তুমি রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তারপর হনুমানকে বধ করবার জন্য ইন্দ্রজিতকে ধনুর্বাণ তুলতে দেখে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, ঐ সেই ইন্দ্রবিজয়ী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। সে রথে আরোহণ করে হনুমানকে বধ করতে চেষ্টা করছে। লক্ষ্মণ, এই ভয়ঙ্কর রাবণপুত্রকে বধ করুন।

বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে মহাবলে নীল মেঘের ন্যায় ভীম দর্শন এক বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, ইন্দ্রজিৎ এই স্থানে যজ্ঞ সমাপন করে অদৃশ্য হয়ে শত্রুদের বধ ও বন্ধন করে। সে এখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই তাকে সারথিসহ বধ করুন।

তখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বললেন, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণকে দেখে বিভীষণের প্রতি কঠোর ভাষায় ধিক্কার উচ্চারণ করে বললেন :—

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্মম্।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস॥
ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ॥ (যুঃ) ৮৭।১১-১২

—তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করে বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য হয়ে কি করে পুত্রের প্রতি শত্রুতা করছ? হে দুর্মতে তোমার দ্বারা ধর্ম দূষিত হয়েছে, কুটুম্ব জনের প্রতি তোমার আত্মভাব নেই। তোমার মধ্যে সুহৃদের ভাব লুপ্ত হয়েছে, তোমার জাত্যাভিমান নেই। তোমার কর্তব্যাকর্তব্য মর্যাদা সৌন্দর্যবোধ বা ধর্মজ্ঞান কিছুই নেই।

শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥ (যুঃ) ৮৭।১৩

—দুর্বুদ্ধে, যেহেতু তুমি স্বজন ত্যাগ করে শত্রুর ভৃত্য হয়েছো, সেইহেতু তুমি শোকের যোগ্য ও সৎ পুরুষ দ্বারা নিন্দনীয়।

নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচ পরাশ্রয়ঃ॥ (যুঃ) ৮৭।১৪

—কোথায় স্বজনের সঙ্গে বাস, আর কোথায় নীচ শত্রুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ, চঞ্চল বুদ্ধির জন্য তুমি এই দুইটির মধ্যে মহৎ ব্যবধান দেখতে পাচ্ছ না।

গুণবান বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥ (যুঃ) ৮৭।১৫

—গুণবান্ শত্রু এবং নির্গুণ স্বজন হলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ। কারণ যে শত্রু, সে চিরদিন শত্রুই থাকে, কখনও আপন হয় না।

যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।

স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে॥ (যুঃ) ৮৭।১৬

—যে নিজপক্ষ পরিত্যাগ করে শত্রুপক্ষে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয়ের পরে শত্রুদের দ্বারাই নিহত হয়।

নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর।

স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ॥ (যুঃ) ৮৭।১৭

—হে রাবণানুজ নিশাচর, লক্ষ্মণকে এই স্থানে এনে আমার বধের জন্য চেষ্টা করায় তুমি যেরূপ নির্দয়তা দেখিয়েছ, স্বজন হয়ে এমন আর কেউ করতে পারে না।

বীর ইন্দ্রজিতের উপরোক্ত উক্তি শুনে সকলের মনেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রম জাগে। ইন্দ্রজিতের এই ধিক্কারের মধ্যে লুকিয়ে আছে তার বিরাট ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, স্বজাত্যবোধ ও আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান। ইন্দ্রজিতের এই স্পষ্টবাদিতা সকলকেই আকৃষ্ট করে। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ চরিত্র একটি অপূর্ব চরিত্র।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের চরিত্রটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর "মেঘনাদবধ" কাব্যে ইন্দ্রজিতের চরিত্রের পাশে অন্য সব চরিত্রই নিষ্প্রভ হয়েছে।

'এতক্ষণে'—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃ-পুরে। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী?
নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজনতু মি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।'

বিভীষণের উত্তর শুনে ইন্দ্রজিৎ উত্তর দিলেন—

হে পিতৃব্য! তব বাক্য ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যখন গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রাক্ষসরথি! ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন রাক্ষসকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল-সলিলে;
শৈবাল দলের ধাম? মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীর কেশরী! সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ মহারথি, এ কি মহারথি প্রথা?
নহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি। 'দেখিব আজি', কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি।
দেব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছ;
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! পরাক্রম দাসের কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত ! পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস ? কহ, তাত, সহিব, কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?

কবি মাইকেল ইন্দ্রজিতের মুখে বীরত্বের কি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে নিরস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার মত লক্ষ্মণের কাপুরুষ ছবিই তুলে ধরেছেন। যে ইন্দ্রকে জয় করেছে ; ব্রহ্মা ও মহাদেবকে তুষ্ট করে কেবল নানা অস্ত্রই পায়নি, আংশিক অমরত্ব লাভের প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে, সেই ইন্দ্রজিৎ-এর মৃত্যু রহস্য শত্রুর নিকট বিভীষণ কেবল প্রকাশই করেননি, সেই দুর্বল মুহূর্তে সেই নিরস্ত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অস্ত্রাঘাতে তাকে নিহত করবার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণকে আনয়নের মধ্যে যথার্থই বিভীষণ চরিত্রের কাপুরুষতা, নীচতা, শঠতারই প্রকাশ পেয়েছে। তারই পাশে ইন্দ্রজিৎ চরিত্র যেন তারার মাঝে সূর্যের মত চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে আপন বীরত্বে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে।

কবি মাইকেল অন্যত্র ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

বীরকুল গ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই। শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু সে আজি,
পামর, এ চির দুঃখ রহিল রে মনে।
দৈত্য কুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে, কি পাপে বিধাতা

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমন ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল—সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে যে দেশে
রাজরোষ বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দহিবে কাননে
রে রোষে, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ় আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি ! তোরে রাবণ রুষিলে ?
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে
কলঙ্কি ?'

রাক্ষস ইন্দ্রজিতের প্রতি লক্ষ্মণের এই কাপুরুষতা যথার্থ ই সর্বজন নিন্দিত। ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধে জয় লাভই যেন লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য ছিল। তাই এমন নিষ্ঠুর নির্দয় ভাবে বীর ইন্দ্রজিতকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করলেন ?

মহাকবি মাইকেল যেন সমস্ত পাঠকের হয়ে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়ে লক্ষ্মণকে ধিক্কৃত করেছেন। মাইকেলের অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর এই "মেঘনাদবধ কাব্য"। স্বয়ং বিষ্ণুর অংশে জন্ম। লক্ষ্মণের এই কাপুরুষোচিত কাজকে তিনি কোন প্রকারেই সমর্থন করতে পারেননি। তাই লক্ষ্মণের এই কাপুরুষোচিত জয়কে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছেন।

লক্ষ্মণের এই কাপুরুষোচিত কাজকে তুলনা করা যায় রামের বালিবধ ও ছয় রথী মিলে অভিমন্যু বধের সঙ্গে। অন্যায় সমরে যুদ্ধ জয়কে যুদ্ধ নীতিতে জয় বললেও মানবতার মাপ কাটিতে তা প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দনীয়।

বাল্মীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ সক্রোধে লক্ষ্মণকে বলছেন আমার বিক্রম দেখো, মেঘ হতে বারিধারার ন্যায় আমার ধনু হতে অসহ্য বাণ ধরাবর্ষণের ন্যায় সহ্য কর। অগ্নি যেমন তুলা রাশিকে ভস্ম করে, তেমনি আমার ধনু হতে বিনির্গত বাণ তোমাদের দেহ বিদীর্ণ করবে। আজ তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, ঋষি, পট্টিশ ও অন্যান্য বাণ সমূহে তোমাদের সকলকে যমালয়ে পাঠাব।

সৃজতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিপ্রহস্তস্য সংযুগে।
জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ॥ (যুঃ) ৮৮।৯

—রণক্ষেত্রে আমি মেঘের ন্যায় গর্জন করে ক্ষিপ্র হস্তে বাণ বর্ষণ করতে থাকলে কে আমার সম্মুখে অবস্থান করতে পারবে?

পূর্বে এক রাত্রির যুদ্ধে আমি অনুচরসহ তুমি ও তোমার ভাইকে অচেতন করে শায়িত করেছিলাম, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই। এখন আমি বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ সুতরাং আমার সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে এসেছো, তখন নিশ্চয়ই যমপুরীতে যাবে।

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন, তুমি কেবল কথা দ্বারা কঠিন কার্য্যের শেষ করলে।

কার্য্যাণাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান॥ (যুঃ) ৮৮।১৩

—যিনি কথা না বলে কর্ত্তব্য কর্ম সমাধান করেন, তিনিই বুদ্ধিমান।

তুমি স্বয়ং অভীষ্ট কাজের সিদ্ধি বিষয়ে অসমর্থ হয়েছ। তোমার পক্ষে যে কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন, তুমি সেই কার্য্য কেবল কথার দ্বারা শেষ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছ।

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ॥ (যুঃ) ৮৮।১৫

—তুমি সেই সময়ে রণক্ষেত্রে অদৃশ্য থেকে যে কাজ করেছো, তা বীরদের অনুমোদিত নয়। চোরই তেমন কাজ করে থাকে।

হে রাক্ষস, আমি যেমন তোমার বাণ পথে আছি, তেমনি তুমিও আজ তোমার তেজ দেখাও, বৃথা কথায় কেন আত্মশ্লাঘা করছ?

লক্ষ্মণের এই উক্তি শুনে ইন্দ্রজিৎ সর্পবিষতুল্য মহাবেগবান্ বাণ সমূহ লক্ষ্মণের দেহে প্রক্ষেপ করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বচসার সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল।

ইন্দ্রজিৎ বলছিলেন হে সৌমিত্রে, আজ তোমার কবচ ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে থাকবে। ধনু ভঙ্গ হবে এবং মস্তক ভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়বে। রাম এইরূপ অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাবে।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন, হে দুর্বুদ্ধে রাক্ষস, বাগাড়ম্বর ত্যাগ কর। তুমি এ সমস্ত কথা কেন বলছ? কাজ দ্বারা তা দেখাও। (সম্পাদয় সুকর্মণা)। লক্ষ্মণ পাঁচটি নারাচ দিয়ে ইন্দ্রজিতের বক্ষে আঘাত করলেন। ইন্দ্রজিৎও ক্রোধে তাঁকে আহত করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম ও বাদ বিতণ্ডা চলতে লাগল।

অবশেষে ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণে কিছুক্ষণ বচসা হয়। অতঃপর লক্ষ্মণ চার শরে ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ চার অশ্ববিদ্ধ করে ভল্ল দ্বারা সারথির শিরচ্ছেদ করলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং রথ চালনা করতে লাগলেন। অতঃপর চারজন বানর বেগে আক্রমণ করে ইন্দ্রজিতের অশ্ব বিনষ্ট করলো। অশ্বগুলি হত হলে পর তিনি নিজেই ভূমিতলে দাঁড়িয়েই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করে অন্য রথ, অশ্ব ও সারথি নিয়ে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। শত্রুপক্ষ রাত্রির অন্ধকারে তাঁর এই গমনাগমন বুঝতেই পারেনি। তিন রাত্রি তিন দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রবাণের দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ যেন আরও কঠোর ভাষায় পিতৃব্য বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছেন।

ধার্মিক বলিয়া তোমায় সর্বলোকে বলে॥

পিতার সমান তুমি পিতৃ সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে॥
খাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।

... ...

এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাহি তাতে।
কোন লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে॥

... ...

যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মেগে লই বর॥

... ...

আজি তোমায় কেটে খুড়া ঘুচাইব শনি॥ (লঃ)

—এইখানে ইন্দ্রজিতের পিতৃব্যের বিরুদ্ধে কেবল ক্ষোভই প্রকাশ পায়নি, তাঁর স্বজাতি প্রীতিও লক্ষণীয়। রাক্ষস বংশ নির্বংশ হওয়ার আশঙ্কায় ইন্দ্রজিতের মর্মন্তুদ আক্ষেপ পাঠক বর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

বিভীষণ যদি রামের কাছে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে না দিতেন ও গুপ্ত স্থান দেখিয়ে না দিতেন বা রামের কাছে রাবণ বধের গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত না করতেন, তবে রামের পক্ষে কখনই লঙ্কা জয় করা এত সহজ হত না বা রাম লক্ষ্মণের লঙ্কা জয় মোটেই সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। রাম স্বয়ং নারায়ণ বটে, কিন্তু রাবণ ও তাঁর পুত্র দেবাশ্রিত এবং উভয়েই দুর্ধর্ষ যোদ্ধাও রণ কৌশলী ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়াতেই তাঁদের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

এখানে ইন্দ্রজিতের চরিত্রের আর একটি সুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম ও প্রীতি এখানে লক্ষণীয়। লঙ্কা রাজ্য ও লঙ্কার অধিবাসীদের জন্য তাঁর কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। শত্রুর অনুগত হয়ে তিনি জীবন ধারণ করাও অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তাঁর স্বদেশ প্রীতি সকলের অনুকরণ যোগ্য।

প্রশান্তপীড়াবহুলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্ষবান্।

বভূব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেন্দ্রসুতে তদা॥ (লঃ) ৯০।৮৩

—পাপাচারী সেই রাক্ষস নন্দন সকলেরই শত্রু ছিল। এই জন্য তাঁর বধে সকলে তাঁর উপদ্রব হতে শান্তি পেলেন। সকলেই আনন্দিত। নিখিল মহর্ষিগণ এবং ভগবান ইন্দ্রও অতিশয় হৃষ্ট হলেন।

দেবকুলের আচরণ লক্ষণীয়। ভক্তদের সাধনায় আশু তুষ্ট হয়ে বরদানে তাঁদের প্রায় অমরত্ব দান করেন। আবার সেই ভক্তরা যখন শত্রুর হাতে নিহত হন, তখন দেবতারা আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাম আনন্দিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহু সুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব—এই ছয়টি যজ্ঞ পূর্ণ করে সপ্ত সংখ্যক অতি দুর্লভ মহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করলে পশুপতি তাঁকে বহু বর দান করেন।

ইন্দ্রজিৎ পৌরুষের ও অমিত বীর্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর পিতৃভক্তি যথার্থই অতুলনীয়। পিতৃ ভক্তিতে তিনি অন্ধ। পিতার কোন দোষ ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ে না। স্বদেশ প্রীতি, স্বজাতি প্রেম তাঁর পৌরুষ চরিত্রকে আরও দীপ্ত করে, উজ্জ্বল করে রেখেছে।

Mallet বলেছেন True valor, on virtue founded strong, meets all events alike এই উক্তিটি ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে খুবই প্রযোজ্য।

কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা ও পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। মহাভারতে অভিমন্যুর আকৃতির বর্ণনা এক বিকাশোন্মুখ মুকুল বীরের মধুর ছবি। পাঠকের মন দুঃখে ব্যথায় বিদীর্ণ হয়, যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার পূর্বেই এই দুর্ধর্ষ বীর ঝরে পড়লেন।

অভিমন্যু এক নির্ভীক বীর ছিলেন। তাই তাঁর অভিমন্যু নাম সার্থক হয়েছে। শৌর্যে বীর্যে তিনি মাতুল কৃষ্ণ ও পিতা অর্জুনের সদৃশ। তিনি মাতুল কৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিলেন।

অভিমন্যু অর্জুনের নিকট সব রকম অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মতই পারদর্শী যোদ্ধা হয়ে উঠলেন। কেবল মাত্র অস্ত্র বিদ্যা নয়, বেদ শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

পাণ্ডবদের বনবাস কালে অভিমন্যু জননী সুভদ্রাসহ দ্বারকায় মাতুলালয়ে অবস্থান করছিলেন। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলে পর বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হয়।

বয়সে সমান না হলেও অভিমন্যুও মেঘনাদের মত প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্যোধন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের রথী ও মহারথিগণের শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলেন—

দ্রৌপদেয়া মহারাজ সর্বে পঞ্চ মহারথাঃ

... ...

অভিমন্যুর্মহাবাহু রথযূথপযূথপঃ।
সমঃ পার্থেন সমরে বাসুদেবেন চারিহা।
লব্ধাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ মনস্বী চ দৃঢ়ব্রত॥ (উঃ) ১৭০।১-৩

—মহারাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রই মহারথী। মহাবাহু অভিমন্যু মহারথ। যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি অর্জুন ও কৃষ্ণের সমান। তিনি অস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ রণ কৌশলেও নিপুণ। ইনি মনস্বী ও দৃঢ় সঙ্কল্প।

অর্জুন পুত্র অভিমন্যু তাঁর রণ কৌশলের প্রথম পরীক্ষা দিয়েছিলেন

যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অশ্বত্থামা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অভিমন্যু সে যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপাচার্যকে শর বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা, শল্য, ও কৃপাচার্যও তাঁকে শঃবিদ্ধ করেন। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো অভিমন্যু ও·ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র ও দুর্যোধনেব পুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে। দুই বীর বালক এক প্রচণ্ড সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়ে পরস্পরকে আঘাত কবতে থাকেন। অতঃপর দুর্যোধন নিজ পুত্রকে অভিমন্যুর দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে সে স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন কৌরব পক্ষে সব রাজন্যবৃন্দ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেন। কিন্তু ঐ বকম পরিস্থিতিতে অভিমন্যু মাতুল কৃষ্ণের মত নির্ভীক ও নিশ্চিত থাকলেন। সেই সঙ্কট মুহূর্তে পিতা অর্জুন দ্রুত সে স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কৌরব বীররা অর্জুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় দিনের যুদ্ধেও পাণ্ডব পক্ষ যে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, সে ব্যূহে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সঙ্গে অভিমন্যু, ইরাবান এবং ইরাবানের পর ঘটোৎকচও ছিলেন। অভিমন্যু ব্যূহ পার্শ্বে উপস্থিত থেকে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে তাঁর অংশ নিয়েছিলেন। সাত্যকির সহযোগে তিনি শকুনির সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। পরে সুবল পুত্রদের সঙ্গে তাদের দেশীয় সৈন্যবর্গদের তীব্র ভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের বধ করতে থাকেন।

চতুর্থ দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন দ্রোণ, কৃপ, শল্য, দুর্যোধন প্রভৃতি এক সঙ্গে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন তখন বীর অভিমন্যু এক শ্রেষ্ঠ রথে সবেগে সমস্ত কৌরব মহারথীদের দিকে ধাবিত হলেন এবং সব কৌরব মহারথীদের দুর্জয় অস্ত্র সমূহকে নিশ্চল করে দিলেন। ভীষ্ম, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর অভিমন্যুকে অতিক্রম করে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন।

অন্য দিকে পাঁচ কৌরব বীর অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন

ও শল্যের পুত্র অভিমন্যুর অগ্রগতি ব্যাহত করলেন। কবির ভাষায় সিংহ শাবক পাঁচটি হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হলে যেরূপ যুদ্ধ করে অভিমন্যুও সেই পাঁচ তেজস্বী বীরের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে থাকেন (সিংহশিশুং যথা)।

নাতিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌর্য্যে ন পরাক্রমে।

বভূব সদৃশঃ কার্ষ্ণের্নাস্ত্রেণাপি চ লাঘবে॥ (ভীঃ) ৬১।৩

—লক্ষ্যবেধে, শৌর্যে, পরাক্রম প্রদর্শনে, অস্ত্র জ্ঞান পরিচয়ে ইত্যাদি কেউই অভিমন্যু সদৃশ ছিলেন না।

পুত্রের এবম্প্রকার বীরত্ব দেখে বীর অর্জুন সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন। অভিমন্যু কৌরব সৈন্যদের নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করায় সব সৈন্য অভিমন্যুকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। কৌরব সৈন্যদের হীন করে অভিমন্যু আপন প্রদীপ্ত তেজে কৌরব সৈন্যদের প্রতি ধাবিত হয়ে যুদ্ধরত অভিমন্যু আদিত্যের মত প্রকাশ পেলেন।

বালক অভিমন্যু যেন দুর্জয় রণে মেতে উঠেছেন। তিনি অশ্বত্থামা ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করে শল্যের ধ্বজকে ছিন্ন করলেন। ভূরিশ্রবার সাপের মত তীক্ষ্ণ শক্তিকে বাণের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে মহাবেগশালী বাণ নিক্ষেপকারী ভূরিশ্রবার ধনুকে বেগশালী ভল্লাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন ও তাঁর চারটি অশ্বকে বধ করলেন। ঐ পাঁচ কৌরব বীর অভিমন্যুর বাহুবলকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হলেন। তখন দুর্যোধন ত্রিগর্ত ও কেকয়দের সঙ্গে পঁচিশ হাজার সৈন্যকে শত্রু বধের জন্য পাঠালেন। তারা অর্জুন ও অর্জুন কুমার অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেছে দেখে সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল সৈন্য সমাবেশে মদ্র ও কেকয় সৈন্যদের আক্রমণ করলেন।

অতঃপর মদ্ররাজ শল্যের সঙ্গে দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের এক তীব্র সংগ্রাম হল। উভয় উভয়কে নানা মহাবেগশালী অস্ত্রে আঘাত

করতে থাকেন। পরিশেষে শল্য একটি ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং অজস্র বাণ বর্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে জর্জরিত করলেন।

এ সঙ্কট সময়ে ক্রুদ্ধ অভিমন্যু তীব্র বেগে মদ্ররাজকে আক্রমণ করলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ সমূহে রাজা শল্যকে আহত করলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা অভিমন্যুকে বন্দী করবার উদ্দেশ্যে মদ্ররাজ শল্যের রথের চারদিক বেষ্টন করলেন এবং যুদ্ধার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্য দিকে ধৃতরাষ্ট্রের দশ মহারথী পুত্রকে অভিমন্যু সহ দশ পাণ্ডব মহারথী অবরোধ করে বাণ বর্ষণে ব্যাপৃত থাকেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করবার মানসে হর্ষ ও উৎসাহের সঙ্গে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণে রত থাকেন। এ সংগ্রামে দুর্যোধন ও অন্যান্য কৌরব যোদ্ধারাও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অজস্র বাণে বিদ্ধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যেককে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যু সেই রণে সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে বাণে র্জজরিত করে আহত করলেন।

অতঃপর ভীমসেন দুর্যোধনকে দেখে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান ঘটাবার ইচ্ছা করে গদা হাতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। এ দৃশ্যে ধৃতরাষ্ট্রে পুত্ররা ভয়ে পালাতে থাকে। দুর্যোধন তখন মগধরাজকে অগ্রে রেখে গজসৈন্য নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করেন। তখন ভীমসেন গদা হাতে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে দুর্যোধনের গজসৈন্যদিগকে সংহার করতে করতে প্রলয়ের মত রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথী অভিমন্যু, নকুল-সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমকে পিছন দিক থেকে রক্ষা করছিলেন। এই সময় মগধরাজ ঐরাবত তুল্য এক হাতীকে অভিমন্যুর দিকে পাঠালেন। অভিমন্যু একটি বাণেই সেই হাতীকে বধ করলেন। ঐ হাতীকে হত্যা করে অভিমন্যু ক্ষান্ত না হয়ে একটি ভল্লাস্ত্রে মগধরাজের মস্তক দেহচ্যুত করলেন। ভীম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই ভাবে ভীষণ যুদ্ধ করে শত্রু পক্ষকে নিহত করতে লাগলেন। কৌরব সৈন্যরাও ভয়ে পলায়ন

করল (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য)। অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকে বীর ভীমকে রক্ষা করছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আবার মহাবীরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে দেখা গেল। বিরাট রাজার সঙ্গে ভীষ্ম, অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুন, দুর্যোধনের সঙ্গে ভীম এবং অভিমন্যুর সঙ্গে লক্ষ্মণের। এই যুদ্ধে অভিমন্যু চিত্রসেনকে দশ ও পুরুমিত্রকে সাত বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি সত্যব্রতকে সত্তর বাণে আহত করে রণাঙ্গণে কৌরব সৈন্যদের প্রবল বেগে আক্রমণ করতে লাগলেন। চিত্রসেন অভিমন্যুর বাণাহত শরীর হতে রক্ত নিঃসৃত করতেই অভিমন্যু চিত্রসেনের ধনুটিকে ছেদন করলেন। সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করে তাঁর বক্ষস্থলেও একটি বাণ বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ক্রুদ্ধ হয়ে একত্রে অভিমন্যুকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁদের সকলকেই প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন। যেমন বনে প্রচণ্ড অগ্নি তৃণের তৈরী ক্ষুদ্র গৃহকে অনায়াসে দগ্ধ করে সেইরূপ অভিমন্যুও সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগলেন। (দহন্তং সমরে সৈন্যং বনে কক্ষং যথোল্বণম্) তাঁর এই যুদ্ধ দেখে ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা তাঁকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন। বালক অভিমন্যুর এই বীরত্ব অতুলনীয় যার জন্য মহাভারতে সঞ্জয় অভিমন্যুর বীরত্বের তুলনা করতে যেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—

অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্।
অত্যরোচত সৌভদ্রস্তব সৈন্যানি নাশয়ন্॥ (ভীঃ) ৭৩।৩১

—সৈন্যদের সংহার রত অভিমন্যু গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রজ্বলিত প্রচণ্ড অগ্নি হতেও অধিক শোভা পেতে লাগলেন।

তাঁর এই পরাক্রম দেখে দুর্যোধন পুত্র লক্ষ্মণ অতি দ্রুত যুদ্ধে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। তখন ক্রুদ্ধ অভিমন্যু লক্ষ্মণকে

ছয়টি এবং তাঁর সারথিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণও তখন অভিমন্যুকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তা দেখে বীর অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারটি অশ্ব ও সারথিকে নিহত করে তাঁর উপর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মণ তখন অশ্বহীন রথ হতে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর রথের দিক একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসতে দেখে অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তখন কৃপাচার্য্য সব সৈন্যের সামনেই লক্ষ্মণকে নিজ রথে তুলে নিয়ে যুদ্ধ ভূমি হতে সরিয়ে নিলেন।

ভীম একা কৌরব সৈন্য সাগরে প্রবেশ করেছেন। ভীমের সারথি বিশোকের নিকট খবর পেয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর সন্ধানে ও সাহায্যে গেলেন। ভীমের সঙ্গে তখন কৌরব সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা ইঁহাদের শরাঘাতে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ছেন ও প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হয়ে পড়েছেন দেখে দ্রোণাচার্য প্রজ্ঞাস্ত্র নিয়ে তদ্বারা মোহনাস্ত্রকে নাশ করে দিলেন। দুর্যোধন ভ্রাতারা পুনরায় চেতনা শক্তি ফিরে পেলেন। তারপর দ্রোণ ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে যুদ্ধার্থে গেলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও তাঁর সৈন্যদের ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করবার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশজন বীর মহারথীকে কবচাদিতে সুসজ্জিত হয়ে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নর সংবাদ সংগ্রহের আদেশ দিলেন।

অভিমন্যুকে পুরোভাগে রেখে বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত পঞ্চ কেকয় রাজকুমার, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু—এই সব বীররা সূচী মুখ নামক সমরব্যূহ নির্মাণ করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। কৌরব সৈন্যরা তখন ভীমের ভয়ে ব্যাকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং তারা অভিমন্যু প্রভৃতি বীরদের প্রত্যাঘাত করতে পারেনি।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিবসে মহাবীর অভিমন্যুকে আবার দেখা গেল যুদ্ধ

ক্ষেত্রে। এই দিন দুর্যোধন ভীমের নিকট পরাজিত হন এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের যুদ্ধ হয়। এই সময় ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু, পঞ্চ কেকয় রাজকুমার এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কৌরব পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্র দর্শন, চারু চিত্র; সুচারু, নন্দ ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, মহাধনুর্ধর বীররা অভিমন্যুকে রথের চারদিকে পরিবেষ্টিত করলেন। তখন অভিমন্যু দ্রুত আনতপর্বযুক্ত পাঁচটি করে বাণ দ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করলেন। সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাত ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা সহ্য করতে পারলেন না। তখন তাঁরা সমবেত হয়ে বীর অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

অভিমন্যু অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে সংগ্রাম করছিলেন। তিনি বাণাহত হয়েও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন যেমন দেবাসুর সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদেরও ভয়ে পীড়িত করেছিলেন। (যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণি মহাসুরান্)।

অতঃপর অভিমন্যু বিকর্ণের উপর সর্পতুল্য আকার বিশিষ্ট চৌদ্দটি ভয়ঙ্কর ভল্ল নিক্ষেপ করলেন এবং তদ্দারা বিকর্ণের রথ হতে ধ্বজ, সারথি ও অশ্বদের নষ্ট করে ভূপাতিত করলেন। বিকর্ণকে ক্ষত বিক্ষত হতে দেখে তাঁর অন্যান্য সহোদর ভ্রাতারা সমরাঙ্গনে অভিমন্যু প্রভৃতির দিকে ধাবিত হলেন। তারপর দ্রৌপদীর পুত্রদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি হল।

যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শ্রুতায়ুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও কৃপাচার্যের মূর্ছা। যুদ্ধে ভূরিশ্রবা ধৃষ্টকেতুর অশ্ব ও সারথি নিহত করে পরে ধৃষ্টকেতুকে রথহীন দেখে প্রচুর বাণে আবৃত করেন। ধৃষ্টকেতু শতানীকের রথে আরোহণ করলেন।

সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই তিন রথী স্বর্ণ নির্মিত-

কবচ ধারণ করে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই সংগ্রামে অভিমন্যু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের রথহীন করেন, কিন্তু ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাঁদের বধ করলেন না। তখন ভীষ্ম বহু শত রাজা পরিবেষ্টিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের রক্ষা করবার জন্য একমাত্র বালক মহারথী অভিমন্যুকে লক্ষ্য করে তীব্র বেগে গমন করলেন। তাঁকে সেই দিকে যেতে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, যেদিকে বহু রথ যাচ্ছে, সেই দিকে আপনি অশ্ব চালনা করুন। সেখানে ভীষ্মের রক্ষাকারী সুশর্মাদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অভিমন্যুর বিক্রমের আর একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল। এই বালক বীরের হাত হতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের রক্ষার জন্য মহাবীর ভীষ্মকে সসৈন্যে যেতে হয়েছিল।

প্রায় প্রতিদিন অভিমন্যুকে সমারঙ্গনে তাঁর পরাক্রম দেখাতে দেখতে পাওয়া গেছে। অষ্টম দিনের যুদ্ধেও অভিমন্যুর সঙ্গে রাজা অম্বষ্ঠের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অভিমন্যু যে ভাবে লোক বিখ্যাত রাজা অম্বষ্ঠকে পরাজিত করেন, তাতে সকলেই তাঁকে 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি করতে লাগলো।

নবম দিনের যুদ্ধেও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যুর রাক্ষস অলম্বুষের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অভিমন্যু সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বায়ু যেমন তুলারাশিকে উড়িয়ে দেয়, সে ভাবে উড়িয়ে দিলেন।

ন চৈনং তাবকা রাজন্ বিষেহুররিঘাতিনম্।
প্রদীপ্তং পাবকং যদ্বদ্ পতঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ ॥ (ভীঃ) ১০০।১১

—রাজন, আপনার সৈন্যরা শত্রুঘাতী অভিমন্যুর বেগ সহ্য করতে পারল না। কাল প্রেরিত পতঙ্গরা যেমন অগ্নির তাপ সহ্য করতে পারে না, সেরূপ দশা আপনার সৈন্যদেরও হয়েছিল।

সব সৈন্যদের আক্রমণকারী অভিমন্যুকে বজ্রধারী ইন্দ্রের মত মনে হচ্ছিল, অভিমন্যু সুবর্ণময় রথে চড়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ

করছিলেন। কিন্তু বিপক্ষের কোন বীরই তাঁকে আঘাত করবার অবসর পায়নি। মহাধনুর্ধর অভিমন্যু কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, বৃহদ্বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—এঁদের সকলকেই মোহিত করে দ্রুত চারিদিকে বিচরণ করতে লাগলেন। কৌরব সৈন্যদের অভিমন্যু দগ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। এই বেগশালী বীর অভিমন্যুর কর্ম দেখে সমস্ত বীর ক্ষত্রিয়রা মনে করতে লাগলেন এই লোকে দুইজন অর্জুন রয়েছেন। (দ্বিফাল্গুনমিমং লোকং মেনিরে তস্য কর্মভিঃ।) অভিমন্যু ভরতবংশীয় বিশাল সৈন্যদের বিতাড়িত করে এবং মহারথী বীরদের কম্পিত করে সুহৃদদের আনন্দিত করলেন।

কৌরব সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনে দুর্যোধন সেই সময় রাক্ষস ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষকে বললেন, এই অর্জুন পুত্র অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জুনতুল্য পরাক্রান্ত। (এষ কাষ্ণির্মহাবাহো দ্বিতীয় ইব ফাল্গুনঃ।) বৃত্রাসুর যেমন দেব-সৈন্যদের প্রহার করে বিতাড়িত করেছিল, তেমনি অভিমন্যুও ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সৈন্যদের বিতাড়িত করছে। আমি যুদ্ধস্থলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং রাক্ষসদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার ন্যায় বীর ব্যতীত অন্য কাউকেও এরূপ দেখছি না যে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে। অতএব তুমি অতি সত্বর অভিমন্যুকে বধ কর এবং আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে অগ্রে রেখে অর্জুনকে সংহার করব।

অতঃপর রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধে অভিমন্যুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পার্শ্বস্থিত সৈন্যদের বিতাড়িত করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর পুত্ররা অলম্বুষ রাক্ষসকে পীড়িত করতে লাগলেন। অভিমন্যু অলম্বুষকে আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়। অভিমন্যু বারংবার সিংহনাদ করতে করতে পিতৃব্য ভীমসেনের শত্রু অলম্বুষকে বেগে আক্রমণ করেন। অলম্বুষ রাক্ষস মায়াবী ছিল এবং অভিমন্যু দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

চলে। মায়াবী রাক্ষস নানা প্রকার মায়ার জালে রণক্ষেত্র অন্ধকার করে দিল। অভিমন্যু দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া নষ্ট করে দিলেন এবং বাণাঘাতে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। রাক্ষসের মায়াকে সর্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্যু নষ্ট করে দিলেন। মায়া নষ্ট হলে বহুবিধ বাণে আহত হয়ে রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ে নিজের রথ ত্যাগ করে পলায়ন করলো। রাক্ষস পরাজিত হলে অভিমন্যু কৌরব সৈন্যদের তীব্রভাবে আঘাত করতে লাগলেন। ভয়ে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করতে লাগলে ভীষ্ম বহু বাণ বর্ষণ করে অভিমন্যুকে রোধ করলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা চারিদিক দিয়ে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেললেন এবং একা অভিমন্যুর উপর বহু যোদ্ধা তীব্র ভাবে আঘাত করতে লাগল।

বীর অভিমন্যু অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। বল ও বিক্রমে তিনি মাতুল কৃষ্ণের ন্যায়। তখন সকল শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যু রণাঙ্গনে সেই সব কৌরব রথীদের সঙ্গে নিজ পিতা ও মামার ন্যায় বহুবিধ শৌর্য বীর্য দেখালেন।

তারপর অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব সৈন্যদের সংহার করতে করতে নিজ পুত্র অভিমন্যুকে রক্ষা করবার জন্য ভীষ্মের নিকট এসে উপস্থিত হলেন।

অতঃপর অভিমন্যুকে চিত্রসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে রত দেখতে পাওয়া যায়। অভিমন্যুর তীব্র শরাঘাতে চিত্রসেনের অশ্ব ও সারথি নিহত হল। চিত্রসেন দ্রুত রথ হতে লাফিয়ে পলায়ন করলেন।

ভীষ্মকে পরাজিত করবার জন্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু বিশাল সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধ দেখে সমস্ত নৃপতিরাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

অতঃপর ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনকে সাহায্য করবার জন্য অভিমন্যু রাজপুত্র বৃহদ্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। উভয়ের

মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করতে নিপুণ সেই দুই বীরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল—তা দেখে মনে হচ্ছিল রাজা বলি ও দেবরাজ ইন্দ্রর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে।

অর্জুনের অমিত বিক্রমে তখন কৌরব সৈন্যরা ছত্র ভঙ্গ হয়ে দিকে দিকে ছুটছিল। যুধিষ্ঠির সর্বতো ভাবে সুরক্ষিত থাকলেন। তখন কৌরব সৈন্য সেনাপতি দ্রোণাচার্যের সম্মতি অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করে ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে, সকলেই অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলো এবং তাঁর প্রতি কৃষ্ণের সৌহার্দর কথা আলোচনা করতে লাগলো। কৌরব মহারথীরা পরাজিত হয়ে চিন্তাগ্রস্ত হলেন।

শত্রুদের জয়ে দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। নিজের শৌর্যের উপর আস্থা ছিল। তাই ক্রোধান্বিত দুর্যোধন পরদিন প্রাতঃকালে দ্রোণাচার্যকে বললেন—

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই আমরা আপনার চোখে শত্রুতুল্য। নতুবা যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসলেও আপনি তাকে বন্দী করেননি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কোন শত্রুকে আপনি বন্দী করেন, তবে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ডবরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও, তাকে মুক্ত করতে পারবে না। আপনি প্রসন্ন হয়ে প্রথমে আমাকে এই বর দিয়েছিলেন এবং পরে তার বিপরীত আচরণ করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষরা কখনই তাঁদের ভক্তদের হতাশ করেন না।

দুর্যোধনের কথায় দ্রোণাচার্য অপ্রসন্ন হয়ে রাজাকে বললেন, রাজা আমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মনে করা উচিত না। আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমার প্রিয় কাজ করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটা কথা তোমার স্মরণ রাখা উচিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুন যাকে রক্ষা করবে, তাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ

এবং রাক্ষসরা কেউই জয় করতে পারবে না। যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনের সেনানায়ক, সেখানে স্বয়ং ত্রিলোচন শঙ্কর ব্যতীত কেউ-ই তাদের পরাস্ত করতে পারবে না। আজ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করছি যে পাণ্ডব পক্ষের কোন এক মহারথীকে অবশ্যই বধ করবো। আজ আমি যে ব্যূহ রচনা করব, তা ভেদ করতে দেবতারাও সমর্থ হবেন না। কিন্তু যে কোন উপায়ে তোমরা অর্জুনকে দূরে সরিয়ে রেখো। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ই নেই, যা অর্জুনের পক্ষে অজ্ঞাত বা অসাধ্য। কারণ সে এই ভূলোক ও স্বর্গে যুদ্ধের সব বিষয়ই জ্ঞান লাভ করেছে।

দ্রোণাচার্য এই কথা বললে পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এয়োদশ দিবসে সংশপ্তগণ পুনরায় দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সেখানে অর্জুনের সঙ্গে শত্রুদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ হয়েছিল, যেরূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হয়েছে বলে দেখা ও শোনা যায়নি।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্যু বধের বর্ণনা দিতে গিয়ে সঞ্জয় বলেছেন—

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ।
অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ॥ (দ্রোঃ) ৩৪৮

—কৃষ্ণে যে সমস্ত গুণাবলি আছে এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যে সব গুণ আছে, সেই সমস্ত গুণই অভিমন্যুর মধ্যে দেখা যায়।

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, কৃষ্ণের চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমের বীরোচিত কর্মের তুল্য অভিমন্যুর পরাক্রম, চরিত্র ও কর্ম।

ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ॥ (দ্রোঃ) ৩৪।১০

—তিনি রূপে পরাক্রমে ও শাস্ত্র জ্ঞানে অর্জুনের তুল্য এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন।

দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন, তাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত রাজাদের সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

ঐদিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করে সৈন্য সন্নিবেশ করেন। ষষ্ঠরথী এই ব্যূহে অবস্থান করে অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকে। অর্জুন ও অভিমন্যু ব্যতীত পাণ্ডব পক্ষের অন্য কোন যোদ্ধা চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানতেন না।

অভিমন্যু বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ এবং অর্জুন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না (বাসুদেবাদনবরং ফাল্গুনাচ্চামিতৌজসম্)। তিনি বীর শত্রুদের বধ করতে সমর্থ ছিলেন। সৈন্যদের শোচনীয় বিনাশ দেখে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে ডেকে বললেন—বৎস, যদি আমরা জয়লাভ না করি তবে যুদ্ধ হতে ফিরে এসে অর্জুন আমাদের নিন্দা করবে। অতএব তুমি শীঘ্র অস্ত্র ধারণ করে দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের বিনাশ কর। আমরা চক্রব্যূহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না। কেবল অর্জুন, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং তুমি এই চার বীর যোদ্ধা চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারে। অর্জুন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা করতে না পারে তেমন কাজ কর।

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্যু প্রত্যুত্তরে এরূপ বললেন—

প্রবেশ জানি যে আমি নির্গম না জানি॥
যেইকালে ছিনু আমি জননী জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে কহ যে বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
জননী জিজ্ঞাসে হেনকালে সেই ক্ষণে।
প্রবেশ জানিলে কহ নির্গম কারণ॥

... ...

নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে ॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি যাহা আজ্ঞা করিবে তোমারে ॥ (দ্রোঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতে অভিমন্যু বললেন আমি পিতৃবর্গের জয়লাভের আশা রেখে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্যের সুদৃঢ় ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করব।

উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগোহনীকবিশাতনে।
নোৎসহে হি বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ (দ্রোঃ) ৩৫।১৯

—পিতৃদেব আমাকে চক্রব্যূহ ভেদ করবার বিধি বলেছেন, কিন্তু কোন রূপে বিপন্ন হয়ে পড়লে আমি সেই ব্যূহ হতে বের হয়ে আসতে পারব না।

সরল বালকের এই সহজ উক্তি পাঠকের মনে অশান্তির ছায়াপাত করে।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলেই মনে করি। তুমি ব্যূহ ভেদ করে আমাদের জন্য পথ করে দাও। আমরা সকলে সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করতে করতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করব।

উত্তরে কবি কাশীদাস অভিমন্যু মুখ দিয়ে বলেছেন—

করিব সমরে আজি রিপুগণ জয় ॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্ধরে।
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর ॥ (দ্রোঃ)

—বীরের হৃদয় যুদ্ধের আহ্বানে যেন যুদ্ধের দামামার মত নেচে উঠল। তিনি কুরু পক্ষের শিরোমণি দ্রোণকে বধ করবেন পণ করলেন।

ভীম বললেন, পুত্র, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চাল দেশীয় যোদ্ধারা, কেকয় রাজকুমারগণ, মৎস্য

দেশের সৈন্যরা এবং প্রভদ্রকরাও তোমারই অনুসরণ করবে। তুমি যেখানে যেখানে ব্যূহকে একবার ভেদ করবে, সেখানে সেখানে আমরা প্রধান যোদ্ধাদের বধ করে সেই ব্যূহকে বারংবার নষ্ট করব।

অভিমন্যু বললেন—

অহমেতৎ প্রবক্ষ্যামি দ্রোণানীকং দুরাসদম্।
পতঙ্গ ইব সংক্রুদ্ধো জ্বলিতং জাতবেদসম্॥ (দ্রোঃ) ৩৫।২৪

—যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির উপর পতিত হয় সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যের দুর্গম সৈন্য ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করব।

সরল বীর বালকের অনিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা।

আজ আমি এমন পরাক্রম দেখাবো, যা পিতা, মাতা, উভয়েরই বংশের পক্ষে হিতকর হবে এবং মামা কৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন দুজনকেই প্রসন্ন করবে। যদিও আমি বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখবে যে আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রুগণকে সংহার করব।

নাহং পার্থেন জাতঃ স্যাং ন চ জাতঃ সুভদ্রয়া।
যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতো নাদ্য মুচ্যতে॥ (দ্রোঃ) ৩৫।২৭

—যদি আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধে কোন সৈন্য জীবিত থাকে, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভদ্রা দেবী হতে জন্মাইনি।

যদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করে না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই।

অভিমন্যুর এই উক্তি কেবল মাত্র আত্মশ্লাঘা নয়, যথার্থই অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহারথীদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, এরূপ ওজস্বী বাক্য বলতে বলতে তোমার বল বর্ধিত হোক। তুমিই একমাত্র দ্রোণাচার্যের দুর্গম সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করবার যোগ্য।

যুধিষ্ঠিরের এই বাক্যে উৎসাহিত হয়ে অভিমন্যু নিজের সারথিকে

আদেশ করলেন, সুমিত্র, তুমি অতি শীঘ্র অশ্বদের দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের দিকে চালনা কর।

অভিমন্যু সারথি সুমিত্র তাঁকে বললেন, পাণ্ডবরা আপনার উপর গুরুভার দিয়েছেন। আপনি চিন্তা করে কর্তব্য স্থির করবেন। তারপর যুদ্ধ করুন। দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। এদিকে আপনি আপনার প্রিয়জন কর্তৃক সুখে লালিত পালিত। যুদ্ধবিদ্যায় আপনি তাঁর ন্যায় অভিজ্ঞ নন।

সারথির পরামর্শ শুনে অভিমন্যু হাসতে হাসতে বললেন. সারথি, দ্রোণাচার্য বা ক্ষত্রিয়দের কথা কি বলব। সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা সব প্রাণীদের দ্বারা পূজিত রুদ্রদেবও যদি আসেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি সমর্থ। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না।

> ন মমৈতদ্ দ্বিষৎসৈন্যং কলামর্হতি ষোড়শীম্।
> অপি বিশ্বজিতং বিষ্ণুং মাতুলং প্রাপ্য সূতজ॥
> পিতরং চার্জুনং যুদ্ধে ন ভীর্মামুপযাস্যতি। (দ্রোঃ) ৩৬।৭-৮

—শত্রুদের এই সৈন্যবাহিনী আমার ষোল ভাগের এক ভাগও হবে না। সূতপুত্র, বিশ্ববিজয়ী বিষ্ণু স্বরূপ মামা এবং পিতা অর্জুনও যদি আমার বিপক্ষে থাকেন, তথাপি আমার ভয় হবে না।

অভিমন্যু সারথিকে পুনরায় বললেন, তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের দিকে চল। সারথি সুবর্ণময় ভূষণে বিভূষিত তিন বৎসর বয়স্ক অশ্বদের চালালো। সে সময় তাঁর প্রসন্ন মন অপ্রসন্ন হলো।

অভিমন্যুকে আসতে দেখে দ্রোণাচার্য ও অন্যান্য কৌরব বীররা তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন এবং পাণ্ডব যোদ্ধারা তাঁর অনুসরণ করল। অভিমন্যু অর্জুনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যেমন সিংহ শাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করে থাকে, তেমনি অভিমন্যু যুদ্ধার্থে দ্রোণাদি মহারথী বীরদের দিকে ধাবিত হলেন। অভিমন্যু

বিশ পদ মাত্র অগ্রসর হলেই যুদ্ধ করতে উদ্যত দ্রোণাচার্যাদি যোদ্ধারা তাঁর উপর অস্ত্র প্রহার আরম্ভ করে দিলেন। অভিমন্যু ঐ সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হলো। উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল।

প্রবর্তমানে সংগ্রামে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে।

দ্রোণস্য মিষতো ব্যূহং ভিত্ত্বা প্রাবিশদার্জনিঃ॥ (দ্রোঃ) ৩৬।১৫

—যখন এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলছিল, তখন দ্রোণাচার্যের সাক্ষাতেই অর্জুন নন্দন অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্যুর যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি।

সহসা উলুক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
... ...
দেখিয়া আর্জুনি কোপে অনল সমান।
... ...
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব নাহিক এই পাঠাই তোমারে॥
... ...
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আবার দুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয়॥ (দ্রোঃ)

দুঃশাসনের পুত্র উলুকের প্রতি অভিমন্যুর এ প্রকার আক্রোশের কারণ জননী দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অশালীন ব্যবহার। তাই উলুকের প্রতি এই বিদ্বেষ ভাব।

অভিমন্যুর পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। তিনি কোনরূপ বিচলিত

না হয়েই অত্যন্ত দুর্জয় ও দুঃসাধ্য রণাঙ্গণে বিচরণ করতে থাকেন। আকাশ জুড়ে বাণ বৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি বাণে চারিদিক অন্ধকার করে ফেললেন। কখনো অগ্নিবাণে শত্রু সৈন্যদের পোড়াতে লাগলেন, কখনো বাণের দ্বারা মহাঝড় সৃষ্টি করলেন। মেঘরাজি সূর্যের মুখ দেখতে পেলো না বা প্রবল বৃষ্টিপাত করালেন। চারদিকে অভিমন্যু অস্ত্রের বৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, তাতে হাতী সারথী ঘোড়া ধনু সহ কারো বাম হাত কারো বা কুণ্ডলের সঙ্গে মুণ্ড, কারো নাক বা কাণ, কারো পা দুখানা কারো বা দাঁতের পাটি কেটে পরতে লাগল।

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্যুর এই বিক্রম সম্বন্ধে লিখেছে—

অর্জুন-নন্দন ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্য মধ্যে সিংহ যেন পেয়ে বন্য পশু॥
সামন্ত অর্দ্ধেক অন্ত করে একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহে চাহি ভয় বড় বাসি॥
অধো মুখ দুর্যোধন মানিয়া বিস্ময়। (দ্রোঃ)

অভিমন্যু ব্যূহর মধ্যে প্রবেশ করে শত্রু সংহার করবার সময় মহাবল অভিমন্যুকে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধারা অস্ত্র তুলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চারদিক ঘিরে ফেলল। এই ভাবে চারদিক হতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ সুরু হল। বীর অভিমন্যু দ্রুত যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অস্ত্র চালনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজের দিকে আগত সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন। কৌরব বীরদের অভিমন্যু যে ভাবে ধরাশায়ী করেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল অগ্নিতে দলে দলে পতঙ্গরা পড়ছে। (অভিপেতুঃ সুবহুশঃ শলভা ইব পাবকম্) যজ্ঞে যেমন কুশ বিছানো থাকে, তেমনি অভিমন্যুও শত্রুদের মৃত দেহে রণভূমি আচ্ছাদিত করলেন। শত্রুদের দু হাত যা নানা অস্ত্রে বিভূষিত ছিল, সেই সব হাত অভিমন্যু কাটতে লাগলেন।

সেই রক্তাপ্লুত কম্পমান হস্তে রণভূমি শোভা পাচ্ছিল। সুন্দর শ্রীযুক্ত মস্তক দিয়ে অভিমন্যু রণভূমি আচ্ছাদিত করেছিলেন। সহস্র সহস্র রথী যোদ্ধাদের নিহত করে রথগুলি সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন অভিমন্যু। কেবল রথ নয়। তিনি শত্রুদের বহু হস্তী, অশ্ব, গজারোহী ইত্যাদিকেও বধ করেছিলেন। বেগবান সুশিক্ষিত যোদ্ধা আরোহণ করেছিলেন, এমন সব অশ্বকেও ধরাশায়ী করে বীর অভিমন্যু একমাত্র বিষ্ণুর ন্যায় অচিন্ত্য ও দুষ্কর কর্ম করে শোভা পাচ্ছিলেন। এই ভাবে অভিমন্যু রণাঙ্গনে শত্রুদের অসহ্য পরাক্রম দেখিয়ে পদাতিক সৈন্যদের সর্বতোভাবে বিনষ্ট করতে তৎপর হলেন। যেমন কার্তিকেয় অসুরদের সৈন্য বাহিনীকে নষ্ট করে থাকেন, তেমনি একমাত্র সুভদ্রা কুমার অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা সমস্ত কৌরব সৈন্যদের সর্ব প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। এটা দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত ও শুষ্ক মুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছিল। এরা জীবনের আশা ত্যাগ করে আত্মীয় বন্ধুদের স্মরণ করে রণ ছেড়ে রোদন করতে লাগল। সৈন্যরা এত ভীত হয়েছিল যে তারা

হতান পুত্রান পিতৄন ভ্রাতৄন বন্ধুন সম্বন্ধিনস্তথা।
প্রাতিষ্ঠন্ত সমুৎসৃজ্য ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্॥ (দ্রোঃ) ৩৬।৪৫-৪৬

—তাঁরা নিজেদের মৃত পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু সম্বন্ধী প্রভৃতিকে রণস্থলে ছেড়ে নিজেদের অশ্ব ও হস্তী দ্রুত চালিয়ে রণভূমি হতে পলায়ন করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিশোর অভিমন্যু সিংহ পরাক্রমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অভিমন্যুর বিক্রম অসাধারণ। কোনরূপে বিচলিত না হয়েই অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ বিক্রমে শত্রুদের মধ্যে নির্ভয়ে তিনি যেন যুদ্ধ খেলা খেলতে লাগলেন।

অর্জুন তনয়ের অদ্ভুত যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কোটি কোটি রথ, অসংখ্য মদমত্ত হাতী অসংখ্য পদাতিক নষ্ট হলো। মৃতের শোণিতে নদী সৃষ্টি হল। যেমন ভাদ্র মাসের গঙ্গা। সে নদীতে ভাঙ্গা রথগুলো

রাজহংসের ন্যায় ভাসতে থাকে, ধনু ও অস্ত্র ঘাসের ন্যায়, মানুষগুলি মাছের ন্যায় ভাসতে থাকে। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শকুনি নন্দন অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ছুটে গেল এবং নাক কান কাটা হয়ে কুণ্ডল সহ তার মুণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। কোন কৌরব বীর এ দুর্জয় বীরের সামনে এগোতে সাহস করল না।

দুর্যোধন কৌরবদের অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে ক্রুদ্ধভাবে আচার্য দ্রোণকে অভিযুক্ত করলেন যে ছোট বলকের যুদ্ধে প্রীত হয়ে তিনি তার সঙ্গে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়েছেন।

দুর্যোধনের অভিযোগে রুষ্ট হয়ে দ্রোণাচার্য প্রত্যুত্তরে দুর্যোধনকে অভিযুক্ত করে বললেন যে তিনি প্রাণপণে দুর্যোধনের কাজ করেছেন। কিন্তু অভিমন্যুকে জয় করবার মত কোন বীর নেই। তার ভয়ে দুর্যোধন স্বয়ং পালিয়ে এসেছেন। কর্ণ যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারল না, অতএব তাকে কে জয় করবে? যত বড় বড় বীর ছিলেন সকলে লজ্জায় ও বিষাদে নত মস্তকে অবস্থান করছিলেন। তখন গুরু দ্রোণ বললেন কাশীদাসী মহাভাবত পাঠে—

ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে॥
... ...
তাহাকে নারিব ন্যায় যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন॥ (দ্রোঃ)

দুর্যোধন উত্তর দিলেন—

সপ্ত রথী এককালে কর গিয়া রণ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস-বদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন॥
কৃপাচার্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্যোধন॥ (দ্রোঃ)

এসব নীতি বাক্য দুর্যোধনের হৃদয় স্পর্শ করল না। তিনি বললেন, যদি তা করা না হয় তবে আর্জুনি সকলকে বধ করবে। শত্রুকে বধ করবার কোন বিধি বা নিয়ম নেই। এ শিশু যমের শমনের মত সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে—

এক কালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী। (দ্রোঃ)

সপ্তরথী কে কে? দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, দ্রোণ, কৃপা, অশ্বথামা।

আমি যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ।
এত শুনি কৃপাচার্য নিঃশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্যোধন এই মহাপাপে॥ (দ্রোঃ)

কপট পাশা খেলা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। এবং কপট যুদ্ধনীতি ঘটালো দুর্যোধনের সবংশে মরণ।

বেদব্যাসের মহাভারতে অভিমন্যু কৌরব সৈন্যদের বিতাড়িত করে দিলে দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে সম্মুখ সমরে মিলিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনকে অভিমন্যুর দিকে এগোতে দেখে দ্রোণাচার্য যোদ্ধাদের সম্বোধন করে বললেন, বীরগণ, মহারাজ দুর্যোধনকে তোমরা সব দিক দিয়ে রক্ষা কর। বীর অভিমন্যু আমাদের সামনেই নিজের লক্ষ্যভূত রাজা দুর্যোধনকে প্রথমেই বধ করবে। অতএব তোমরা সকলে তার রক্ষার্থে যাও। ভয় কর না, শীঘ্রই দুর্যোধনকে রক্ষা কর।

অতঃপর কৌরব বীররা দুর্যোধনকে চারদিকে ঘিরে রাখলেন। যদিও অভিমন্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন (ত্রাস্যমানা ভয়ান্ বীরং)।

দ্রোণো দ্রোণিঃ কৃপঃ কর্ণঃ কৃতবর্মা চ সৌবলঃ।
বৃহদ্বলো মদ্ররাজো ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ॥

পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিসৃজন্তঃ শিতাঙ্গুরান্।
সৌভদ্রং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরন্॥ (দ্রোঃ) ৩৭।৫-৬

—দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, সুবলপুত্র, বৃহদ্বল, মদ্ররাজা শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন—ইহারা সকলে অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। ইহারা প্রভূত বাণ বর্ষণ করে অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

সমস্ত বড় বড় কৌরব পক্ষীয় বীরবৃন্দ যুক্ত ভাবে একক অভিমন্যুর বিরুদ্ধে সাঁরি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন—এটাই অভিমন্যুর অমিত বিক্রমের এক অভিনব অভিজ্ঞান।

এইভাবে অভিমন্যুকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে বীর যোদ্ধারা দুর্যোধনকে মুক্ত করে নিলেন। এতে মনে হল :—

অস্যাদ গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মমৃষে নার্জুনাত্মজঃ॥ (দ্রোঃ) ৩৭।৭

—মুখ হতে গ্রাস অপহৃত হলো। অর্জুন পুত্র তা সহ্য করতে পারলেন না।

তখন ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদের সারথি ও অশ্বদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে বিমুখ করে দিয়ে অভিমন্যু সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। অভিমন্যুর এই গর্জন ক্রুদ্ধ দ্রোণাদি মহারথী বৃন্দ সহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু অভিমন্যু তাঁদের তীক্ষ্ণ বাণ গুলিকে আকাশ পথেই ছেদন করে ফেললেন এবং এই মহারথীদের আহতও করলেন—এটা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। বাণ বিদ্ধ এই সব যোদ্ধারা অপরাজিত বীর অভিমন্যুকে বধ করবার জন্য তাঁকে আবৃত করলেন। অভিমন্যু একাই তা প্রতিরোধ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। অভিমন্যু একা সবার সব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। কৌরব পুত্ররা ও অন্যান্য মহারথীরা তাঁকে একত্রে আক্রমণ করলেন।

অভিমন্যুর পরাক্রম অচিন্ত্যনীয় ছিল। দুঃশাসন বার, কৃপাচার্য তিন এবং দ্রোণাচার্য বিষধর সর্পের ন্যায় সতেরটি বাণে

অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। এই ভাবে বিবিংশতি সত্তর, কৃতবর্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ শল্য ছয়, শকুনি দুই এবং দুর্যোধন তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করলেন।

কিন্তু প্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করতে করতেই চারদিকে ঘিরে এই সব মহারথী বীরবৃন্দকে তিন বাণে প্রতিবিদ্ধ করলেন। অতঃপর কৌরব পুত্ররা একত্রিত হয়ে অভিমন্যুকে ভয় দেখাতে লাগল। ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং নিজের অস্ত্র শিক্ষা ও শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এরপর অভিমন্যু বীর অশ্মক পুত্রকে নিহত করেন। ইহাতে কৌরব সেনারা ভীত হয়ে পলায়ন করে। তখন কৌরব মহারথীরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করতে থাকেন। সেই সব বাণে আহত অভিমন্যু কর্ণকে লক্ষ্য করে এমন একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন যা তাঁর কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করল। সেই গুরুতর আঘাতে কর্ণ রণাঙ্গনে বিচলিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হয়ে সুষেণ, দীর্ঘ লোচন ও কুণ্ডভেদী এই তিন বীরকে আহত করলেন। তখন কর্ণ, অশ্বত্থামাও কৃতবর্মা এক সঙ্গে অভিমন্যুকে আঘাত করলেন। যদিও সেই সময় অভিমন্যুর সবাঙ্গ বাণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যমের ন্যায় শত্রু সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি শল্যের উপর ও বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অভিমন্যুর আঘাতে শল্য রথে সংজ্ঞা হারালেন। শল্যের এইরূপ অবস্থা দেখে দ্রোণাচার্যের সামনেই সৈন্যরা পলায়ন করল।

স তু রণযশসাভিপূজ্যমানঃ
পিতৃ-সুর-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ
রতিবিবভৌ হুতভুগ্ যথাজ্যসিক্ত॥ (দ্রোঃ) ৩৭।৩৭

—দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ, চারণ, সিদ্ধবৃন্দ, যক্ষগণ, ভূতলবর্ত্তী ভূত

সমুদয় দ্বারা প্রশংসিত হয়ে যুদ্ধ বিষয়ক সুযশে প্রকাশিত অভিমন্যু ঘৃতধারায় অভিসিক্ত অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

শল্যকে ধরাশায়ী দেখে তাঁর ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু শরাঘাতে শল্যের ভ্রাতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ভূপাতিত করলেন। এটা দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করল। অভিমন্যুর এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে সমস্ত প্রাণী তাঁকে 'সাধুবাদ' দিয়ে চারিদিকে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন।

শল্যের ভ্রাতার মৃত্যুর পর বহু সৈন্য ক্রুদ্ধ অভিমন্যুর প্রতি আক্রমণ করে বলল, তোমাকে এখন জীবিত ছাড়ব না। তোমাকে এখন অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (নো জীবন্ মোক্ষ্যকে জীবিতাদিতি।) এদের কথা শুনে অভিমন্যু উচ্চহাস্য করতে করতে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাকে অস্ত্র প্রহার করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি বাণ বিদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন হতে তিনি যেসব দ্রুতগামী অস্ত্র সমূহের প্রয়োগ শিখে ছিলেন, তার প্রয়োগ দেখাতে লাগলেন। এতে সৈন্যরা শরাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পলায়ন করল।

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, বৃহদ্বল, দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা, শকুনি, বহু নৃপতি ও রাজকুমার এবং তাঁদের নানা প্রকার সৈন্য বাহিনীর উপর অভিমন্যু অঙ্গার চক্রের ন্যায় চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে বাণাঘাত করলেন। অভিমন্যু দিব্যাস্ত্র সমূহের দ্বারা শত্রুদের নাশ করছিলেন। অমিত তেজস্বী অভিমন্যুর এই বিক্রম দেখে সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্য ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সেই সময় বুদ্ধিমান ও পরাক্রমশালী বীর দ্রোণাচার্যের নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেই সময় তিনি যেন দুর্যোধনকে আঘাত করবার জন্য কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন করে বললেন—

এষ গচ্ছতি সৌভদ্রঃ পার্থানাং প্রতিথো যুবা।

নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥
নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্।
বন্ধুন্ সম্বন্ধিনাশ্চান্যান মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা ॥ (দ্রোঃ) ৩৯।১১-১২

—এই পার্থবংশের প্রসিদ্ধ তরুণ বীর সুভদ্রানন্দন নিজের সমস্ত সুহৃদদের এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ, সম্বন্ধী ও মধ্যস্থ সুহৃদগণকে আনন্দ দান করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন।

নাস্য যুদ্ধে সমং মন্যে কঞ্চিদন্যং ধনুর্ধরম্।
ইচ্ছন্ হন্যাদিমাং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥ (দ্রোঃ) ৩৯।১৩

—আমি অন্য কোনও ধনুর্ধর বীরকে এর ন্যায় বীর বলে মনে করি না। যদি সে ইচ্ছা করে তবে সমস্ত সৈন্য বাহিনীকেই বিনাশ করতে পারবে। কিন্তু জানি না, কেন যে এমন ইচ্ছা করছে না।

জহুরী জহর চেনে। এ জন্য দ্রোণাচার্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশংসা। দ্রোণাচার্যের মত বীরের মুখে বীরত্বের জন্য এই ধরণের প্রশংসা অভিমন্যুর ন্যায় বালকের পক্ষে কম কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

অভিমন্যুর সম্বন্ধে দ্রোণাচার্যের প্রশংসার বাণী শুনে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে ঈষৎ হেসে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, শল্য এবং অন্যান্য মহারথীদের বললেন—সমস্ত নৃপগণের আচার্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ দ্রোণ অর্জুনের এই মূঢ় পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছুক নন। কারণ যদি ইনি যুদ্ধে কাউকে বধ করতে ইচ্ছা করেন, তবে যমরাজও তাঁর নিকট অবস্থান করতে পারবেন না। মরণশীল মানুষের কথা গ্রহণ যোগ্যই নয়। কিন্তু তিনি অর্জুনের পুত্রকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। কারণ অর্জুন তাঁর প্রিয় শিষ্য। শিষ্য ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। এমন কি তাদের সন্তানরাও ধর্মাত্মা পুরুষদের প্রিয় হয়ে থাকে। এই অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্য রক্ষা করছেন বলেই

সে যুদ্ধে নিজের বল ও তেজের অভিমান করছে। এই মূর্খ অভিমন্যু অকারণ আত্মশ্লাঘাকারী। সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হয়ে একে বিনাশ করুন।

দুর্যোধনের এই অভিযোগ ভীত্তি হীন। বীর বালকের নিকট মহারথীদের সঙ্গে বার বার পরাজিত হয়ে ঈর্ষা বশতঃই দুর্যোধন অযথা এই ভাবে দ্রোণাচার্যকে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং অভিমন্যুর বীরত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত হেতু অভিমন্যুকে বধ করছেন না বলে দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন অভিযুক্ত করলে, দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন ঃ—

অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন।
তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন॥
বাপের দোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে॥ (দ্রোঃ)

দ্রোণাচার্যের এই স্পষ্ট উক্তিতে অভিমন্যুর শৌর্য বীর্যের এক পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্বজন॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥

... ...

কাটিয়া পড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥
শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার করে বহু করিল রোদন॥ (দ্রোঃ)

অবশেষে শকুনি নন্দনও কিশোর অভিমন্যুর হাতে নিষ্কৃতি পায়নি। দুঃশাসনকে সম্মুখ সমরে পেয়ে অভিমন্যু বললেন—

ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর কটূভাষী এক বীরকে যুদ্ধে সম্মুখীন দেখছি। মূর্খ, তুমি দ্যূত সভায় জয় লাভে উন্মত্ত হয়ে কটূ বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে ক্রোধান্বিত করেছিলে, তোমার পাপ কর্মের ফল ভোগের জন্যই আমার কাছে এসে পড়েছো।

অমর্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাঙিক্ষতস্য চ মে পিতুঃ।
অদ্য কৌরবা ভীমস্য ভবিতাস্ম্যনৃণো যুধি ॥ (দ্রোঃ) ৪০।৯

—কুরুকুল কলঙ্ক, অমর্ষপর্ণা মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীম সেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করে আজ এই যুদ্ধে তাঁদের ঋণ হতে আমি মুক্ত হব।

এই বলে অভিমন্যু দুঃশাসনকে শরাঘাত করেন। দুঃশাসন সংজ্ঞা হারালেন। তাঁর সারথি তাঁকে সত্বর রণস্থল হতে সরিয়ে নিয়ে গেল।

দুর্যোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সব বীররা অভিমন্যুকে বধ করবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্যের প্রতি কটাক্ষপাত করে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করলেন।

দুঃশাসন দুর্যোধনকে প্রবোধ দিয়ে বললেন আমি আপনাকে বলছি যে আমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের সাক্ষাতেই এই অভিমন্যুকে বধ করব। যেমন রাহু সূর্যকে গ্রাস করে, তেমনি আমি অভিমন্যুকে গ্রাস করব। (গ্রসিষ্যাম্যদ্য সৌভদ্রং যথা রাহুর্দিবাকরম্।) আমি অভিমন্যুকে বধ করেছি শুনে অভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জুন এই জীবলোক হতে প্রেত লোকে যাবে—এতে কোন সংশয় নেই। এঁদের দুজনের মৃত্যু সংবাদ শুনে বাকী চার পাণ্ডব তাদের সুহৃদবর্গের সঙ্গে একই দিনে প্রাণ ত্যাগ করবে। অতএব এই আমাদের একমাত্র শত্রু অভিমন্যু নিহত হলেই অন্যান্য শত্রুরাও স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করবেন। আপনি আমার কল্যাণ করুন। আমি এখনই আপনার শত্রুদের

বধ করব। এই কথা বলে দুঃশাসন অভিমন্যুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

দুঃশাসনকে ক্রোধান্বিত ভাবে আসতে দেখে অভিমন্যু ছাব্বিশটি বাণে তাঁকে আহত করলেন। ক্রুদ্ধ দুঃশাসন সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

যুদ্ধে দুঃশাসনকে ক্ষত বিক্ষত করে অভিমন্যু সহাস্যে বললেন। সৌভাগ্য এই যে, আজ আমি যুদ্ধে তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর, ধর্মত্যাগী ও নিন্দুক শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম।

তুমি পাশা খেলায় জয় লাভ করে উন্মত্ত হয়ে সভাস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ক্রুদ্ধ করেছিলে এবং শকুনির পাশা খেলায় ছল কপটতার সাহায্য নিয়ে ভীম সেনের প্রতি যে সমস্ত কটুবাক্য বলেছিলে, এতে সেই ধর্মরাজের যে ক্রোধ হয়েছিল, তারই ফলে আজ তোমাকে এরূপ দুর্দ্দিনে পড়তে হয়েছে।

অপরের ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোপ, বিদ্রোহ, দুঃসাহসিকতা পূর্ণ ব্যবহার এবং আমার উগ্র ধনুর্ধর পিতাদের রাজ্য অপহরণ এই সমস্ত অপকর্মের ফল স্বরূপ সেই মহাত্মা পাণ্ডবদের ক্রোধেই আজ তোমাকে এই দুর্দ্দিনে পড়তে হয়েছে।

দুর্মতি, তুমি তোমার সেই অধর্মের ভয়ঙ্কর ফল আজ পাবে। আজ আমি সমস্ত সৈন্য বাহিনীর সাক্ষাতেই নিজের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তোমাকে শাস্তি দেব। আজ আমি যুদ্ধে পিতাদের ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাঁদের নিকট ঋণ মুক্ত হব।

আজ মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীম সেনের অভীষ্ট সিদ্ধ করে এই যুদ্ধে তাঁদের ঋণ মুক্ত হব।

যদি তুমি যুদ্ধ না করে পালিয়ে না যাও, তবে আজ তোমাকে আমার নিকট হতে জীবন নিয়ে যেতে হবে না। এই কথা বলে বীর অভিমন্যু কাল, অগ্নি ও বায়ু তুল্য তেজস্বী একটি বাণ সন্ধান করলেন, যা দুঃশাসনের প্রাণ হরণ করতে সমর্থ ছিল। এই ভাবে

আরও পঁচিশটি বাণের দ্বারা অভিমন্যু দুঃশাসনকে আঘাত করলেন। দুঃশাসন ক্ষত বিক্ষত হয়ে রথে বসে পড়লেন। সেই সময় সারথি দুঃশাসনকে দ্রুত যুদ্ধস্থল হতে বাইরে নিয়ে গেল।

পাণ্ডবরা পঞ্চ দ্রৌপদী নন্দন, রাজা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয় যোদ্ধারা দুঃশাসনকে পরাজিত হতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন। পাণ্ডব সৈন্যরা আনন্দ চিত্তে রণবাদ্য বাজাতে আরম্ভ করলে এবং সহাস্যে অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখতে লাগল।

দুঃশাসনকে পরাজিত হতে দেখে দ্রৌপদীর পুত্রেরা, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয় রাজকুমারদ্বয়, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবরা আনন্দের সঙ্গে অতি সত্বর দ্রোণাচার্যের ব্যূহ ভেদ করবার ইচ্ছায় তাঁর উপর আক্রমণ করলেন।

অতঃপর উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। যখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, কর্ণ দেখুন, বীর দুঃশাসন সৈন্যদের সন্তপ্ত করতে করতে তাদের সংহার করছিল এই অবস্থায় সে অভিমন্যুর নিকট পরাস্ত হলো।

অন্য দিকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে রক্ষা করবার জন্য প্রচণ্ড বেগে সিংহের মত ধাবিত হচ্ছে। এটা শুনে কর্ণ তীক্ষ্ণ ও উত্তম বাণের দ্বারা তাঁদের বিদ্ধ করলেন।

সেই সময় অভিমন্যু দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হবার ইচ্ছায় তিয়াত্তরটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। সেই সময় কোন বীর মহারথী অভিমন্যুকে দ্রোণের নিকট যেতে বাধা দিতে সমর্থ হয়নি।

কর্ণ শত শত বাণের দ্বারা দুর্জয় অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হলেও অভিমন্যু রণাঙ্গনে শিথিল হয়ে পড়লেন না। বরং তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কর্ণকে জর্জরিত করলেন। কর্ণও তাঁর উপর বাণ নিক্ষেপে বিরত হলেন না, কিন্তু অভিমন্যু কোন রূপে বিভ্রান্ত না হয়ে তা সহ্য করলেন।

অতঃপর অভিমন্যু একটি বাণে কর্ণের ধ্বজসহ ধনুকে ছেদন করে ভূতলে পাতিত করলেন। কর্ণকে শঙ্কটাপন্ন দেখে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদৃঢ় ধনু নিয়ে অভিমন্যুর সম্মুখীন হলেন। সেই সময় পাণ্ডবরা ও তাঁদের অনুগামী সৈন্যরা উল্লাসে বাদ্য বাজাতে থাকে ও অভিমন্যুর প্রশংসা করতে লাগল।

কর্ণের ভ্রাতা অভিমন্যুকে আক্রমণ করলে অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কর্ণের ভ্রাতার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। সেই মস্তক রথ হতে ভূমিতে পড়ল। নিজের ভ্রাতাকে নিহত হতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

নিজের ভ্রাতাকে নিহত হতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এদিকে অভিমন্যুর গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণগুলি কর্ণকে যুদ্ধস্থল হতে বিতাড়িত করল। অভিমন্যুর বাণে পীড়িত হয়ে কর্ণ রণভূমি হতে পলায়ন করলেন।

এই দিন অভিমন্যু এক অতুলনীয় পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। তাঁর সেই একক পরাক্রমকে পুরাকালে পরাক্রমশালী কুমার কার্তিকেয়ের অসুর সেনা বাহিনীকে সংহার করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এদিকে অভিমন্যু কর্ণকে যুদ্ধস্থল হতে বিতাড়িত করে অন্যান্য বীরদের উপর আক্রমণ চালালেন। তখন কৌরব সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হলো। অভিমন্যু বহু সৈন্য সংহার করলেন এবং সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করল।

অভিমন্যুকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ নিজ সৈন্যদের ব্যূহকারে সংগঠিত করে প্রহারের মুখে অভিমন্যুকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর রচিত পথে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ধাবিত হলেন। এই বীরদের আক্রমণ করতে দেখে দুর্যোধন ও তার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রণ-বিমুখ দেখে দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথ সেখানে আসলেন।

জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অগ্রগতি রুদ্ধ করলেন যাতে তাঁরা কোন প্রকারে অভিমন্যুকে সাহায্য করতে না পারেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের থেকে জানতে চেয়েছিলেন জয়দ্রথ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ অথবা উত্তম তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তিনি একাকী সমস্ত পাণ্ডবদের রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন? কি তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচর্য ছিল বা বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা কোন দেবতার তপস্যা করে জয়দ্রথ ক্রুদ্ধ পাণ্ডবদের একাকী প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন?

তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, দ্রৌপদী হরণের জন্য জয়দ্রথকে ভীমের নিকট যে ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল, তাতে তিনি অপমানিত বোধ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

প্রিয় বিষয় হতে সমস্ত ইন্দ্রিয়দের নিবৃত্ত করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং উত্তাপের কষ্ট সহ্য করে জয়দ্রথ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর শরীরের নাড়ীভুঁড়িও দেখা যাচ্ছিল। এভাবে তিনি মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব তখন ভক্তকে কৃপা করলেন, এবং স্বপ্নে জয়দ্রথকে দর্শন দিয়ে তাঁকে বললেন—জয়দ্রথ তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি।

জয়দ্রথ তখন ইন্দ্রিয় সংযম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমি যেন যুদ্ধে একাকী কেবল রথের দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত সমস্ত পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করতে পারি। মহাদেব তখন বললেন, তুমি কুন্তী পুত্র অর্জুন ব্যতীত অপর চারজন পাণ্ডবদের একদিন যুদ্ধে অগ্রগতি রোধ করতে পারবে। জয়দ্রথ তাই হোক বলে জেগে উঠলেন। সেই বর বলে ও দিব্য অস্ত্র দ্বারা জয়দ্রথ একাকীই পাণ্ডবদের প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই ভাবে জয়দ্রথ পাণ্ডব যোদ্ধা ও সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করলেন, তিনিই সেদিন কৌরবদের যুদ্ধের ভার নিয়েছিলেন। কৌরব সৈন্যরা যুধিষ্ঠিররা যেদিকে ছিল, সেদিকে ধাবিত হলো।

উপরোক্ত ঘটনা হতে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে দৈব আশীর্বাদে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের গতি রোধ করে অভিমন্যুকে একাকী যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রবিশ্যাথার্জুনিঃ সেনা সত্যসন্ধো দুরাসদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত তেজস্বী মকরঃ সাগরং যথা ॥ (দ্রোঃ) ৪৪।২

—সত্যপ্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের এমন ভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুললেন যেন মকর সাগরকে বিক্ষুব্ধ করছে।

কৌরব সৈন্যদের এইভাবে আক্রমণ রত সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে কৌরব সৈন্যদের প্রধান প্রধান মহারথী বীররা এক সঙ্গে আক্রমণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে অভিমন্যু ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। যদিও শত্রুরা অভিমন্যুকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছেন, তবু তিনি বৃষসেনের সারথিকে আহত করে তাঁর ধনুটিকে ছেদন করলেন। তখন বৃষসেন অভিমন্যুর অশ্বদের আঘাত করলে তাঁর অশ্বরা বায়ুবেগে পলায়ন করল এই ভাবে তিনি বহুদূরে চলে গেলেন।

অভিমন্যুর পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। সমান ভাবে উদ্দীপ্ত তেজে আর্জুনি কর্ণপুত্র বৃষসেনকে নিহত করলেন। বৃষসেনের মৃত্যুতে কর্ণ রাগে অন্ধ হয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে যুঝতে গেলেন এবং যত বাণ ক্ষেপণ করতে থাকেন অর্জুন নন্দন সে সব কেটে খান খান করে দিলেন এবং প্রত্যুত্তরে কর্ণের কবচ কেটে দিলে তাঁর বাণ কর্ণের শরীর বিদ্ধ করল, তাতে কর্ণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সারথি রথ ফিরিয়ে কর্ণকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে গেল।

অভিমন্যুকে নিকটে আসতে দেখে বসাতি অত্যন্ত দ্রুত উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের জন্য তাঁর সম্মুখীন হলেন। বসাতি অভিমন্যুকে বললেন. তুমি আজ জীবিতাবস্থায় আমার নিকট হতে মুক্তি পাবে না। তখন অভিমুন্যু একটি বাণ বসাতীর বক্ষে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে তিনি প্রাণহীন হয়ে ধরাশায়ী হন।

বসাতিকে নিহত দেখে ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠগণ অভিমন্যুকে বধ করবার জন্য তাঁকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন। এই সময় অভিমন্যুর সঙ্গে তাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের ধনু, বাণ, শরীর, হার ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করলেন। এই ভাবে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের অলঙ্কারে শোভিত হস্ত সমূহ রণ ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। কেবল হাত নয় অভিমন্যু বহু ক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাঁদের রথ, অশ্ব, হাতী সহ নিহত করে রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত করেছিলেন।

দিশো বিচরতস্তস্য সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথা।

রণেঽভিমন্যোঃ ক্রুদ্ধস্য রূপমন্তরধীয়ত ॥ (দ্রোঃ) ৪৪।১৯

—সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নানা দিকে বিচরণকারী ক্রুদ্ধ অভিমন্যুর রূপ তখন অদৃশ্য হয়ে গেল।

তং তদা নাশকৎ কশ্চিচ্চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষিতুম্।

আদদানং শরৈর্যোধান্ মধ্যে সূর্য্যমিব স্থিতম্ ॥ (দ্রোঃ) ৪৪।২১

—অভিমন্যু যখন বানের দ্বারা যোদ্ধাদের প্রাণ নাশ করছিলেন এবং ব্যূহের মধ্যে সূর্যের মত অবস্থান করেছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চোখ তুলে তাঁকে দেখবারই সাহস করলেন না।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে বীর বালক অভিমন্যুর শৌর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বীর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

এইভাবে অভিমন্যু সত্যশ্রবা, বহু ক্ষত্রিয়, মদ্ররাজ শল্যের বীরপুত্র রুক্মরথ এবং তাঁর মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারকে সংহার করলেন। রুক্মরথ অভিমন্যুকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই অভিমন্যুর হাতে নিহত হন্। এবং দুর্যোধন ও অভিমন্যুর নিকট পরাজিত হলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

তয়োঃ ক্ষণমিবাপূর্ণঃ সংগ্রাম সমপদ্যত।

অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরশতাহতঃ ॥ (দ্রোঃ) ৪৫।৩০

—তখন এঁদের উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল পর্যন্ত অসামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ চলল্। তার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্যোধন শত শত বাণে আহত হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হলেন।

দুর্যোধন যখন পলায়ন করলেন, তখন শত শত রাজপুত্র নিহত হল। (দুর্যোধনে চ বিমুখে রাজপুত্রশত হতে।) ভয়ে কৌরব সৈন্য পলায়ন করতে লাগল। শত্রুকে জয় করবার তাদের কোন উৎসাহই ছিল না। তারা যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুদের পরিত্যাগ করে অশ্ব ও হস্তীর উপর আরোহণ করে পলায়ন করতে লাগল। এদের সকলকে পলায়ন করতে দেখে দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্মা ও শকুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু অভিমন্যু এদের সকলকেই প্রায় তাড়িয়ে দিলেন।

এই সময় দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ স্পর্ধা করে অভিমন্যুর সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য পিতা দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মহারথীরা প্রত্যাবর্তন করলেন।

তং তেঽভিষিষিচুর্বাণৈর্মেঘা গিরিমিবাম্বুভিঃ।
স তু তান্ প্রমমাথৈকো বিষ্বগ্বাতো যুথাম্বুদান॥ (দ্রোঃ) ৪৬।১০

—মেঘ যেমন কোন পর্বতকে নিজের বারি ধারায় সিঞ্চিত করে থাকে, তেমনি তাঁরা মহারথী অভিমন্যুর উপর বাণ সমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। যেমন বায়ু মেঘকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি ভাবে একাকী অভিমন্যু সব বীরকে মথিত করে ফেললেন।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধন তনয় লক্ষ্মণ অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসলে স্নেহভরে তিনি বলেন—

হিতবাক্য কহি শুন ভাই রে লক্ষ্মণ॥
... ...
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না করিহ রণ ভাই মোর বাক্য ধর॥
... ...

মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ ॥

… … …

সম্বরি সমর চলি যাহ নিজ ঘরে ॥
তোমারে বধিলে কোন্ সিদ্ধ হবে কাজ।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্মরাজ ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই।
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই ॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর। (দ্রোঃ)

তিনি আরও বললেন কর্ণ ও শকুনির মাথা তিনি কেটে ফেলবেন। লক্ষ্মণ শত্রু পুত্র হলেও অভিমন্যুর লক্ষ্মণের প্রতি সেই বিদ্বেষ ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। কারণ বার বার তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেছেন। বীর যোদ্ধা অভিমন্যুর অন্তরেও যে কোমলতা ছিল, তা লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর উক্তি হতে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু অভিমন্যুর এ দৃপ্ত কথা শুনে লক্ষ্মণ তাঁকে তাঁর বড়াই ছাড়তে বলে অভিমন্যুকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

সকুণ্ডলে কাটি পড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
দেখি দুর্যোধন হৈল শোকে অচেতন। (দ্রোঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতে লক্ষ্মণের আক্রমণে আঘাত পেয়েও অভিমন্যু তাঁকে বললেন, এই জগৎকে তুমি ভাল করে দেখে নাও। এখন শীঘ্রই তুমি নিহত হবে। এই বান্ধবদের সামনে তোমাকে আমি যমালয়ে পাঠাচ্ছি। এই কথা বলেই অভিমন্যু একটি ভল্ল দ্বারা লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। লক্ষ্মণ নিহত হলে চারদিকে সকলে হাহাকার করছিল। পুত্র শোকাতুর দুর্যোধন তখন বললেন এই অভিমন্যুকে সংহার কর।

কাশীদাসী মহাভারতে পুত্র শোকে দুর্যোধন হাহাকার করতে

লাগলেন। এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই গদা হাতে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এলেন—

আর্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ শত্রু দুষ্ট তার লাগ পাই॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে।
কপটে পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে॥
মোরা বনবাসী তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর॥ (দ্রোঃ)

তিনি আরও বললেন—

না করিহ অবহেলা বলি শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবে সাধ না কর অন্তরে॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
হাতের গদায় মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
... ...
বাণাঘাতে দুর্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর॥ (দ্রোঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতে—

তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ স বৃহদ্বলঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ষড়রথা পর্য্যবারয়ন॥ (দ্রোঃ) ৪৭।৪

—তখন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে ঘিরে ফেললেন।

তা দেখে অর্জুন তাঁদের সকলকে বিদ্ধ করে রণবিমুখ করে দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে জয়দ্রথের বিশাল সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন কলিঙ্গ সৈন্যরা, নিষাদগণ ও পরাক্রমশালী ক্রাথপুত্র —এঁরা সকলে কবচ ধারণ করে গজ সৈন্য দ্বারা অভিমন্যুর পথ রোধ

করলেন। তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অভিমন্যু বায়ু যেমন আকাশে শত শত মেঘ মণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় তেমনি গজ সৈন্যদের নষ্ট করলেন। (যথা বায়ুর্নিতাগতি জলদান শত শোহস্বরে।) তখন ক্রাথ অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই সময়ে দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীরা পুনরায় ফিরে আসলেন। তাঁরা সকলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন শরাঘাতে সকলকে বিরত করে ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি ক্রাথপুত্রর দুই বাহু, মুকুট মণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সারথি সহ রথ এবং অশ্বদের বধ করে ভূপাতিত করলেন। সেই বীর ক্রাথপুত্র নিহত হলে পর সব বীর সৈন্যরা পলায়ন করল।

অভিমন্যুর শরাহত হয়ে কর্ণ দ্রোণকে বলেছেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্ত্তব্য, শুধু এই কারণে অভিমন্যু দ্বারা নিপীড়িত হয়েও আমি ভয়ে পালাইনি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

দ্রোণ হেসে বললেন, অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমিই তার পিতাকে কবচ ধারণ প্রণালী শিখিয়েছিলাম। অভিমন্যু নিশ্চয় সেই সব বিধি জানে। দ্রোণ বুঝেছিলেন যে ধর্ম ও ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু অপরাজেয়। তাই দ্রোণ বললেন, কর্ণ, যদি পার তার ধনু ছিন্ন কর। অশ্ব সারথি বিনষ্ট কর। তারপর পশ্চাৎ হতে তাকে আক্রমণ কর। যদি বধ করতে চাও, তবে তাকে রথহীন ও ধনুহীন কর।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধনের অভিযোগে রুষ্ট হয়ে দ্রোণাচার্য প্রত্যুত্তরে দুর্যোধনকে অভিযুক্ত করে বললেন যে তিনি প্রাণপণে দুর্যোধনের কাজ করছেন, কিন্তু অভিমন্যুকে জয় করবার মত কোন বীর নাই। তার ভয়ে স্বয়ং দুর্যোধন পালিয়ে এসেছেন। কর্ণ যাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পারল না অতএব তাকে জয় করবার কে আছে? যত বড় বড় বীর ছিলেন সকলে লজ্জায় ও বিষাদে নত মস্তকে অবস্থান করছিলেন। তখন গুরু দ্রোণ বললেন—

ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অর্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
তাহাকে নারিব ন্যায় যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন ॥ (দ্রোঃ)

দুর্যোধন বলে—সপ্ত রথী এক কালে কর গিয়া রণ ॥

এতেক শুনিয়া গুরু বিবস বদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥
কৃপাচার্য্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্যোধন ॥

দ্রোণাচার্যের নীতি বাক্য দুর্যোধনের হৃদয় স্পর্শ করল না। তিনি বললেন, যদি করা না হয় তবে আর্জুনি সকলকে বধ করবে। শত্রুকে বধ করবার কোন বিধি বা নিয়ম নাই। এ শিশু শমনের মত সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে—

এক কালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী। (দ্রোঃ।

সপ্তরথী কে কে—

দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, দ্রোণ, কৃপা, অশ্বত্থামা—
আমি যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ।

... ...

এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল ॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্যোধন এই মহাপাপে ॥

কপট পাশা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ এবং কপট যুদ্ধ নীতি ঘটালে দুর্যোধনের মরণ।

বেদব্যাসের মহাভারতে ছয় মহারথী একত্রে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলে, অভিমন্যু সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ সেই সব মহাধনুর্ধরদের নিজের বাণের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে দিলেন। তিনি দ্রোণকে পঞ্চাশ, বৃহদ্বলকে বিশ, কৃতবর্মাকে আশী, কৃপাচার্যকে ষাট্ এবং অশ্বত্থামাকে দশটি বাণ দ্বারা আহত করলেন। কর্ণের কানে পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণধার একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কৃপাচার্যের চারটি অশ্ব ও তাঁর দুই পার্শ্ব রক্ষককে ভূপাতিত করে তাঁর বুকে দশটি বাণের দ্বারা আঘাত করলেন।

অভিমন্যু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সামনেই বীর বৃন্দারকে নিহত করেন। তিনি অশ্বত্থামাকেও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন। অশ্বত্থামাও তীক্ষ্ণ, ও ভয়ঙ্কর ষাটটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। বাণ বিদ্ধ করেও তিনি, মৈনাক পর্বতের ন্যায় অভিমন্যুকে কম্পিত করতে পারলেন না। (উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্বতম্।) অভিমন্যু তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা প্রত্যাঘাত করলেন। তখন দ্রোণাচার্য অভিমন্যুর উপর একশত বাণ বর্ষণ করলেন। সেই সঙ্গে অশ্বত্থামাও নিজ পিতাকে রক্ষা করবার জন্য অভিমন্যুর উপর আটটি বাণ নিক্ষেপ করেন। তারপর কর্ণ বাইশ, কৃতবর্মা বিশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশ ও কৃপাচর্য অভিমন্যুকে দশটি ভল্ল প্রহার করলেন। অভিমন্যু তাদের সকলকেই দশটি দশটি করে বাণ বিদ্ধ করলেন।

তারপর কোশলরাজ বৃহদ্বল একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর বক্ষে আঘাত করলেন। অভিমন্যু বৃহদ্বলের চারটি অশ্ব ও ধ্বজ, ধনু ও সারথিকে নিহত করে ভূপাতিত করলেন। এবং একটি বাণ রাজপুত্র বৃহদ্বলের বক্ষে বিদ্ধ করলেন। ইহাতে তিনি ভূতলে পতিত হলেন। এরপর অভিমন্যু দশহাজার নৃপতিকে সংহার করলেন।

তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্ রণে।
ব্যষ্টম্ভয়ন্মহেম্বাসো যোধাংস্তব শরাম্বুভিঃ॥ (দ্রোঃ) ৪৭।২৪

—এই ভাবে সুভদ্রানন্দন বৃহদ্বলকে বধ করে যোদ্ধাদের উপর

নিজের বাণ রূপী জলবর্ষণ করতে করতে তাদের স্তব্ধ করে দিয়ে রণাঙ্গনে বিচরণ করতে লাগলেন।

বালক অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর এই একক সংগ্রাম যথার্থই প্রশংসনীয়।

অতঃপর অভিমন্যুর সঙ্গে কর্ণর প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়। অভিমন্যু বাণাঘাতে কর্ণকে ক্ষত বিক্ষত করে তাঁর শরীরে রক্তধারা বইয়ে দিলেন। তারপর অভিমন্যু কর্ণের ছয়জন বীর মন্ত্রীকে তাঁদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত করলেন, এবং একই সময় কোন প্রকার বিচলিত না হয়েই দশ দশটি বাণের দ্বারা অন্য মহাধনুর্ধর বীরদের আহত করে ফেললেন। তখন সকলের কাছে এটা এক অদ্ভুত কাজ বলেই মনে হচ্ছিল। এইভাবে অভিমন্যু মগধরাজ শল্যর পুত্র অশ্বকেতুকেও ছয়টি বাণের দ্বারা অশ্ব ও সারথিসহ রথ হতে ভূপাতিত করেন। তারপর মার্তিকাবতক দেশের অধিপতি ভোজকে বধ করেন।

অতঃপর দুঃশাসনপুত্র চারটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর অশ্বদের সারথি ও অভিমন্যুকে আহত করে। এটা দেখে অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হয়ে সাতটি বাণে দুঃশাসনপুত্রকে বিদ্ধ করে বললেন—

তোর বাপ কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়েছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে তুই যুদ্ধ করতে জানিস। কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ নিয়ে যেতে পারবি না। এই কথা বলে অভিমন্যু একটি নারাচ দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তিন বাণে তা মধ্যভাগে ছিন্ন করলেন। তখন আর্জুনি অশ্বত্থামার ধ্বজ ছিন্ন করে শল্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করলেন। এই সময় শল্য নয়টি বাণে অভিমন্যুকে আহত করবেন, এই সময় অভিমন্যু শল্যের ধ্বজ ছিন্ন করে তাঁর দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করলেন। তখন শল্য পালিয়ে অন্য রথে আরোহণ করলেন। তারপর অভিমন্যু শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুর্বচা ও সূর্যভাস—এই পাঁচজন বীরকে বধ করে শকুনিকে আহত করলেন।

শকুনি তখন দুর্যোধনকে বললেন, এই অভিমন্যু আমাদের এক একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অস্ত্র প্রহার করবার পূর্বেই আমরা সকলে মিলে তাকে বধ করব।

তারপর কর্ণ দ্রোণাচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, অভিমন্যু আমাদের সকলকে বিনাশ করবার চেষ্টা করছে। সুতরাং তার পূর্বেই আমরা যাতে তাকে বধ করতে পারি, তার উপায় বলুন।

দ্রোণাচার্য বললেন, এই কুমার অভিমন্যুর মধ্যে কোথায় দুর্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারদিকে রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই অভিমন্যুর যদি কোথাও কোন ছিদ্র দেখতে পাও, তার অনুসন্ধান কর।

এর যুদ্ধের ক্ষিপ্রতা লক্ষণীয়, এত দ্রুত শরাঘাত করছে যে রথে বিচরণকারী তার ধনু কেবল মণ্ডলাকারেই লক্ষিত হচ্ছে। যদিও অভিমন্যু বাণের দ্বারা আমার প্রাণকে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে, তথাপি

প্রহর্ষয়তি মাং ভূয়ং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ সৌভদ্রো বিচরন্ রণে॥ (দ্রোঃ) ৪৮২২

—বারংবার সে আমার হর্ষ বর্ধনই করছে। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই সুভদ্রানন্দন আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করছে।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহারথীরাও তার ছিদ্র দেখতে পারছে না, সে অতি দ্রুত হস্ত চালনা করতে করতে নিজের মহাবাণের দ্বারা চারদিক ব্যাপ্ত করেছে। যুদ্ধে আমি গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও এই অভিমন্যুর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি না। (ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাণ্ডীব ধন্বনঃ।)

অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু।
সধনুষ্কো ন শক্যোঽয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ॥ (দ্রোঃ) ৪৮।৩০

—(অভিমন্যুকে) যুদ্ধ হতে বিমুখ করে দিয়ে পরে এর উপর প্রহার কর। এর হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে সমস্ত দেবতা ও অসুরদেরও জয় করতে পারে।

দ্রোণাচার্যের মত অভিজ্ঞ দক্ষ শস্ত্রবিদের মুখে অভিমন্যুর এই প্রশংসা বীর পুত্র অভিমন্যুর শ্রেষ্ঠ সম্মান।

দ্রোণের এই কথা শুনে কর্ণ অভিমন্যুর ধনু ছেদন করলেন। কৃতবর্মা তাঁর অশ্বদের বিনাশ করলেন এবং কৃপাচার্য তাঁর দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করলেন। অন্যান্য মহারথীরা অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন হওয়ায় তার উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগল। এই ছয় মহারথী রথহীন এই বালকের উপর বাণ বর্ষণ করে তাকে আবৃত করে ফেললেন। ধনু ছিন্ন হলে, রথ নষ্ট হলে অভিমন্যু ঢাল ও তরবারি হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। তখন প্রতিপক্ষের মহারথীরা অভিমন্যুকে বাণবিদ্ধ করলেন।

সেই সময় দ্রোণ একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর তরবারিটি ছেদন করলেন। কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁর ঢালটি খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

ঢাল ও তরবারি হতে বঞ্চিত হয়ে অভিমন্যু একটি চক্র হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যের দিকে ধাবিত হলেন।

রণেঽভিমন্যুঃ ক্ষণমাস রৌদ্রঃ
স বাসুদেবানুকৃতিং প্রকুর্বন্॥ (দ্রোঃ) ৪৮।৩০

—সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যু চক্রহাতে ভগবান কৃষ্ণের বা বাসুদেবের অনুকরণ করতে করতে ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন।

অভিমন্যুর চক্র দেখে সমস্ত মহারথীরা উদ্বিগ্ন হয়ে একযোগে ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে নিলেন। গদা হাতে নিয়ে তিনি অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা ভয়ে তাঁর রথের আসন হতে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। সেই গদার আঘাতে অশ্বত্থামার চারটি অশ্ব ও দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করেন। তারপর তিনি সুবলপুত্র

কালিকেয়কে গদাঘাতে ভূপাতিত করেন এবং তাঁর অনুগামী সাতাত্তর জন গান্ধার যোদ্ধাকেও বধ করলেন। তারপর দশজন বসাতিকে নিহত করলেন। কেকয় দেশের সাত রথী ও দশটি হাতীকে বধ করে দুঃশাসনপুত্রের অশ্বদের সহ রথকে গদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললেন।

তখন দুঃশাসনপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে গদা নিয়ে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হয়ে বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও, উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব গদাযুদ্ধ সুরু হল। উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে ভূপতিত হল। তারপর দুঃশাসনপুত্র প্রথমে উঠে অভিমন্যুর মস্তকের উপর গদার প্রচণ্ড আঘাত করলেন। গদার এই আঘাতে অভিমন্যু অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হলেন। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু যোদ্ধা মিলিত হয়ে একা অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন। (এবং বিনিহতো রাজন্নেকো বহুভিরাহবে।)

ক্ষোভয়িত্বা চমূকং সর্বাং নলিনীমিব কুন্তরেঃ।
অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্বনগজো যথা॥ (দ্রোঃ) ৪৯।১৫

—হাতী যেমন কোন সরোবরকে মথিত করে, তেমনি সৈন্য-বাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে ব্যাধগণ দ্বারা বন্য হাতীর মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যুবরণ করে ধীরে অভিমন্যু সেখানে অদ্ভুত শোভা পেতে লাগলেন।

বালক বীর অভিমন্যুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সংগ্রাম এক আশ্চর্য অভূতপূর্ব বীরত্বের নিদর্শন। একজনের সঙ্গে ছয় মহারথীর বয়োঃবৃদ্ধ কতশত যোদ্ধা একত্রে সংগ্রাম করে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গে সজারুর কাঁটার মত তীরবিদ্ধ অবস্থায় একের পর অন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অস্ত্র দিয়ে অভিমন্যু কৌরব রথী মহারথী ও সৈন্যদের ধরাশায়ী করেছিলেন। ন্যায় যুদ্ধে কেহই তাঁকে পরাস্ত করতে পারতো না। একজনের বিরুদ্ধে ছয় মহারথীর সমবেত যুদ্ধ—অন্যায় যুদ্ধ। দুর্যোধনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রোণের পরামর্শে

ছয় রথী এক কালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁকর॥
... ...
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি শরীর ত্যজিল॥
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ। (দ্রোঃ)

কবি কাশীরাম দাস কিশোর অভিমন্যুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখে একটা সুন্দর স্বগোক্তি দিয়ে কিশোর বীরের শেষ মানসিক অবস্থার এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন :—

রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার বার॥
অনাথের নাথ তুমি আপদ ভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্তা নাহি কোন জন॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের গতি।
কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সারথি॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিনু চরণ তোমার॥
না দেখিনু জ্যেষ্ঠতাত পিতার বদন।
আর নাহি দেখিলাম মাতার চরণ॥
এত বলি পুনরপি লয়ে শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন॥ (দ্রোঃ)

এই স্বগোক্তির মধ্যে কিশোরের বেদনা কাতর মন মূর্ত হয়ে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্যুর সম্বন্ধে বলেন :—

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ।
অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশন্তে গুণ সঞ্জয়ঃ॥

যুধিষ্ঠিরস্য বীর্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ।
কর্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্মণঃ॥
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ॥ (দ্রোঃ) ৩৪।৮-১০

—কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের চরিত্রে যে সব গুণ স্ফীত, সেই সব গুণ অভিমন্যুতে বিদ্যমান। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ধৈর্যশীল, কৃষ্ণের ন্যায় চরিত্র, কর্মে ভীমকর্মা ভীমসেনের মত, রূপে, বিক্রমে ও বিদ্যায় ধনঞ্জয়ের মত বিনয়ে নকুল ও সহদেবের ন্যায়। যাদবকুল ও পাণ্ডবকুলের যাবতীয় গুণ তাঁর চরিত্রকে অলঙ্কৃত করেছিল।

সঞ্জয় অভিমন্যু সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন, যদিও সেই চক্রব্যূহকে ভেদ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য ছিল, তথাপি বীর অভিমন্যু পিতা অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই ব্যূহকে বারংবার ভেদ করেছিলেন।

অভিমন্যু এই দুষ্কর কাজ করে সহস্র সহস্র বীরদের বধ করেছিলেন এবং অবশেষে সাত বীরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে করতে দুঃশাসনের পুত্রের হস্তে নিহত হলেন।

সঞ্জয়ের উক্তি হতে কিশোর অভিমন্যু যে মহাবীর, সুদর্শন, বিদ্বান, চরিত্রবান ও বিনয়ী ছিলেন তা জানা যায়।

পাণ্ডবদের হতভাগ্যবশতঃ মহাদেবের বরে সেদিন জয়দ্রথ অজেয় হয়ে চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষা করছিলেন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ বহু চেষ্টা করেও অভিমন্যুর সাহায্যার্থে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না। সেইজন্য অভিমন্যুকে এত বীরের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে বীরের মত প্রাণ দিতে হল।

অভিমন্যুর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে ছিলেন।

Shaftsbury বলেছেন—True courage is cool and calm. The bravest of men have the least of a brutal, bullying insolence, and in the very time of danger

are found the most severe and free. অভিমন্যু চরিত্র প্রকৃতই অনুরূপ। প্রকৃত বীর সব সময় ধীর স্থির। তাঁদের মধ্যে প্রগলভের পাশবিকতা অতি বিরল এবং বিপদ কালে তাঁরা অত্যন্ত কঠিন ও দ্বিধা শূন্য।

অভিমন্যুর যুদ্ধতৎপরতা, স্থৈর্য ও বীর্য তুলনাহীন। যদিও কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ যুগপৎ এই বীর যোদ্ধাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে ভয় স্থান পায়নি। ক্ষিপ্র গতিতে তিনি যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

অভিমন্যুর পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে কাশীদাসী মহাভারতে বলা হয়েছে যে যুধিষ্ঠিরের শোকে সান্ত্বনা দিতে এসে ব্যাসদেব বলেছেন—

একদিন গর্গমুনি শিষ্যগণ সহ চন্দ্রলোকে গেলেন। তখন চন্দ্র রোহিণীর সঙ্গে ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকায় গর্গ মুনিকে অভ্যর্থনা করেননি। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—

মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর। (দ্রোঃ)

গর্গ মুনির শাপ শুনে চন্দ্র তাঁর সেবা করতে গিয়ে স্বীকার করেন যে অন্যমনস্ক থাকায় মুনির যথাযথ পূজা করা হয়নি।

অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হয়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হয়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
... ...
অর্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কর্ম পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনঃ আগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে। (দ্রোঃ)

ব্যাসদেব জানালেন এই জন্যই অভিমন্যু এত কিশোর বয়সে প্রাণ হারিয়েছেন।

যস্তু বর্চা ইতি খ্যাতঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্।
সোঽভিমন্যুর্বৃহৎকীর্তিরর্জুনস্য সুতোঽভবৎ॥ (আদি) ৬৭।১১২

—সোমপুত্র বর্চা পরজন্মে অর্জুন পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রখ্যাত কীর্তিমান অভিমন্যু।

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্যু সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—

মহাধনুর্ধর বীর বাপের সমান।
... ...
অর্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান। (শকুনি বলেছেন।)
... ...
বাপের দোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥ (দ্রোণ বলেছেন।)

মহাভারতে অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদ করে একা সহস্র বীরের মত যুদ্ধ করতে দেখা গেছে। মেঘনাদ অমিত শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বারংবার যুদ্ধের মাধ্যমে।

একমাত্র প্রবল পরাক্রম ব্যতীত ইন্দ্রজিৎ ও অভিমন্যুর মধ্যে অন্য সাদৃশ্য তেমন দেখা যায় না। তাঁদের মধ্যে অন্য একটি সাদৃশ্য—উভয়ে শত্রু কর্তৃক অন্যায় ভাবে নিহত হয়েছেন। এইরূপ অন্যায় ভাবে অভিমন্যু বা ইন্দ্রজিতকে যদি বধ করা না হোত—তবে কোন প্রকারেই বোধ হয় এই দুই বীরকে পরাজিত ও নিহত করা সম্ভব হত না।

The soul is strong that trusts in goodness—English poet Philip Massinger এর উক্তিটি ঘটোৎকচের চরিত্রে প্রযোজ্য।

ইন্দ্রজিৎ ও অভিমন্যুর সঙ্গে ঘটোৎকচের সাদৃশ্য এই যে সেও প্রথমোক্ত দুই বীরের মত অনুগত পিতৃভক্ত সন্তান। রাক্ষসী পুত্র হলেও তার স্বভাব, আচার ব্যবহার অমায়িক নম্র, ভদ্র।

পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর পুত্র ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনান্মহাবলম্।
বিরূপাক্ষং মহাবক্ত্রং শঙ্কুকর্ণং বিভীষণম্॥
ভীমনাদং সুতাম্রৌষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাবলম্।
মহেষ্বাসং মহাবীর্য্যং মহাসত্ত্বং মহাভুজম্॥
মহাজবং মহাকায়ং মহামায়মরিন্দমম্।
দীর্ঘঘোণং মহোরস্কং বিকটোদ্বদ্ধপিণ্ডিকম্॥
অমানুষং মানুষজং ভীমবেগং মহাবলম্।
যঃ পিশাচানতীত্যান্যান্ বভূবাতীব রাক্ষসান্॥

(আঃ) ১৫৪।৩১-৩৪

—রাক্ষসী ও ভীমসেনের এই পুত্রের চক্ষু বিকট, মুখ বিশাল, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় এবং দেখতে অতি ভয়ানক ছিল। তার স্বর ভয়ানক ছিল, ওষ্ঠ তাম্র বর্ণ ও দাঁত তীক্ষ্ণ ছিল, সে শত্রু দমন মহাবলশালী মহাধনুর্ধর, মহাবীর্যসম্পন্ন, মহাবাহু, মহাবেগ, মহাশরীর ও মহামায়া বিশিষ্ট ছিল, তার নাক ও বুক বিশাল ছিল। মানুষ হতে সেই অমানুষ ভীমবেগ ও মহাবল সম্পন্ন পুত্র জন্মাল। সে অন্যান্য পিশাচ ও রাক্ষসদের থেকে অধিক বলশালী হল।

বয়সে বালক হলেও লোক চোখে যুবক হিসেবে দেখা গেল। সে

সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করল। কেশ শূন্য মস্তক (ঘট অর্থ মস্তক, উৎকচ অর্থ কেশ শূন্য) বলে হিড়িম্বা পুত্রের নাম রেখেছিল ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ জন্ম লাভ করেই পিতা মাতাকে প্রণাম করল।

ঘটোৎকচ অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সেবা করত। এজন্য পাণ্ডবরাও তাকে খুব ভালবাসত। সে সর্বদা তাঁদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতো।

সন্তান জন্মাবার পর হিড়িম্বা আপন সর্তানুসারে নিজ অভিষ্ট স্থানে চলে গেল তখন ঘটোৎকচ কুন্তী ও পাণ্ডবদের যথারীতি প্রণাম করে বলল—

কিং করোম্যহমার্য্যাণাং নিঃশঙ্কং বদতানঘাঃ।
তং ব্রুবন্তং ভৈমসেনিং কুন্তী বচনমব্রবীৎ॥ (আঃ) ১৫৮।৪২

—ভীমপুত্র কুন্তীদেবীকে বললে—আমি আপনাদের কি কাজ সাধন করব। আপনারা তা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলুন।

তখন কুন্তী বললেন, তুমি কুরুকুলে জন্মেছ। সাক্ষাৎ ভীমের তুল্য বলবান তুমি। পঞ্চ পাণ্ডবের তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং হে পুত্র, তুমি পাণ্ডবদের সাহায্য করবে।

কুন্তীর কথা শুনে ঘটোৎকচ তাঁকে প্রণাম করে বললে—

যথা হি রাবণো লোক ইন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।
বর্ষ্মবীর্যসমো লোকে বিশিষ্টশ্চাভবং নৃষু॥ (আঃ) ১৫৪।৪৪

—রাবণ ও ইন্দ্রজিতের যেমন শারীরিক বল ছিল, এই মর্তলোকে আমারও তদ্রূপ। হয়ত তাদের চেয়েও বেশী হতে পারে।

যখনই আমার প্রয়োজন হবে, স্মরণ মাত্রই আমি পিতৃবর্গের সেবার জন্য উপস্থিত হব—এই বলে ঘটোৎকচ সকলের নিকট বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

বেদব্যাসের মহাভারতে বলা হয়েছে কর্ণের একাঘ্নী শক্তির

আঘাত সহ্য করবার জন্যই ইন্দ্র অনুপম বীর্যশালী ঘটোৎকচকে সৃষ্টি করেছিলেন।

ঘটোৎকচের ন্যায় একটি রাক্ষসের এইরূপ বিনয় ও অমায়িক ব্যবহার হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ভীমকে বিবাহ করবার পূর্বে হিড়িম্বা রাক্ষসী আত্ম পরিচয় দিয়ে মাতা কুন্তীকে যে বলেছিল—

> ন যাতুধান্যহং ত্বার্য্যে ন চাস্মি রজনীচরী।
> কন্যা রক্ষঃসু সাধ্ব্যস্মি রাজ্ঞি সালকটঙ্কটী ॥ (আঃ) ১৫৪।১১

—হে আর্য, আমি স্বভাবে যাতুধানী বা নিশাচরী নই। আমি রাক্ষসকুলের সাধ্বী কন্যা, আমার নাম সালকটঙ্কটী—এটা একটা প্রকৃত তথ্য।

হিড়িম্বার এই পরিচয় বোধ হয় সত্য। তাই ঘটোৎকচের ব্যবহার সাধারণ রাক্ষসের মত ছিল না।

ঘটোৎকচ তার গুরুজনদের বলেছিল যে তাঁদের প্রয়োজনে তাকে স্মরণ করলেই সে তাঁদের নিকট হাজির হবে। পাণ্ডুপুত্র সহদেবের ঘটোৎকচের প্রয়োজন হল। কারণ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবেন স্থির হলে চার ভাইকে চারদিকে দিগ্বিজয়ে যাবার আদেশ যুধিষ্ঠির দিলেন। সহদেবকে দাক্ষিণাত্যের ভার দেওয়া হলো। লঙ্কাধিপতি বিভীষণের নিকট কর দাবী করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘটোৎকচকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্র ঘটোৎকচ এসে হাজির হলো।

কাশীদাসী মহাভারতে ঘটোৎকচ কি ভাবে সহদেবের নিকট হাজির হলো তার একটা মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়—

> ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়।
> যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয় ॥
> হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
> তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার ॥

হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানা বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া বচন॥
ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবতে পৃষ্ঠে যেন সহস্র লোচন॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমস্থত।
চতুর্দ্দিক হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেত পতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন মহামতি॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্র লোচন তার অঙ্গেতে থাকিত॥
কেহ বলে এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া, হৈত মহিষ বাহন॥
কেহ বলে এই যদি হৈত হুতাশন।
তবে সে হইত এই হংসের বাহন॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হলে দিবাকর॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বা কুমার॥
প্রবেশ হইতে তারে নিবারে দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি এলে কোথা হৈতে॥
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাই রাজারে।

রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥

... ...

ঘটোৎকচ লয়ে গেল রাজার গোচর।

সহদেবের সামনে এসে ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, আদেশ করুন আমাকে কি করতে হবে। তখন সহদেব তাকে আলিঙ্গন করেন ও তার মস্তক আঘ্রাণ করে অমাত্যদের সঙ্গে তার সৎকার করলেন এবং পরে বললেন, তুমি আমার শাসনের জন্য কর গ্রহণের জন্য লঙ্কাপুরীতে যাও। সেখানে রাক্ষসরাজ বিভীষণের সঙ্গে দেখা করে রাজসূয় যজ্ঞের জন্য নানাবিধ ও বহুপ্রকার ধনরত্ন আহরণ করে ফিরে এসো।

সহদেব আরও বললেন, যদি রাক্ষসরাজ কর দিতে আপত্তি করেন তবে, পুত্র,তাঁকে বিনীত ভাবে এ কথা জানাবে,—হে কুবেরানুজ, কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ভূজবল দেখে ভাইদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন তা আপনি জানেন। আপনার মঙ্গল হোক, আমি এখন যাচ্ছি।

সহদেবের আজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে ঘটোৎকচ লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন। লঙ্কার পথে রামের তৈরী সেতু দেখে রামের প্রবল পরাক্রমের কথা চিন্তা করে সেতুটিকে প্রণাম করলো। সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে সুন্দর লঙ্কা পুরীকে সে দেখলো। অতঃপর ইন্দ্রের ভবনের মত সেই রাজপুরীতে পৌঁছে দ্বারপালদের সম্বোধন করে বলল,

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সহদেব। কৃষ্ণাশ্রিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সহদেব উদ্যত হয়েছেন এবং কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য কর গ্রহণ

করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি পুলস্ত্য নন্দন বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমাকে শীঘ্র তাঁর কাছে নিয়ে যান।

দ্বারপাল ঘটোৎকচের যাবতীয় কথা লঙ্কেশ্বর বিভীষণকে জানাল। তিনি দ্বারপালকে অবিলম্বে ঘটোৎকচকে তাঁর নিকট আনবার আদেশ দিলেন। দ্বারপাল ফিরে এসে ঘটোৎকচকে রাজভবনে যাবার জন্য বলল। ঘটোৎকচ রাজভবনে ঢুকলো। রাজভবনের চোখ ঝলমল নানা ঐশ্বর্য দেখে ও মধুর সঙ্গীত লহরী শুনতে শুনতে স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন মহাত্মা বিভীষণকে দেখলো। রাক্ষসরাজ বিভীষণকে দেখে ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে বন্দনা করলে এবং বিভীষণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন রাজা বিভীষণ যাঁর জন্য কর দাবী করতে ঘটোৎকচ এসেছে সেই রাজার সম্যক পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। ঘটোৎকচ যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন এবং সহদেব তাকে বিভীষণের নিকট পাঠিয়েছেন বলে বলল। তারপর আত্মপরিচয় দিয়ে ঘটোৎকচ বলল, সে ভীমের পুত্র এবং রাক্ষস কুলজাতা হিড়িম্বার ছেলে। ঘটোৎকচ আরও জানাল যে যুধিষ্ঠির ক্রতু শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ করবার উদ্যোগ করেছেন এবং কর গ্রহণের জন্য তিনি চারদিকে তাঁর ভাইদের যাবার আদেশ দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কোন ভাইকে কোন দিকে পাঠিয়েছেন তার বিশদ বিবরণও ঘটোৎকচ বিভীষণের নিকট ব্যক্ত করল। সহদেব তাকে রাজা বিভীষণের নিকট হতে কর নেবার জন্য পাঠিয়েছেন—তাও জানাল। বিভীষণ ঘটোৎকচের কথায় প্রীত হয়ে যুধিষ্ঠির তথা সহদেবের শাসন স্বীকার করলেন। অতঃপর রাজা বিভীষণ সহদেবের জন্য হস্তি পৃষ্ঠ আচ্ছাদন, বিচিত্র ও মূল্যবান নানা ভূষণ, প্রবাল, বহুমণি, সোনার ভাণ্ড, কলস, ঘট, সহস্র জলপাত্র, বহু রূপার জিনিস, মণি মুক্তা খচিত নানা রকম শস্ত্র, মুকুট সমূহ, সুবর্ণ বর্ণ কুণ্ডল ইত্যাদি পাঠালেন। ঘটোৎকচের সঙ্গে আটাশীজন নিশাচর সেই সব রত্নাদি বহন করে সেখান

হতে প্রস্থান করে সহদেবের নিকট উপস্থিত হলো। পাণ্ডুপুত্র সহদেব সেই সব রত্নরাজি দেখে পরম প্রীত হলেন এবং ঘটোৎকচকে আলিঙ্গন করলেন।

অন্যত্র ঘটোৎকচ সম্বন্ধে হিড়িম্বা পাণ্ডব পুরনারীদের কাছে বলছে—

পুত্র হিড়িম্বক মোর বনের ঈশ্বর।
... ...
বিশেষে আমার পুত্রে পূজিছে সকলে॥
মাতুলের রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহু বলে শাসিল যতেক নিশাচর॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মোর পুত্র সব কৈল বশ॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্তা লোক মুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি॥
রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডুপুত্রগণ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন॥
বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ॥
এই ত বিচার তারা অনুক্ষণ করে।
এ সকল বার্তা আসে পুত্রের গোচর॥
চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন॥
লৌহ পাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে।
যাবৎ সাধিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর॥

সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্র প্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা॥

—হিড়িম্বার উপরোক্ত উক্তি হতে ঘটোৎকচের পরাক্রম, প্রভাব ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের যোগ্য পুত্র।

বনপর্বে গন্ধমাদন পর্বতে যাবার পথে পাণ্ডবরা প্রবল ঝড় বৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর হাঁটতে অনভ্যস্তা দ্রৌপদী চলতে না পেরে বসে পড়লেন। ঝড় বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে দ্রৌপদী সংজ্ঞা হারালেন। পতনোন্মুখ দ্রৌপদীকে নকুল ধরে ফেললেন। নকুলের কাছে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মূর্ছার খবর পেয়ে ভীম ও সহদেবের সঙ্গে দ্রৌপদীর নিকট এসে বিলাপ করতে থাকেন।

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বিলাপ শুনে ধৌম্য মুনি প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণরা এসে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দেন, আশীর্বাদ করেন এবং রক্ষোঘ্ন মন্ত্র সমূহ জপ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা নানাবিধ শান্তিকর্ম করলেন। শান্তির জন্য পাঠ করতে থাকলে দ্রৌপদীর সংজ্ঞা আস্তে আস্তে ফিরে আসলো।

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে ঘটোৎকচকে স্মরণ করতে পরামর্শ দিলেন। ঘটোৎকচ সম্বন্ধে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্য্যো বিহগো মদ্‌বলোপমঃ।
বহেদনঘ সর্বান্নো বচনাৎ তে ঘটোৎকচঃ॥ (বনঃ) ২৪৪।৪

—হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহাপরাক্রমী এবং আমার সদৃশ বলবান আপনি অনুমতি করলে সে অনায়াসে আমাদের সকলকে নিয়ে আকাশ পথে যেতে পারবে। পিতার স্মরণ মাত্রই ঘটোৎকচ তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে পাণ্ডবদের ও ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলে তাঁরা তাকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর সে ভীমকে জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার স্মরণ মাত্রই আপনার সেবা করবার ইচ্ছায় এখানে সত্বর এসেছি। আপনি আজ্ঞা করুন। আমি তা পালন করবো।

তা শুনে ভীম রাক্ষসীপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন—

ধর্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সত্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ভক্তোঽস্মানৌরসঃ পুত্রো ভীম গৃহ্ণাতু মা চিরম্॥

(বনঃ) ২২৫'১

—হে ভীম, তোমার ঔরসজাত এই পুত্র ধর্মজ্ঞ, বলবান, বীর রাক্ষস শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের ভক্ত। বিলম্ব না করে সে আমাদের শীঘ্র তুলে নিক। যাতে পাঞ্চালীর সঙ্গে আমরা অক্ষত শরীরে গন্ধমাদন পর্বতে যেতে পারি।

যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা শুনে ভীম ঘটোৎকচকে আদেশ করলেন, তোমার মাতা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন। বৎস, তুমি বলবান ও ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনে সমর্থ, তুমি তাঁকে বহন করে চল। পুত্র, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি আমাদের মধ্যে এঁকে কাঁধে রেখে আমাদের সকলকে ধীরে ধীরে বহন করে এমন ভাবে চল, যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়।

ঘটোৎকচ বলল, ধর্মরাজ, ধৌম্য, কৃষ্ণা, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি সকলকেই আমি একাই বহন করতে সক্ষম, সহায়যুক্ত হলে তো কোন কথাই নেই। আমার সঙ্গী আরও শত শত বীর রাক্ষস আছেন, যারা ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণে সমর্থ ও গগনচারী, তারাও আমার সহায়ক রূপে সব ব্রাহ্মণদের বহন করবে। অতঃপর এই কথা বলে সেই বীর ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে কাঁধে নিয়ে পাণ্ডবদের মধ্য দিয়ে বহন করতে লাগল। এবং অন্যান্য রাক্ষসরা অন্যান্য পাণ্ডবদের বহন করতে লাগল। লোমশ মুনি নিজে যোগশক্তি বলে নিজেই

আকাশ পথে চলতে লাগলেন। ঘটোৎকচের আদেশে অন্যান্য ভীম পরাক্রম রাক্ষসরা ব্রাহ্মণদের বহন করে চলতে লাগল। এই ভাবে ঘটোৎকচ ও তার সঙ্গীরা দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের বহন করে গন্ধ মাদন পর্বত, বদরিকা আশ্রমে পৌঁছলে, বদরিকা আশ্রমে সকলে রাক্ষসদের কাঁধ হতে মাটিতে নাবলেন।

ঘটোৎকচ সারাটা জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে পঞ্চ পাণ্ডবদের সেবা করে গেছে। যখনই তাঁদের প্রয়োজন হয়েছে ঘটোৎকচকে স্মরণ করেছেন, ঘটোৎকচ তার যথাশক্তি দিয়ে তাঁদের সেবা করে গেছে, তাঁদের বিপদ হতে উদ্ধার করেছে। তার মত বিশ্বস্ত অনুগত আচরণ দুলর্ভ। পাণ্ডবদের সেবার জন্যই যেন সে মর্তে এসেছিল। এবং পাণ্ডবদের জন্য আত্মবলি দিয়ে বীরের অভিলষিত স্থানে চলে গেল।

Under the influence of the blessed spirit, faith produces holiness, and holincss strengthens faith. Faith like a fruitful parent, is plenteous in all good works, and good works, like dutiful children, confirm and add to the support of faith—Juan Valera এর উক্তিটি ঘটোৎকচের চরিত্রে প্রযোজ্য।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্থ দিনে ভীমের সঙ্গে ভগদত্তের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভগদত্তের গুরুতর আঘাতে ভীম মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে ধ্বজদণ্ডকে ধরে ফেললেন। ভীমকে মূর্ছিত দেখে ভগদত্ত উল্লাস করতে লাগলেন। তা দেখে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই স্থানে অদৃশ্য হল এবং মায়ার দ্বারা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। তার সঙ্গী রাক্ষসরা আসল। ঘটোৎকচ নিজ হস্তীর উপর বসে ভগদত্তের দিকে চলল। ভয়ঙ্কর চীৎকার ও হাতীর আর্তনাদ শুনে ভীষ্ম দ্রোণ ও দুর্যোধনকে বলল, রাজা ভগদত্ত ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাসঙ্কটে পড়েছেন। এই রাক্ষস বিশাল দেহধারী এবং ভগদত্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। এরা উভয়ই যুদ্ধে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় মনে হচ্ছে (কাল মৃত্যু সমবুভৌ)।

পাণ্ডবরা আনন্দে উল্লাস করছে শোনা যাচ্ছে এবং ভগদত্তের ভীত হস্তীর রোদন ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। আমরা ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য সেখানে যাব। অথবা অরক্ষিত অবস্থায় তিনি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করবেন। ভগদত্ত বীর, কুলীন, আমাদের ভক্ত ও সেনাপতি। তাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। ভীষ্মের এই কথায় মহারথী বীররা দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মকে অগ্রে রেখে ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য তীব্র বেগে সেখানে আসলেন, যেখানে রাজা ভগদত্ত রয়েছে। তাঁদের যেতে দেখে পাণ্ডবরা তাঁদের পশ্চাদধাবন করলেন। সেই সৈন্যদের আসতে দেখে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সিংহধ্বনি করতে লাগল। তার গর্জন ও যুদ্ধরত হাতীদের দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই সময়ে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত মনে হচ্ছে না। কারণ সে বল ও পরাক্রম সম্পন্ন এবং সহায়কদেরও পেয়েছে।

নৈষ শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভৃত্য স্বয়ম্॥
লব্ধ লক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রান্ত বাহনাঃ।

(ভীঃ) ৬৪।৭৫-৭৬

—এই অবস্থায় স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও তাকে পরাজিত করতে সমর্থ হবে না। ঘটোৎকচ অস্ত্র প্রহারে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করতেও পটু। এদিকে আমাদের বাহনগুলি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ভীষ্মের মত বীরের মুখে ঘটোৎকচের বীরত্বের যে প্রশংসা উচ্চারিত হয়েছে, তাতে ঘটোৎকচ যে যথার্থই ভীমের উত্তর সূরী তা প্রমাণিত হয়। ঘটোৎকচের ভয়ে কৌরব সেনার সমস্ত মহারথীই সেদিন উদ্বিগ্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে ঘটোৎকচ রাক্ষসী তনয় বলেও পরাক্রমে ইন্দ্রজিৎ বা অভিমন্যু হতে কোন অংশে ছোট নয়। বীরত্বের দিক থেকে এই ত্রয়ীই সমতুল্য।

সৈন্যরা সারাদিন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। সেইজন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে বর্তমানে যুদ্ধ করা আমার (ভীষ্ম)

মত্তে উচিত নয়। আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হোক। আগামী কাল আমরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ভীষ্মের কথায় উপায়ন্তর না দেখে কৌরবরা যুদ্ধ হতে বিরত হতে সম্মত হলেন।

উপায়েনাপয়াৎ তে ঘটোৎকচ ভয়ার্দিতাঃ॥ (ভীঃ) ৬৪।৭৮

—কারণ সেই সময় তাঁরা সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

কৌরবরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হলে পাণ্ডবরা বিজয় উল্লাস করতে লাগল। এইরূপে সেদিন সম্পূর্ণ দিনব্যাপী ঘটোৎকচকে সামনে রেখে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সামনে রেখে পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করতে করতে প্রসন্নতার সঙ্গে নানা প্রকার সিংহনাদ করে চললেন। পাণ্ডব শিবির তখন আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত।

নিজের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুতে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত দীন হয়ে পড়লেন। তিনি অশ্রু মোচন করতে করতে শোকে ব্যাকুল চিত্ত হয়ে ভ্রাতাদের জন্য দুঃখ ও শোক করতে লাগলেন। চতুর্থ দিনের যুদ্ধ এভাবে সমাপ্ত হল।

অর্জুন পুত্র ইরাবনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রাক্ষস অলম্বুষ কর্তৃক নিহত হতে দেখে ভীম পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগল। তার গর্জনে তখন সমুদ্র, আকাশ, পর্বত প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হল। ঘটোৎকচের ভয়ানক সিংহনাদ শুনে কৌরব সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত ও সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হল।

জ্বলিতং শূলমুদ্যম্য রূপং কৃত্বা বিভীষণম্।
নানারূপ প্রহরনৈর্বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ॥ (ভীঃ) ৯১।৮

—সেই রাক্ষস ভীষণ রূপ ধরে প্রজ্বলিত ত্রিশূল হাতে নিয়ে নানাবিধ অস্ত্রে পরিবৃত শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবৃন্দের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে আপনার (ধৃতরাষ্ট্র) সৈন্যদের সংহার করতে লাগল। ক্রুদ্ধ

ঘটোৎকচকে আক্রমণ করতে দেখে তার ভয়ে ভীত আপনার প্রায় সব সৈন্যরা পলায়ন করল।

তখন রাজা দুর্যোধন বিশাল ধনু নিয়ে বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে রণাঙ্গনে ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন। তার পশ্চাতে দশ হাজার গজ সৈন্যের সঙ্গে স্বয়ং বঙ্গদেশের রাজাও গমন করলেন।

হস্তী সৈন্য পরিবৃত হয়ে দুর্যোধনকে আসতে দেখে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হল। তখন দুর্যোধনের সৈন্য এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুরু হল। এই গজ সৈন্যকে দেখে ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ অস্ত্র নিয়ে তার দিকে ছুটল। সে বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর, পরশু, পর্বত শিখর এবং বৃক্ষ সমূহ প্রহার করে গজারোহী যোদ্ধা এবং গজরাজগণকে বধ করতে লাগল।

রাক্ষসরা গজরাজদের নিহত করল। গজারোহী যোদ্ধারা ভগ্ন এবং নষ্ট হয়ে গেলে দুর্যোধন অমর্ষের বশীভূত হয়ে স্বীয় জীবনের মোহ পরিত্যাগ করে সেই রাক্ষসদের উপর আক্রমণ করলেন।

দুর্যোধন রাক্ষসদের উপর তীক্ষ্ণ বহুবাণ বর্ষণ করলেন এবং তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসদের বধ করলেন। দুর্যোধন বেগবান, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী এই চার রাক্ষসকে চারিটি বাণে নিহত করলেন। তারপর দুর্যোধন রাক্ষস সৈন্য বহিনীর উপর দুর্ধর্ষ বাণ সমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের এই যুদ্ধ দেখে ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। এবং বিশাল ধনু আকর্ষণ করে দুর্যোধনের দিকে তীব্র বেগে গেল। ঘটোৎকচকে আসতে দেখে দুর্যোধন অল্পও ব্যথিত হলেন না।

তারপর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করে দুর্যোধনকে বলল, আজ আমি পিতৃদেব ও মাতা যাদের তুমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনে বাস করতে বাধ্য করেছিলে তাঁদের ঋণ হতে মুক্ত হব। তুমি অত্যন্ত ক্রুর স্বভাব। তুমি পাশা খেলায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের

পরাজিত করেছিলে এবং একটি মাত্র বস্ত্র পরিহিতা দ্রুপদ তনয়া কৃষ্ণাকে রজস্বলা অবস্থায় সভার মধ্যে এনে নানা প্রকার ক্লেশ দিয়েছিলে, তোমারই প্রিয় করতে ইচ্ছুক হয়ে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আমার পিতৃদেবকে অবহেলা করে আশ্রমে অবস্থিতা দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিল। যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়ে না যাও, তবে এই সমস্ত অপমান ও অন্য সব অত্যাচারের প্রতিশোধ আজই গ্রহণ করব। এই বলে ঘটোৎকচ নিজের বিশাল ধনু আকর্ষণ করে দুর্যোধনের উপর সেইরূপ প্রভূত বাণ বর্ষণ করল, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের শিখরের উপর জলধারা বর্ষণ করে থাকে। ঘটোৎকচের শরাঘাতে দুর্যোধনের জীবন সংশয়াপন্ন হল। ঘটোৎকচ দুর্যোধনকে বিনাশ করবার জন্য যে শক্তি উত্তোলন করল, তা দেখে বঙ্গদেশ রাজা অত্যন্ত দ্রুত পর্বতের ন্যায় বিশাল গজরাজকে সেই রাক্ষসের দিকে পাঠালেন। বঙ্গাধিপতি সেই গজরাজে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে দুর্যোধনের রথ ছিল সেখানে গেলেন। এই ভাবে বঙ্গদেশের রাজা দুর্যোধনের রথের পথ রুদ্ধ করায় ঘটোৎকচের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হল। তখন ঘটোৎকচ যে মহাশক্তি দুর্যোধনের উপর প্রয়োগ করবে স্থির করেছিল, সেই মহাশক্তি হাতীর উপর নিক্ষেপ করল। ফলে হাতীটি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়ে মরে গেল। হাতী ভুপতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাধিপতি তার পৃষ্ঠ হতে লাফিয়ে পড়লেন। গজরাজকে পতিত হতে দেখে কৌরব সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করল। তা দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি ঘটোৎকচের পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে তার সম্মুখে যুদ্ধ করতে সমর্থ হলেন না। ক্ষত্রিয় ধর্ম ও নিজের অভিমানের কথা চিন্তা করে পলায়নের উপায় থাকলেও দুর্যোধন পর্বতের ন্যায় স্থির থাকলেন।

তারপর দুর্যোধন ও ঘটোৎকচের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। ঘটোৎকচের ভয়ানক গর্জন শুনে ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বললেন, এই

রাক্ষসের মুখ হতে নির্গত যেরূপ ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা যাচ্ছে, তাতে অনুমান করা যায় যে, ঘটোৎকচ তুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

নৈব শক্যো হি সংগ্রামে হেতুং ভূতেন কেনচিৎ। (ভীঃ) ৯২ ২০
—একে কোন প্রাণীই সমরে জয় করতে পারবে না।

অতএব আপনি সে স্থানে গমন করুন এবং রাজা তুর্যোধনকে রক্ষা করুন। মনে হচ্ছে তুর্যোধন বিশালকায় রাক্ষসের আক্রমণের মধ্যে পড়েছে। সুতরাং আপনার ও আমাদের সকলের সর্বোত্তম কাজ হল তুর্যোধনকে রক্ষা করা।

ভীষ্মের উপরোক্ত উক্তি হতে ঘটোৎকচের পরাক্রম উপলব্ধি করতে কারও কষ্ট হয় না।

ভীষ্মের কথা শুনে সব মহারথীরা অত্যন্ত তীব্রবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, যে স্থানে তুর্যোধন ছিলেন। এই সব মহারথীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে সেই সৈন্যবাহিনী তখন অজেয় হয়ে উঠল।

অতঃপর ঘটোৎকচ ও তুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। ঘটোৎকচ বহু কৌরব মহারথীকে যুদ্ধে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করল, রাজকুমার বৃহদ্বলকে নিহত করল।

ঘটোৎকচের পরাক্রম দেখে কৌরব সৈন্যরা ভয়ে যুদ্ধে বিরত হল। এবং সে তুর্যোধনকে হত্যা করবার জন্য তার দিকে ধাবিত হল। তখন কৌরব মহারথীরা সকলে মিলে চারদিক হতে ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হল। তাঁদের বাণের আঘাতে ঘটোৎকচ আহত হয়ে আকাশে উড়তে লাগল ও গর্জন করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচের সেই গর্জন শুনে ভীমকে বললেন, ঘটোৎকচ নিশ্চয় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তার নিনাদে এটাই মনে হচ্ছে। ঘটোৎকচের উপর অত্যন্ত গুরুভার পড়ছে মনে হচ্ছে। ঐ দিকে পিতামহ ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাঞ্চালদের বধ করতে উদ্যত

হয়েছেন। তাদের রক্ষার জন্য অর্জুন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তুমি 'হিড়িম্বা' নন্দনকে রক্ষা কর।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সিংহনাদ করে শত্রুপক্ষকে আতঙ্কিত করে ঘটোৎকচের সাহায্যে গেলেন। ভীমের পশ্চাতে পশ্চাতে সত্যধৃতি, রণদুর্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, অভিমন্যু প্রভৃতি যোদ্ধারা দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র, বীর ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্মা, অনুপদেশের রাজা নীল, যাদের নিজেদের শক্তির উপর আস্থা আছে এমন বীররা বিশাল রথ সৈন্যের সঙ্গে হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন। তাঁদের সকলের আগমনের সময় যে কোলাহল হল, তা শুনে এবং ভীমের ভয়ে কৌরব সৈন্যদের মন আতঙ্কিত হল। উভয় পক্ষে নানা অস্ত্র বিনিময়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রায় সকলেই যুদ্ধ হতে বিমুখ হল।

নিজের অধিকাংশ সৈন্যকে নিহত হতে দেখে স্বয়ং রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে ভীমকে আক্রমণ করতে গেলেন। দুর্যোধন ভীমের বুকে গভীর আঘাত করলেন। এতে ভীম ব্যথিত হলেন। ভীমকে এইরূপ ব্যথিত হতে দেখে ঘটোৎকচ খুবই ক্রুদ্ধ হল। সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব মহারথীরাও তীব্রবেগে দুর্যোধনকে আহ্বান করতে করতে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। এই যোদ্ধাদের সবেগে আসতে দেখে দ্রোণাচার্য তাঁর মহারথীদের বললেন, বীরগণ, শীঘ্র যাও। রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তাঁর কথা শুনে ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যোদ্ধারা পাণ্ডব সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। এদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। অপর দিকে অশ্বত্থামার সঙ্গে রাজা নীলের ভয়ানক যুদ্ধ চলে, যুদ্ধে রাজা নীলকে আহত হয়ে অচৈতন্য হতে দেখে নিজ জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং অশ্বত্থামার দিকে দ্রুত ধাবিত হল। অন্যান্য রাক্ষসরাও তাকে অনুসরণ করল।

ঘটোৎকচকে দ্রুত আসতে দেখে অশ্বত্থামাও অতি দ্রুত তার

দিকে ধাবিত হল। তিনি ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের নিহত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামার আঘাতে আহত হয়ে রাক্ষসদের পলায়ন করতে দেখে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হল। তারপর সেই মায়াবী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অশ্বত্থামাকে মোহিত করতে করতে অত্যন্ত দারুণ ও ভয়ঙ্কর মায়া সৃষ্টি করল। তখন সেই মায়ায় ভীত হয়ে কৌরব যোদ্ধারা যুদ্ধ হতে বিমুখ হয়ে পড়ল। দুর্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামাকেও দেখলেন যে তাঁরা সকলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভূতলশায়ী হয়েছেন এবং রক্তাপ্লুত হয়ে এক দানবীয় অবস্থা সৃষ্টি করে ছটফট করছেন। কৌরবদের পক্ষে যে সমস্ত মহাধনুর্ধর ও বীর রথী ছিলেন তারা প্রায় সকলেই বিধ্বংসিত হয়েছেন। সব রাজা নিহত হয়েছেন এবং সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

এই সমস্ত দেখে কৌরব সৈন্যরা শিবির অভিমুখে ফিরে চললো। সেই সময় সঞ্জয় ও ভীষ্ম চীৎকার করে বললেন—বীরগণ, যুদ্ধ কর পলায়ন কর না। রণভূমিতে তোমরা যা কিছু দেখছ, সেই সমস্তই ঘটোৎকচ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত রাক্ষসী মায়া। কিন্তু সেই সময় তারা বিশেষভাবে মোহিত হয়ে পড়ায় ভীষ্মের আহ্বান ব্যর্থ হল। তারা এরূপ ভীত হয়ে পড়েছিল যে তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে পারল না। তাঁদের পালাতে দেখে জয়লাভ করে পাণ্ডবরা ঘটোৎকচের সঙ্গে সিংহনাদ কবতে লাগল। চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য সব তীব্র স্বরে বাজতে লাগল। এইভাবে সূর্যাস্তের সময় উগ্রাকর্মা ঘটোৎকচ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কৌরব সৈন্যবাহিনী চারিদিকে পলায়ন করল। এইভাবে পঞ্চম দিনেও পাণ্ডবরা জয়টিকা পরে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যুদ্ধের অষ্টম দিনেও কাশীদাসী মহাভারতে বলা হয়েছে—

ঘটোৎকচ অলম্বুষ যুদ্ধেতে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল॥ (ভীঃ)

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্যু ও জয়দ্রথ বধের পর দ্রোণের প্রচণ্ড বিক্রমে উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠিরকে দেখে ঘটোৎকচ বলছে—

রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বা-নন্দন
সত্বরে আসিল বীর দেখিতে ভীষণ ॥
... ...
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর ॥
মোরে অবজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত ॥ (ভীঃ)

ঘটোৎকচের কথা শুনে উল্লসিত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন ব্যূহ ভেদ করে কুরুসেনাদের বধ কর।

মহাধনুর্ধর বীর ভীমের নন্দন ॥
ঘটোৎকচ বলিল দেখহ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণ-সেনাপতি ॥
এত বলি মহাবীর গদা লয়ে করে।
শীঘ্র গতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে ॥ (ভীঃ)

অশ্বত্থামা সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবার বধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাত্যকিকে দেখে তাঁকে বধ করবার জন্য তাঁর উপর আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামাকে শিনি পুত্র সাত্যকির রথের দিকে যেতে দেখে ঘটোৎকচ তাঁকে বাধা দিল।

ঘটোৎকচ যে বিশাল রথের উপর চড়ে এসেছিল, তা কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত ও ভয়ঙ্করদর্শী। তার উপরে বরাহের চর্ম আবৃত ছিল। তার মধ্যভাগ লম্বা-চওড়া ছিল। এর মধ্যে যন্ত্র ও কবচ রক্ষিত ছিল। চলবার সময় এই রথে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ হয়ে থাকে। এতে হাতীর ন্যায় বিশাল দেহবিশিষ্ট বাহন যোজিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে সব বাহন হাতীও নয় এবং অশ্বও নয়। এই রথের ধ্বজদণ্ড অত্যন্ত উঁচু ছিল। এতে পদ ও পক্ষ বিক্ষিপ্ত করে চক্ষু

বিস্তার করে এক শকুনি কূজন করছিল এবং এই শকুনির দ্বারা এই রথ শোভা পাচ্ছিল। এর পতাকা রক্তে আর্দ্র ছিল ও এই রথকে অন্ত্রের (নাড়ীর) মালা দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল।

এই রকম আটটি চক্রবিশিষ্ট বিশাল রথে চড়ে ঘটোৎকচ ভয়ঙ্কর রূপধারী এক অক্ষৌহিনী রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত ছিল। এই সমস্ত সৈন্য নিজ হাতে শূল, মুদ্গর, পর্বত শিখর ও বৃক্ষ বহন করে চলছিল। প্রলয়কালে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় বিশাল বাহু উত্তোলিত করে ঘটোৎকচকে আসতে দেখে সমস্ত রাজারা ব্যথিত হলেন।

ঘটোৎকচের চেহারা পর্বতশিখরের ন্যায় বিশাল হওয়ায় সকলের মনে ভয় সঞ্চার করত। এর মুখ ভীষণ হলেও দাঁতের জন্য আরও বিকট লাগত। এর কর্ণদ্বয় ছিল শঙ্কুর (পেরেক) ন্যায়। হনুদেশ অতি বৃহৎ এবং দেশসমূহ সদা রোমাঞ্চ। চক্ষুদ্বয় অতি তীক্ষ্ণ, মুখ অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ছিল। উদরের অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট, গলদেশের দ্বার বৃহৎ গর্ততুল্য, মস্তকের কেশরাশি কিরীটে আচ্ছাদিত এবং তাকে দেখতে মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ যমের মত মনে হত বলেই সকলের ভয়ের কারণ হয়েছিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে ধনু উর্ধ্বে তুলে আসতে দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন মনে হচ্ছিল, বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়ে গঙ্গার ঘূর্ণিজল কূল ছাপিয়ে উঠছে।

অতঃপর রাক্ষসরা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্রস্তর বর্ষণ করল, লৌহ নির্মিত চক্র, ভূশুণ্ডী, প্রাস, তোমর, শূল, শতঘ্নী ইত্যাদি অস্ত্র অবিরাম গতিতে পড়ছিল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখে নৃপতিরা ও কুরুপুত্ররা এবং কর্ণ সকলেই ভীত হয়ে চারদিকে পলায়ন করতে থাকে।

একমাত্র অশ্বত্থামাই আঘাত পেলেন না এবং তিনি ঘটোৎকচের মায়াকে বাণ দ্বারা নষ্ট করে দিলেন। মায়া নষ্ট হলে ঘটোৎকচ

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। এই সমস্ত বাণই অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে দশটি বাণ ঘটোৎকচকে ফিরে মারলেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বা পিতার সাহায্যে অশ্বত্থামাকে আঘাত করতে থাকে। এ দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে অশ্বত্থামা অঞ্জনপর্বাকে নিহত করেন।

পুত্রশোকে কাতর হয়ে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে বলল, হে দ্রোণপুত্র, দাঁড়াও, আজ তুমি আমার হাত হতে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন, আমিও তেমনি আজ তোমাকে বিনাশ করব। অশ্বত্থামা উত্তরে বললেন, দেবতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র, তুমি যাও অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর। হিড়িম্বাকুমার, পিতাকে বাধা দেওয়া পুত্রের উচিত না। (ন হি পুত্রেণ হৈড়িম্বে পিতা ন্যায্যঃ প্রবাধিতুম্।) তোমার প্রতি আমার এখন কোন ক্রোধ নেই। কিন্তু তোমার জেনে রাখা উচিত ক্রুদ্ধ হলে মানুষ নিজেকেই বিনাশ করে। উত্তরে ঘটোৎকচ বলল,

কিমহং কাতরো দ্রৌণে পৃথগ্জন ইবাহবে॥
যস্মাং ভীষয়সে বাগ্ভিরসাদেতদ্ বচস্তব।
ভীমাৎ খলু সমুৎপন্নঃ কুরূণাং বিপুলে কুলে॥
পাণ্ডবানমহং পুত্রঃ সমবেষ্বনিবর্তিনাম্।
রাক্ষসামধিরাজোঽহং দশগ্রীবসমো বলে॥

(দ্রোঃ) ১৫৬।৯৬ ৯৮

—আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধে কাতর যে তুমি আমাকে নিজের কথার দ্বারা ভয় দেখাচ্ছ? তোমার এই বাক্য নীচতাপূর্ণ। দেখ, আমি কৌরবদের বিশাল কুলে ভীম হতে জন্মগ্রহণ করেছি। যুদ্ধ হতে যাঁরা কখনও নিবৃত্ত হন না, সেই পাণ্ডবদের আমি পুত্র। রাক্ষসদের রাজা এবং দশানন রাবণের ন্যায় বলবান।

উপরের উক্তিতে ঘটোৎকচের পিতৃবংশ ও নিজের পরাক্রম সম্বন্ধে যে অহঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে, তা যথার্থই তার উপযুক্ত।

এইভাবে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার দিকে ধাবিত হলো যেন কোন এক সিংহ এক গজরাজের উপর আক্রমণ করছে। (ক্রুদ্ধো গজেন্দ্রমিব কেসরী।) ঘটোৎকচের সৃষ্ট মায়া অশ্বত্থামা নষ্ট করতে লাগলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের সামনেই অশ্বত্থামা প্রজ্জ্বলিত বাণের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই ঘটোৎকচের বাণ ভস্মীভূত করে দিলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামার উপর দেবগণ কর্ত্তৃক নির্মিত, অষ্ট ঘণ্টা-যুক্ত এক মহাভয়ঙ্কর অশনি নিক্ষেপ করল অশ্বত্থামা তা দেখেই নিজের রথের উপর তাঁর ধনু রেখে লাফ দিয়ে সেই অশনি ধরে ফেললেন এবং ঘটোৎকচের রথের উপর তা নিক্ষেপ করলেন। তখন ঘটোৎকচ সেই রথ হতে লাফ দিয়ে পড়ল। অত্যন্ত দেদীপ্যমান সেই অশনি (বজ্র) অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সহ ঘটোৎকচের রথকে ভস্ম করে পৃথিবীকে ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করল। সেই সময় ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ করে ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল ধনু হাতে নিয়ে অশ্বত্থামার বক্ষে বাণ নিক্ষেপ করল। ধৃষ্টদ্যুম্নও বহু বাণ নিক্ষেপ করলেন। অশ্বত্থামাও এঁদের উপর সহস্র সহস্র নারাচ নিক্ষেপ করলেন।

তখন এক হাজার রথ, তিনশ হাতী ও ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সঙ্গে ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। সেই সময় অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে একাকীই যুদ্ধ করছিলেন।

এইভাবে সেই দিনের যুদ্ধে অশ্বত্থামা, ঘটোৎকচের পুত্র, এক অক্ষৌহিনী রাক্ষসসৈন্য ও দ্রুপদ-পুত্রদের সংহার করলে পাণ্ডব সৈন্যদের পরাজয় হয়।

অতঃপর আর একদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সাত্যকি বীর ভূরিকে নিহত করলে অশ্বত্থামা তীব্রবেগে সাত্যকির দিকে ধাবিত হলেন।

ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথ আক্রমণ করতে দেখে ঘটোৎকচ সিংহনাদ করে বলল, দ্রোণপুত্র, দাঁড়াও। আমার নিকট হতে তুমি জীবন নিয়ে যেতে পারবে না। কার্তিকেয় যেমন মহিষাসুরকে বধ করে থাকে আমিও তোমাকে সেইভাবে বিনাশ করব ঘটোৎকচ ও অশ্বত্থামার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ যুদ্ধস্থলে কালাগ্নি তুল্য তেজস্বী দশটি বাণে অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করল। তিনি ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অশ্বত্থামার এইরূপ অবস্থা দেখে কুরু-সেনাদল অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে মনে করে শোকাভিভূত হলো। কিন্তু বীর অশ্বত্থামা কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে বাম হাত দিয়ে ধনু নত করে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে তা দ্বারা ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করে একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই আঘাতে ঘটোৎকচ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সারথি দ্রুত তাকে রণক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে নিল। সেদিনের যুদ্ধে ভীমের সঙ্গেও দুর্যোধনের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং দুর্যোধন পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

রাক্ষস অলায়ুধের সঙ্গে যখন ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ভীমকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে সেই স্থানে পাঠিয়ে দিলেন, এবং বললেন যুদ্ধক্ষেত্রে এই রাক্ষস অলায়ুধ সমস্ত সৈন্যদের ও তোমার সামনে ভীমকে কাবু করে ফেলছে, অতএব তুমি কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রথমে অলায়ুধকে বধ কর। পরে কর্ণকে সংহার কর।

অতঃপর ঘটোৎকচ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ছেড়ে বক রাক্ষসের ভ্রাতা রাক্ষসরাজ অলায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। সেই রাত্রে রাক্ষসরাজ অলায়ুধের সঙ্গে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের দারুণ যুদ্ধ হতে লাগল। ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের যুদ্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছিল ত্রেতা যুগে বানররাজ বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে যুদ্ধ। পরস্পরের উপর পরস্পর তরবারি ও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। এই দুই রাক্ষস

পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করল। অতঃপর ঘটোৎকচ সেই রাক্ষস অলায়ুধকে ধরে ফেলে ঘুরাতে ঘুরাতে সবলে দূরে নিক্ষেপ করল। তারপর তার বিশাল মস্তক ঘটোৎকচ কেটে ফেলল। এইভাবে ঘটোৎকচ বকাসুরের বিশাল দেহী ভ্রাতা অলায়ুধকে নিহত করল। এবং তার ছিন্ন মস্তক দুর্যোধনের সামনে নিক্ষেপ করল।

অলায়ুধের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা উৎফুল্ল হলেন, অন্যদিকে কৌরব সৈন্যদের সঙ্গে দুর্যোধনও খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। অলায়ুধের ভ্রাতা বকাসুরকে ভীম নিহত করেছিল। তাই অলায়ুধ স্বেচ্ছায় দুর্যোধনের নিকট এসে বলেছিল আমি যুদ্ধে ভীমকে বধ করব। অলায়ুধের প্রস্তাবে দুর্যোধন মনে করেছিলেন অলায়ুধ ভীমকে হত্যা করতে পারবে এবং তার ভ্রাতারা তবে দীর্ঘায়ু হবে। কিন্তু ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিহত করায় দুর্যোধন মনে করলেন ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে অর্থাৎ কৌরব ভ্রাতাদের ভীম বধ করবে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কোন বাধা রইল না।

অতঃপর ঘটোৎকচ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। উভয়ের মধ্যে বিচিত্র ও তুমুল যুদ্ধ আকাশে রাহু ও সূর্যের উন্মত্ত সংগ্রামের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল। নানা অস্ত্র প্রয়োগে এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। যখন কর্ণ ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারলেন না, তখন তিনি এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহার করলেন। সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ঘটোৎকচের রথকে, অশ্বদের ও সারথি সহ নষ্ট করে দিলেন। রথহীন হয়ে ঘটোৎকচ শীঘ্র সেখান হতে অদৃশ্য হলেন। তখন কর্ণ বাণ দ্বারা সমস্ত দিঙমণ্ডল আচ্ছাদিত করে ফেললেন। যদিও সেই সময় এই সব বাণ দ্বারা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হল, কিন্তু কোন প্রাণী নিহত হল না। অতঃপর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ঘোর, দারুণ ও ভয়ঙ্কর মায়ার সৃষ্টি করল। প্রথমে এই মায়া রক্তবর্ণের মেঘের রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর ভয়ঙ্কর অগ্নি মালার ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তারপর তা থেকে

বিদ্যুৎ স্ফূরণ হতে লাগল এবং প্রজ্বলিত উল্কা উদ্ভূত হতে লাগল। সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র দুন্দুভি বাদ্যের ধ্বনির ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধ্বনিও হতে লাগল। এইরূপ ভাবে মায়ার দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্র পতিত হতে লাগল। কর্ণ নিজ বাণ দ্বারা তা নষ্ট করতে পারলেন না।

ঘটোৎকচের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে দুর্যোধনের সৈন্যরা হতাহত হয়ে রণ বিমুখ হতে দেখা গেল। ঘটোৎকচের এই ভয়ানক যুদ্ধ দেখে দুর্যোধন ভীত হলেন। শিবাদের চীৎকার ও রাক্ষসদের গর্জনে কুরু যোদ্ধারা ভীত ও ব্যথিত হল। ঘটোৎকচের এই সংগ্রাম দেখে মনে হল কৌরব বীরদের সংহারকারী এই ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করবার জন্যই সাক্ষাৎ কাল কর্তৃক যেন প্রেরিত হয়েছিল। কৌরব সৈন্যরা উৎসাহ হীন ও আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করতে করতে পলায়ন করতে লাগল। অতঃপর ঘটোৎকচ একটি শতঘ্নী নিক্ষেপ করে। এর দ্বারা কর্ণের চারটি অশ্ব বিনষ্ট হল।

তখন কর্ণ অশ্বহীন রথ হতে নেমে পড়ে একাগ্র চিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময় কৌরব সৈন্যরা পলায়নপর; তাঁর দিব্যাস্ত্রগুলি ঘটোৎকচের মাথায় নষ্ট হচ্ছিল। তখন কৌরব যোদ্ধারা কর্ণকে ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার করে ঘটোৎকচকে বধ করতে পরামর্শ দেন। নতুবা কৌরব সৈন্যরা ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা সকলেই ঘটোৎকচের দ্বারা নিহত হবে।

নিশীথ রজনীতে রাক্ষসের প্রহারে নিহত ও আহত সৈন্যদের দেখে অবশেষে কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শক্তি প্রয়োগ করবেন স্থির করলেন।

যে অস্ত্র কর্ণ তাঁর হস্তের দুইটি কুণ্ডলের পরিবর্তে ইন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, যে অস্ত্র তিনি বহু বর্ষধার অর্জুনকে বধ করবার জন্য সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন, অবশেষে সেই শক্তি তিনি

রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপর প্রয়োগ করলেন। সেই শক্তিকে কর্ণের হস্তে দেখে ভীত ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশালাকারে পরিণত করল, কর্ণের হস্তে সেই শক্তিকে দেখে আকাশের প্রাণীরাও কোলাহল করতে লাগল, ঘটোৎকচের সব মায়াকে ভস্মীভূত করে তার বক্ষঃস্থলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে তা নক্ষত্র মণ্ডলে বিলীন হল।

মৃত্যুর সময়ও ঘটোৎকচ এক বিচিত্র ও আশ্চর্য কাজ করে গেল। নিজের দেহকে বিশাল পর্বতের ন্যায় স্ফীত করে একটি প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডের ন্যায় পৃথিবীতে পড়ল। ঘটোৎকচের শরীরের চাপে দুর্যোধনের এক ভাগ সৈন্য বিনষ্ট হল।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা যখন শোকাভিভূত তখন কৃষ্ণ আনন্দে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণকে এই সময় আনন্দ করতে দেখে অর্জুন অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ঘটোৎকচের মৃত্যুতে আমরা যখন শোকাভিভূত, তখন আপনি এত হর্ষ প্রকাশ করছেন কেন? ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডব সৈন্যরা রণ বিমুখ হয়ে পলায়ন করছে। পাণ্ডবরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনার এই আনন্দের নিশ্চয় কোন কারণ আছে, যদি তা গোপনীয় না হয়, তবে আপনি তা প্রকাশ করুন।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। এর কারণ তুমি শোন। ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কর্ণ ঘটোৎকচের উপর প্রয়োগ করায় তুমি কর্ণকে শীঘ্রই নিহত করতে পারবে। তুমি বিপদ্‌মুক্ত হলে। নতুবা ঐ শক্তি অস্ত্র কর্ণ তোমার উপরই নিক্ষেপ করার জন্য সযত্নে রেখে দিয়েছিল।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে কৌরব সৈন্যরা হৃষ্ট চিত্তে পাণ্ডব সৈন্যদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে নিহত করে। তখন গভীর রজনীতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভীমকে বললেন, তুমি দুর্যোধনের সৈন্যদের প্রতিরোধ কর। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে আমার মন অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। তিনি বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে

করতে নিজের রথে উপবেশন করলেন। সেই সময় তাঁর চোখ অশ্রু পূর্ণ। তিনি কর্ণের পরাক্রম দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ছিলেন। তাঁকে ব্যথিত দেখে কৃষ্ণ বললেন—

মা ব্যথাং কুরু কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ॥ (দ্রোঃ) ১৮৩।২৪

—দুঃখ করবেন না. আপনার এই ব্যাকুলতা শোভনীয় নয়।

আপনি উঠুন এবং যুদ্ধ করুন। এই মহাসমরের গুরুতর ভার বহন করুন। আপনি যদি ব্যাকুল হয়ে পড়েন, তবে যুদ্ধে জয়লাভ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হবে।

কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির দুই হাতে চোখ মুছে বললেন—

বিদিতা মে মহাবাহো ধর্মাণাং পরমা গতিঃ ॥
ব্রহ্মহত্যা ফলং তস্য যৈঃ কৃতং নাববুধ্যতে।
অস্মাকং হি বনস্থানাং হৈড়িম্বেন মহাত্মনা ॥
বালেনাপি সতা তেন কৃতং সাহ্যং জনার্দন। (দ্রোঃ)
১৮৩।২৮-২৯

—ধর্মের পরম গতি আমার জানা আছে। যে মানুষ উপকারীর উপকার স্মরণ করে না, সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম হত্যার পাপ ভাগী হয়ে থাকে। জনার্দন, যখন আমরা বনে বাস করছিলাম সেই সময় মহাত্মা হিড়িম্বাকুমার বালক হলেও আমাদের অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

যুধিষ্ঠিরের এই অকৃত্রিম শোককে কোন কোন সমালোচক খুবই বক্র দৃষ্টিতে দেখে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু ঘটোৎকচের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ উপকার অনস্বীকার্য।

যুধিষ্ঠির পূর্ব স্মৃতিচারণ করে ঘটোৎকচ কি ভাবে তাঁর সেবাব্রতী ছিল, তা কৃষ্ণকে বলতে গিয়ে বললেন, অর্জুন অস্ত্র প্রাপ্তির জন্য যখন দেবলোকে গিয়েছিল, তা জেনে ঘটোৎকচ কাম্যকবনে আমার কাছে এসেছিল এবং যত দিন অর্জুন ফিরে আসেনি, ততদিন সে আমার সঙ্গেই বাস করেছিল। গন্ধমাদন যাত্রার সময় সে আমাদের

গুরুতর সঙ্কট হতে রক্ষা করেছিল। দ্রৌপদী যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন এই মহাকায় বীর নিজ পীঠে করে তাঁকে বহন করেছিল। যুদ্ধের আরম্ভের সময়ই সে আমাদের অনেক সহায়তা করেছে। এই মহাযুদ্ধে সে আমার জন্য অনেক দুঃসাধ্য কাজ করেছে।

স্বভাবাদ্ যা চ মে প্রীতিঃ সহদেবে জনার্দন।
সৈব মে পরমা প্রীতী রাক্ষসেন্দ্রে ঘটোৎকচে॥

(দ্রো:) ১৮৩।৩৩

—জনার্দন, সহদেবের উপর আমার যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে, ঘটোৎকচের প্রতিও আমার তেমনি স্নেহই রয়েছে

সে আমার ভক্ত ছিল, সে আমার প্রিয় ছিল এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। সেইজন্য তার শোকে সন্তপ্ত হয়ে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। বৃষ্ণিনন্দন, দেখুন কৌরবরা কিভাবে আমার সৈন্য বিতাড়িত করছে এবং মহারথী দ্রোণ কর্ণ কিরূপ যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে। যেমন দুইটি [illegible] হস্তী বিশাল নলবনকে মর্দন করে। তেমনি এই অর্ধ [illegible] সৈন্য পাণ্ডবদের মর্দিত করছে। ভীমের বাহুবল ও অর্জুনের [illegible] অস্ত্রবলকে উপেক্ষা করে কৌরব যোদ্ধারা নিজ নিজ শক্তি [illegible] করছে। এই দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধন ঘটোৎকচকে বধ করে অত্যন্ত হর্ষের সঙ্গে সিংহনাদ করছে।

কথং অস্মাসু জীবৎসু ত্বয়ি চৈব জনার্দন।
হৈড়িম্বিঃ প্রাপ্তবান্ মৃত্যুং সূতপুত্রেণ সঙ্গতঃ॥
কদর্থীকৃত্য নঃ সর্বান পশ্যতঃ সব্যসাচিনঃ।
নিহতো রাক্ষসঃ কৃষ্ণ ভৈমসেনিমহাবলঃ॥

(দ্রো:) ১৮৩।৩৯-৪০

—জনার্দন, আমরা এবং আপনি জীবিত থাকতে থাকতেই হিড়িম্বাকুমার সূতপুত্র কর্ণের সঙ্গে সংগ্রাম করে কি ভাবে মৃত্যু বরণ করল? হে কৃষ্ণ, আমাদের সকলকেই অবশ করে সব্যসাচী অর্জুনের

সাক্ষাতেই ভীমসেন কুমার মহাবল রাক্ষস (ঘটোৎকচকে) কর্ণ নিহত করেছে।

ধৃতরাষ্ট্রের দুরাত্মা পুত্ররা যখন যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করেছিল, সেই সময় অর্জুন সেখানে ছিল না। দুরাত্মা জয়দ্রথ আমাদের সকলকেই ব্যূহের বাইরে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে অভিমন্যু বধে পুত্রসহ দ্রোণাচার্যই কারণ হয়েছিল (নিমিত্তমভবদ্ দ্রোণঃ সপুত্রস্তত্র কর্মণি)

গুরু দ্রোণাচার্য স্বয়ং কর্ণকে অভিমন্যু বধের উপায় বলে দিয়েছিলেন এবং যখন সে তরবারি তুলে যুদ্ধ করছিল, সেই সময় তিনিই সেই তরবারিকে দুই খণ্ডে কেটে দিয়েছিলেন। এইভাবে যখন সে সঙ্কটে পড়েছিল, তখন কৃতবর্মা ক্রূর মানুষের মত হঠাৎ তার অশ্বদের ও দুই পার্শ্ব রক্ষককে বধ করেছিল।

তথেতরে মহেষ্বাসাঃ সৌভদ্রং যুধ্যপাতয়ন্।
অল্পে চ কারণে কৃষ্ণ হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ (দ্রোঃ) ১৮৭।৪৫

—এইভাবে যুদ্ধে অন্যান্য মহাধনুর্ধর যোদ্ধাগণ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে নিপাতিত করেছিল। কৃষ্ণ, অভিমন্যু বধে জয়দ্রথের অল্পই দোষ ছিল। তথাপি গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাকে বিনাশ করেছে।

এইরূপ কাজে আমার মত ছিল না। যদি শত্রুদের বধ করাই পাণ্ডবদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তবে রণাঙ্গনে সর্বপ্রথমে কর্ণ ও দ্রোণাচার্যকেই বধ করা উচিত। এই কর্ণ ও দ্রোণই আমাদের সব দুঃখের মূল কারণ। দুর্যোধন এঁদের উপর নির্ভর করেই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে। আমার মতে অতি অবশ্যই সূতপুত্র কর্ণকে দমন করা উচিত। অতএব আমি নিজেই কর্ণকে বধ করবার ইচ্ছায় রণস্থলে যাচ্ছি। ভীম দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই বলে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওনা হলেন।

অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ হতেই বোঝা যায় ঘটোৎকচ রাক্ষস-তনয় হলেও, পাণ্ডবদের অভিমন্যুর ন্যায়ই সমান স্নেহের পাত্র। বরং বিপদে আপদে ঘটোৎকচ অভিমন্যু অপেক্ষা পাণ্ডবদের অধিক সাহায্য করেছিল। পাণ্ডব সৈন্যরাও ঘটোৎকচের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়েছে। শুধু তাই নয় ঘটোৎকচ আত্মবলি দিয়ে অর্জুনের জীবন রক্ষা করেছিল।

যুধিষ্ঠিরকে শোকাভিভূত হতে দেখে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, এটা আনন্দের কথা যে কর্ণ সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের শক্তিকে নিমিত্ত করে কালই তাকে বিনাশ করিয়েছে। নতুবা ঐ শক্তি-অস্ত্র দ্বারা কর্ণ অর্জুনকে নিহত করতো। তোমার হিতের জন্য সেই রাক্ষস ঘটোৎকচ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। যুধিষ্ঠির তুমি কারও প্রতি ক্রোধ কর না এবং মনকে শোকাক্রান্ত কর না। এই জগতে সমস্ত প্রাণীরই অন্তে এই গতিই হয়ে থাকে। (প্রাণিনামিহ সর্বেষামেষা নিষ্ঠা যুধিষ্ঠির।) তুমি সমরক্ষেত্রে গিয়ে তোমার ভ্রাতাদের ও নৃপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আজ হতে পঞ্চম দিবসে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার হবে। তুমি সর্বদাই ধর্মের কথা চিন্তা কর এবং দয়া, তপস্যা, দান, ক্ষমা ও সত্যাদি সদ্‌গুণ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে পালন কর। কারণ—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। (দ্রোঃ) ১৮৩।৬৭

—যে পক্ষে ধর্ম বিদ্যমান থাকে, সেই পক্ষেই জয়লাভ হয়ে থাকে, বলে ব্যাসদেব অন্তর্হিত হলেন।

ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ চরিত্রের মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য সকলেই সমভাবে কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, সকলেই সমান বীর এবং এই ত্রয়ী বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন। এই ত্রয়ীর মৃত্যুতে কেবলমাত্র তাঁদের আত্মীয় বন্ধুরা নন, স্বপক্ষীয় সকলেই শোকে অভিভূত হয়েছিল।

লব কুশ ও বভ্রুবাহন

প্রবাদ আছে—Like father, like son. এই প্রবাদটি রামার্জুনের উত্তর পুরুষ যথাক্রমে লব কুশ ও বভ্রুবাহনের প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য। বীর পিতার যোগ্য বীর সন্তান তাঁরা। শৌর্যে, বীর্যে পরাক্রমে কোন অংশে তাঁরা বীরাগ্রগণ্য পিতাদের থেকে ন্যূন নন।

জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রবল পরাক্রমশালী পিতাদেরও তাঁরা যুদ্ধে পরাস্ত করে আত্মগৌরব তথা বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

রামায়ণে রাম-সীতার পুত্রদ্বয় লবকুশ ও মহাভারতে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার তনয় বভ্রুবাহন। এই দুই মহাকাব্যের এই বীর বালক ত্রয় আপন আপন পিতার পরিচয় পাওয়ার আগে বিধির বিধানে উভয় ক্ষেত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটক করে যুদ্ধ সাজে আপন আপন পিতার সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সেই যুদ্ধে সন্তানদের হাতে পিতৃদ্বয় (রাম ও অর্জুন) পরাভব স্বীকার করেছেন। কি বিচিত্র সাদৃশ্য!

বেদব্যাসের মহাভারতে ও মূল রামায়ণে এই আখ্যায়িকার উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও কাশীদাসী মহাভারতে পিতাপুত্রের এই যুদ্ধের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

প্রজারঞ্জনের জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রাম গর্ভবতী সীতাকে নির্বাসন দেন। বাল্মীকি মুনির আশ্রয়ে থেকে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করেন। মুনি সযত্নে এই যমজ সন্তানকে পিতার উপযুক্ত সন্তান রূপে গড়ে তুলেছিলেন। অস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় তাঁরা সমান পারদর্শী হয়েছিলেন।

শত্রুঘ্ন যখন লবণ রাক্ষস বধ করতে যান, পথিমধ্যে বাল্মীকি আশ্রমে তিনি অতিথি হন। তখন সীতার যমজ সন্তান প্রসবের কথা তিনি শুনতে পান।

বাল্মীকি মুনি বারশত শিষ্যসহ চিত্রকূট যাত্রার পূর্বে লব কুশকে তপোবন রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। দুই ভাই ধনুর্বাণ হাতে খেলা করে বেড়াতেন। একদিন দুই ভাই দেখলেন একটি অশ্ব আশ্রমে প্রবেশ করল, অশ্ব দেখে দুই ভাইয়ের মহানন্দ। অশ্বের কপালে একটি হেমপত্রে রাজা দশরথ রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের এই অশ্ব দুই অক্ষৌহিনী সৈন্যসহ শত্রুঘ্ন রক্ষা করছিলেন। অশ্বটি নিয়ে লবকুশ খেলতে থাকেন।

লবকুশ অশ্ব বেঁধেছেন দেখে শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন—

............ঘোড়া বান্ধে কোন জন ॥
কোন বেটা করিয়াছে মরণের সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ ॥ (উঃ)

বালক লবকুশ শত্রুঘ্নর কথা শুনে হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন :—

কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে ॥ (উঃ)

শত্রুঘ্ন রামের ও নিজের পরিচয় গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করলেন। রামের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।—

শত্রুঘ্নর বড়াই শুনে লবকুশ তর্জন করে বললেন—

চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও আমি তাই চাই ॥
মরিবারে কেন এলে আমার নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে ॥ (উঃ)

উপরোক্ত ভাবে উত্তর দিয়ে দুই ভাই নানা অস্ত্রে শত্রুঘ্নকে জর্জরিত করে তুললেন। শত্রুঘ্ন ও সৈন্যদের কুশ একলাই যুদ্ধে কাতর করলেন। সমস্ত সৈন্য কুশ নিহত করলেন। রণকৌশলে এই দুই বালক যোদ্ধার নিকট শত্রুঘ্ন বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিলেন :—

তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥
... ...

তোমায় আমায় এই হইল যে রণ ॥
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর। (উঃ)

উত্তরে সহাস্যে কুশ জবাব দিলেন—অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে।

মহাপাশ শরাঘাতে শত্রুঘ্ন নিহত হলেন। শত্রুঘ্নকে পরাজিত করে দুই ভাই সানন্দে মার কাছে গিয়ে জানালেন দুই প্রহর পর্যন্ত দুই ভাই তপোবনে যত ভূপতি এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন।

শত্রুঘ্নর পরাজয়ের সংবাদ রামকে জানানো হলো। শত্রুঘ্নর মৃত্যু সংবাদে রাম কাতর হয়ে পড়লেন। ভরত লক্ষ্মণ তাঁকে প্রবোধ দিলেন। রামের প্রশ্নোত্তরে দূত জানায় দুই ঋষি কুমার যমরাজের মত যুদ্ধ করেছে।

ভরত লক্ষ্মণ বললেন—

আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুই ভাই ॥ (উঃ)

লবণ রাক্ষস হত্যাকারী শত্রুঘ্নর জন্য রাম শোকে অভিভূত হলেন। তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে সাবধানে যুদ্ধ করে ঐ শিশু দ্বয়কে ধরে আনবার আদেশ দিলেন।

শত্রুঘ্নকে বাল্মীকি আশ্রমে মৃত দেখে লক্ষ্মণ ও ভরত কাঁদতে থাকেন। সৈন্যদের মধ্যেও কোলাহল উঠলো তা শুনে

সীতা বলিলেন লব কুশরে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ। (উঃ)

জননীর প্রশ্ন শুনে ভ্রাতৃদ্বয় জননীকে আশ্বস্ত করে বললেন—মৃগয়া করতে নানা দেশের রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসেন, তাই কোলাহল। মুনির আদেশে লব কুশ তপোবন রক্ষা করছেন, আশ্রম

নষ্ট হলে মুনি রুষ্ট হবেন। এই ভাবে মাকে প্রবোধ দিয়ে দুই ভাই পুনরায় যুদ্ধ করতে গেলেন।

যুদ্ধের কথা শুনলে পুত্রদের জন্য জননী চিন্তান্বিত হবেন এবং যুদ্ধের অনুমতি দেবেন না, তাই বালকদ্বয় মার কাছে সরল ভাবে সত্য গোপন করলেন।

রামের পুত্রদের পক্ষে জননীকে এভাবে প্রবঞ্চনা করা সঙ্গত হয়নি। কবি এখানে লব কুশ চরিত্রকে রাস্তার ভবঘুরে ছোকরার মত দেখিয়েছেন। আশ্রম বালক রামের পুত্রদ্বয়ের চরিত্র আরও অধিকতর বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সত্যপ্রিয় হবে। কিন্তু কবি কৃত্তিবাস লব কুশের মুখ দিয়ে, যেভাবে মাতার নিকট পর পর মিথ্যা ভাষণ করালেন, এতে আশ্রমের পবিত্রতা কলুষিত হয়েছে। বিশেষ করে রাম সীতার সন্তানরা মার শান্তি সোয়াস্তি বিঘ্নের ভয়েও মিথ্যাশ্রয়ী হবে তা কল্পনাতীত।

লব কুশের চেহারার সঙ্গে রামের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে ভরত লক্ষ্মণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—

কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়। (উঃ)

লব কুশ সহাস্যে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—

জাতি কুলে আমার তোমার কি বিচার॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঞি।
তার শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই॥
... ...
দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন কার্যে আসিয়াছে তোমার নিকটে॥ (উঃ)

এখানে বালকদ্বয়ের অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র

অহমিকা নয়, বয়োজ্যেষ্ঠ দুই রাজপুত্রকে যে ভাবে প্রত্যুত্তর দিয়েছে, তাতে তাঁদের মধ্যে আশ্রম-বালক সুলভ বিনয় নম্রতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে লব কুশ ঋষি কুমার নয়, তাঁরা ক্ষত্রিয় রক্তের অধিকারী বলে মনে হয়।

লক্ষ্মণকে উপহাস করে লব বলেছিলেন :—

মারিলে যে ইন্দ্রজিত রাবণ কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণ জিৎ সর্বলোকে কহে॥ (উঃ)

লক্ষ্মণও পাশুপত শরাঘাতে নিহত হলেন। এক এক করে চার অক্ষৌহিনী সৈন্যের মধ্যে মাত্র সাতজন জীবিত। ভরত যুদ্ধের অবস্থা দেখে কুশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন।

কুশ উত্তর দিলেন—

ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ॥ (উঃ)

এখানে আশ্রম বালকের মুখে ক্ষত্রিয় বীরের যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন চেষ্টাকে ধিক্কার বড়ই চিত্তাকর্ষক। বীর পিতার পুত্রের মধ্যেও যে বীরত্ব সুপ্ত রয়েছে তারই এই প্রমাণ।

ভরতের সঙ্গে কুশের বাদানুবাদ হলো। তারপর কুশ ভরতকেও নিহত করলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরকে কোলাকুলি করে জলে যুদ্ধের রক্ত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হাতে মার কাছে গেলেন। সীতা তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন কি কর্মে লব কুশের বিলম্ব হয়েছে।

লব-কুশ বলে মাতো না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ॥ (উঃ)

জননীর সঙ্গে আশ্রমিক বালকদ্বয়ের ছলনা কি সম্ভব? বিশেষ করে সীতার সন্তানেরা এতটা সত্য ভ্রষ্ট হবে—তা অচিন্তনীয়।

কবি এখানে সব কিছু অতি রঞ্জিত করেছেন। কেবল মাত্র জলে কি যুদ্ধের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করা যায়? এতগুলি সৈন্য ও বীর যোদ্ধা রামের তিন ভ্রাতা কি বালক দ্বয়ের দেহের কোন স্থানে বাণ বিদ্ধ করতে পারেননি—যার দ্বারা তাঁদের মাতৃ সমীপে সব ছলনা প্রকাশ হয়ে পড়তো। বস্তুতঃ কবি অনেক অতিশয়োক্তি করেছেন।

সর্বশেষে রাম বহু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। সৈন্যদের কোলাহলে সীতা আতঙ্কিত হয়ে পুত্রদ্বয়কে সাবধান করে বললেন—

অভাগীর পুত্র তোরা নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥ (উঃ)

লবকুশকে দেখে রামের মনে সন্দেহ হল। তাই বললেন—

আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমারি সমান॥
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান।
... ...
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়। (উঃ)

এইখানে বভ্রুবাহনের জীবনের সঙ্গে লব কুশের জীবনে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বভ্রুবাহনের মাতা সন্তানের কাছে পিতৃ পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ হতে জানা যায় লব কুশের মা পুত্রদের কাছে পিতৃ পরিচয় গোপন রেখেছিলেন।

তাই পিতৃ পরিচয় না জানায় উভয় ভ্রাতার মনেও এই প্রথম পিতৃ পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগলো। উভয়ে পরস্পর পরামর্শ করলেন—

আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঞি।
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই॥ (উঃ)

নিজেদের পিতৃ পরিচয় না জানার অজ্ঞতাকে ভ্রাতৃদ্বয় কৌশলে চাপা দিয়ে রামকে বললেন—

এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন প্রয়োজন॥
পুত্র হয়ে পিতৃ সনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মনে॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তে কারণে চাহ বারে বার॥ (উঃ)

অযোধ্যাপতি রামের সঙ্গে দুইটি বালকের এই ধরণের উক্তির দ্বারা যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি কৃত্তিবাস আশ্রম বালকদ্বয়ের মুখে এই ধরণের উদ্ধত উক্তি কেন বার বার দিয়েছেন তা অবোধ্য।

সুগ্রীব, হনুমান সহ রাক্ষসরাও রামের সঙ্গে লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে এসেছিলেন। এই দুই বালকের তীব্র শরাঘাতে কেউ কেউ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করলেন, বাকী প্রাণ হারালেন।

সৈন্যদের এই ভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখে লবকুশ হেসে বলেছিলেন—

যুদ্ধ ভঙ্গ দিলেন তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম করহ সংহতি॥ (উঃ)

রাম উত্তরে জানালেন সকলে চলে গেলেও, তিনি একাই যুদ্ধ করে ভ্রাতৃদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাবেন। তিনি পুনরায় বললেন—

আমারে জিনিতে কে পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
... ...
রাবণ দুর্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে॥ (উঃ)

রামের এই দম্ভ শুনে দুই ভাই হেসে বললেন—

বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয়॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
... ...
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মত জান॥
... ...
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল। (উঃ)

অর্জুনের মত ব্রহ্মশাপে সমরে পুত্রের হাতে অবশেষে রাম প্রাণ হারালেন। বীর পুত্রদ্বয়ের মুখে উপরোক্ত উক্তি হতে ক্ষত্রিয় চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

দুই ভাই যুদ্ধ জয় করে উল্লাসে মাকে জানালেন বহু অক্ষৌহিনী সৈন্য ও চার ভাইকে নিহত করে—

দুর্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে মাগো দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ ॥ (উঃ)

সীতা রামের বস্ত্র দেখে শোকে অভিভূত হয়ে পুত্রদের ভৎ'সনা করে জিজ্ঞেস করলেন পিতৃহত্যা করে কোথায় তাঁকে রেখে এসেছে। তিনি বাইরে এসে দেখেন হনুমান ও জম্বুমানকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সীতা তা দেখে আক্ষেপ করে বলেছেন—

......লব কি করিলি কর্ম।
তোর বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি ধর্ম॥
তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান।
এই হনুমান মোর দিলা প্রাণদান॥
... ...
হনুমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
... ...
পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষ পান করি প্রাণ ত্যজিব এখন॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে!
... .
লব কুশ শীঘ্র এই ঘুচাও বন্ধন।
হনুমান জম্বুবানে করহ মোচন॥ (উঃ)

জননীর ভৎ'সনায় লবকুশ নিজেদের পিতৃ পরিচয় জানতে পারলেন। রামকে সসৈন্য ও ভ্রাতা সহ নিহত করার যে আনন্দে

এতক্ষণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন, সীতার বিলাপে তা যেন ফানুসের মত চুপসে গেল। বীর যোদ্ধা ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে দেখা গেল আত্মগ্লানি। সেই শোকে তাঁরা মার চরণ ধরে বললেন—

ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন॥
তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা॥
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ।
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥ (উঃ

সীতাও অগ্নিতে আত্মহুতি দেবেন সঙ্কল্প করলেন। তিনটি অগ্নিকুণ্ড সাজানো হলো। এমন সময় বাল্মীকি মুনি ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা সীতার মুখে শুনে তাঁকে জানালেন শোকের কারণ নেই। এখনি তিনি সকলকে জীবিত করে দিচ্ছেন। এই তপোবনের কুঞ্জ হতে মৃত্যুঞ্জয়ী জল নিয়ে সবার উপরে ছিটিয়ে দেওয়ার ফলে মৃত সৈন্য সহ চার ভ্রাতা জীবন ফিরিয়ে পেলেন।

রাম প্রাণ ফিরে পেয়ে মুনিকে ঐ বালক দুটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বালক দ্বয়ের কোন পরিচয় পেলেন না।

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু এই রকম কোন আখ্যায়িকা নেই। পরন্তু মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সঙ্গে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে এসেছিলেন। তিনি লবকুশকে বললেন তাঁর রচিত রামায়ণ কাব্য ঋষিদের আবাসে ব্রাহ্মণদের গৃহে, রাজপথে, অভ্যাগত নৃপতিদের প্রাসাদে, রামের রাজভবনের দ্বারে, যজ্ঞস্থানে গাইতে। যদি রাম তাঁদের গান শুনবার জন্য আহ্বান করেন, তবে তাঁরা বাল্মীকির শিষ্য এই পরিচয় যেন দেন। রাম ধর্মতঃ সকলের পিতা। তাই তাঁকেও সম্মান করতে উপদেশ দিলেন।

লবকুশ প্রভাতে স্নান ও হোম সমাপনান্তে বাল্মীকির নির্দেশ অনুযায়ী নানাস্থানে রামায়ণ গেয়ে চললেন। রাম বালকদ্বয়ের মুখে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত বীণা ধ্বনির সঙ্গে এই অপূর্ব গীত শুনবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সমীপে গায়কদ্বয়কে আনালেন।

লবকুশ প্রথম থেকে বিংশতি সর্গ পর্যন্ত গাইলেন। রাম তাঁর ভ্রাতাদের নির্দেশ দিলেন, এই বালকদ্বয়কে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং তারা আর যা চায়, তাও দান করতে। কিন্তু লবকুশ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তাঁরা ফলমূল ভোজী বনবাসী, ধনে তাঁদের প্রয়োজন নেই।

এই কথা শুনে সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হলেন। রাম ঐ কাব্য কত বড়, কোন্ মুনি ঐ কাব্যের রচয়িতা, তিনি কোথায় থাকেন ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে লবকুশ জানান, ঐ কাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি। তিনি এই যজ্ঞে উপস্থিত আছেন। এই কাব্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক। এক শত উপাখ্যান, আদি কাণ্ড থেকে ছয় কাণ্ডে পঞ্চশত সর্গ এবং তাছাড়াও উত্তর কাণ্ড আছে। আপনার জীবনের সমস্ত কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

রাম লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে স্থির নিশ্চিত হলেন যে লবকুশ সীতারই সন্তান। রামের ইচ্ছায় বাল্মীকির নির্দেশে সীতা যজ্ঞে সর্ব সমক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দিতে উদ্যত হয়ে ধরিত্রী বসুমতীকে আহ্বান করে তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন।

সীতার পাতাল প্রবেশে রাম শোকাভিভূত হলে ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে এসে তাঁকে জানালেন তিনি বিষ্ণু অবতার। স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হবে।

দেবগণ চলে গেলে রাম বাল্মীকিকে বললেন কাল থেকে উত্তর কাণ্ড আরম্ভ করুন। এই পুণ্যাত্মা ঋষিগণ আমার ভবিষ্যৎ

চরিত শুনবেন। পরদিন প্রভাতে রামের আদেশে লবকুশ ঋষিগণের সমীপে উত্তর কাণ্ড গাইলেন।

রামের মহাপ্রস্থানের পূর্বে রাম ভরতকে অযোধ্যার রাজ্যে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন স্থির করেন। কিন্তু উত্তরে ভরত জানালেন রামকে ছেড়ে তিনি স্বর্গ ভোগ বা রাজ্য চান না। রাম কুশকে দক্ষিণ কোশল ও লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

এইখানেই বাল্মীকি রামায়ণে লবকুশ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লবকুশ সম্বন্ধে অন্যরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে।

বাল্মীকি মুনির সঙ্গে এই দুই বালক রামের সমীপে এসে মুনির অনুরোধে তাঁরই রচিত রামায়ণ গান করতে সুরু করেন।

দীর্ঘ এক মাস ধরে এই গান শোনার পর রাম তাঁদের পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—

কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন ॥ (উঃ)

ভ্রাতৃদ্বয় ছলনা করে পিতার সামনে নিজেদের পরিচয় দিলেন :—

না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ॥ (উঃ)

এ কথা শুনে রাম সন্তানদের নিজের কোলে টেনে নিয়ে আনন্দে চোখের জল ফেললেন। উপরোক্ত উত্তর দানের মধ্যে বালকদ্বয়ের প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সীতার পাতাল প্রবেশের পর লবকুশকে শেষ বারের মত কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায়। মাতৃশোকে বিহ্বল ভ্রাতৃদ্বয় ভূলুণ্ঠিত হয়ে বিলাপ করেছেন—

কোথা গেল জননী গো জনক দুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে ॥
তোমা বিনা মাতা গো অন্যকে নাহি জানি ॥

তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন পানি ॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্লভ গুণ সে গুণ তোমায় ॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কেহ কহিতে পারে ॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলে হেন পুত্র মাতা কারে দিয়া ॥

... ...

যার মাতা আছে তার সফল শরীর ॥
আজি হৈতে অনাথ হইলাম দুই জন।

... ...

পাইয়া নিস্তার দুঃখে গেলে মা পাতাল।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাওয়ালে ॥ (উঃ)

উপরোক্ত বিলাপে মাতৃ বৎসল সন্তানদের ব্যথাতুর হৃদয়ের অভিব্যক্তি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে দেবর্ষি নারদের উপদেশ ক্রমে ভবিষ্যতে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য পাণ্ডবরা নিয়ম করেছিলেন যে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যখন যাঁর স্ত্রীরূপে বাস করবেন, তখন তিনি ব্যতীত অপর কোন ভাই দ্রৌপদীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলে তাঁকে বার বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে বনবাস করতে হবে। এক শরণাগতকে রক্ষা করতে গিয়ে অর্জুন ঐ পূর্ব বিধান লঙ্ঘন করতে বাধ্য হলেন। ফলে বার বছর তাঁর বনবাস ব্রত গ্রহণ করতে হলো।

সেই সময় বেড়াতে বেড়াতে অর্জুন মণিপুর রাজ্যে আসেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। চিত্রবাহনের নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়ে তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা করলেন।

চিত্রবাহন বললেন চিত্রাঙ্গদাই তাঁর একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতে চিত্রাঙ্গদার সন্তানই মাতামহের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাতামহের পারলৌকিক কাজ করবে. এই সর্তে অর্জুন যদি সম্মত হন, তবে তিনি সানন্দে তাঁকে কন্যা দান করবেন অর্জুন সম্মত হলেন।

চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হয়। অর্জুন তিন বছর মণিপুর রাজ্যে বসবাস করেছিলেন এবং অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার এক পুত্র সন্তান জন্মেছিল। তার নাম বভ্রুবাহন।

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুনের মণিপুরে পুনরাগমনের কোন কাহিনী কোথাও পাওয়া যায় না।

কাশীদাসী মহাভারতে দেখা যায় যে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের রক্ষক হয়ে অর্জুন মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করলেন। পুত্র বভ্রুবাহন তখন ঐ দেশের রাজা। অশ্বমেধ যজ্ঞের কপালে পিতৃ পরিচয় পেয়ে বভ্রুবাহন আনন্দিত হয়ে মাকে বললেন।

যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥
অর্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে ॥
... ...
তুমি বল মোর পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আসে তিনি দৈবের ঘটন ॥
জন্মদাতা সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তাঁর করিনু নিশ্চয় ॥
না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ মাতা তুমি ॥ (অঃ)

চিত্রাঙ্গদা উপদেশ দিলেন নানা উপঢৌকন পিতৃ চরণে রেখে পরে আত্ম পরিচয় দিতে। মাতার এ উপদেশ পুত্রের মনঃপুত হলো না। বীর পুত্র বভ্রুবাহন উত্তরে বললেন—

শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে শুন মাতা তুমি।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি ॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে। (অঃ)

বীর ক্ষত্রিয় পুত্র যুদ্ধে আপন বিক্রম প্রদর্শন করে পিতার উপযুক্ত সন্তান বলে আত্ম পরিচয় দিতে চাইলেন। কিন্তু স্নেহময়ী জননী প্রিয়তম পতির বিরুদ্ধে বীর পুত্রের অসি ধারণ সমর্থন করলেন না। তাই তিনি বললেন—

পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে।
সুপুত্র সে জন যে পিতার বাক্য ধরে ॥
তুমি চাহ তাত সঙ্গে করিবারে রণ।
কি মতে এ সব লাজ ধরিবে জীবন ॥ (অঃ)

অনিচ্ছায় বীর যোদ্ধা বভ্রুবাহন পিতার সমীপে নানা রত্ন রেখে বললেন—

তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদার গর্ভেতে মম জন্ম হয়॥
... ...
করিলে গন্ধর্ব সূতা বিবাহ তখন॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে। (অঃ)

অর্জুন বভ্রুবাহনকে পদাঘাতে অপমানিত করে বললেন কাকে সে পিতা বলছে? গন্ধর্ব দুহিতা নটী চিত্রাঙ্গদার ছেলে তুই কার পুত্র?

বভ্রুবাহন উত্তরে জানালেন অর্জুনই তাঁর পিতা। হংসধ্বজ ও নীলধ্বজ রায় বভ্রুবাহনের উক্তি যে সত্য তা সমর্থন করে বললেন, অন্যের পিতাকে পিতা বলা লজ্জাজনক।

উত্তরে অর্জুন স্পর্ধার সঙ্গে বললেন, সুভদ্রার গর্ভে তাঁর তনয় অভিমন্যু বীর ছিলেন। চক্রব্যূহ ভেদ করে সপ্ত রথীর সঙ্গে একা যুদ্ধ করে স্বর্গে গেছেন মহাবীরের মত। সেই পুত্রই তাঁর কুলের ভূষণ। এই বভ্রুবাহন নটীর ছেলে প্রথমে গর্ব করে ঘোড়া ধরে, পরে যুদ্ধে ভয় পেয়ে আমাকে পিতা বলে পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করছে। যদি তাঁর ঔরসে কোন সন্তান জন্মাত, তবে যুদ্ধ ব্যতীত সে কখনও ঘোড়া প্রত্যর্পণ করতে চাইত না।

কাতর হইল নহে আমার নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পন॥
কাতর হইল নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুর জিনয়ে বীজ বলে সর্বজন॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্বলোকে জানে। (অঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতে মণিপুরপতি বভ্রুবাহনকে এইভাবে আসতে দেখে বুদ্ধিমান অর্জুন ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা স্মরণ করে তাঁকে সমাদর দেখালেন না। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

প্রক্রিয়েয়ং ন তে যুক্তা বহিস্ত্বং ক্ষত্রধর্মতঃ॥
সংরক্ষ্যমাণং তুরগং যৌধিষ্ঠিরমুপাগতম্।
যজ্ঞিয়ং বিষয়ান্তে মাং নাযোৎসীঃ কিং নু পুত্রক॥

(আশ্ব) ৭৯।৩-৪

—এ কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। মনে হচ্ছে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছ। আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্বকে রক্ষা করতে করতে তোমার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করেছি। তবে তুমি কেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ না?

ধিক্ ত্বামস্তু সুদুর্বুদ্ধিং ক্ষত্রধর্মবহিষ্কৃতম্।
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সাম্নৈব প্রত্যগৃহ্লথাঃ॥

(আশ্ব) ৭৯।৫

—ক্ষত্রিয় ধর্মের অবমাননাকারী দুর্বুদ্ধি আমাকে ধিক্। যেহেতু যুদ্ধার্থে আমি উপস্থিত হয়েছি, যুদ্ধ না করে তুমি আমাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে অভ্যর্থনা করছ।

তুমি এ জগতে জীবিত থেকেও কোন পুরুষের কাজ করনি। যেহেতু যুদ্ধের জন্য এখানে উপস্থিত আমাকে তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় সামনীতির দ্বারা সমাদর করছ। নরাধম, তুমি অতিশয় দুর্মতি। যদি আমি অস্ত্র রেখে শূন্য হস্তে তোমার নিকট আসতাম, তাহলে তোমার এরূপ কাজ উচিত হতো।

কাশীদাসী মহাভারতে মাতৃনিন্দায় ও আত্মঅবমাননায় বভ্রুবাহন ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে সমানভাবে সঠিক প্রত্যুত্তর দিলেন—

আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।

... ...

জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে।

... ...

আমার মাতাকে নটী বলিলে আপনি।
কোন কর্ম কৈল কুন্তী তোমার জননী॥
কুমারী কালেতে কর্ণে করিল প্রসব।
না জানিয়া নিজ কথা করহ গৌরব॥
কাহার ঔরসে জন্ম বাপ বল কারে।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ পিতা বিদিত সংসারে॥

... ...

এ কথা কহিতে তব মুখে নাহি লাজ॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমারে দেখিয়া।
জননীর বাক্যে অশ্ব দিলাম আনিয়া॥
সে কারণে অপমান করিলে আমারে।
আমি নিজ পরাক্রম দেখাব তোমারে॥ (অঃ)

বভ্রুবাহনের উপরোক্ত উক্তিতে বীরত্বের ও গৌরবের ছাপ পাওয়া যায়। পিতাকে তাঁদের অদ্ভুত জন্ম কাহিনী শোনাতে তিনি ইতঃস্তত করলেন না। এখানে বভ্রুবাহনের পৌরুষের এক সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

যুদ্ধের খবর পেয়ে জননী চিত্রাঙ্গদা ছুটে এসে প্রশ্ন করলেন—

কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন॥ (অঃ)

বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ, পিতার তাঁকে পদাঘাত, মাকে নটী বলে অপমান ইত্যাদি সবই আনুপূর্বিক ঘটনা বিশদভাবে জানালেন।

বভ্রুবাহনের মনে পিতার এই উক্তি—

হলে মম সুত, না করে এমত,
ত্রিভুবনে আমি খ্যাত।

অঙ্কুরেতে বীজ, হয় সরসিজ,
কহিল পাণ্ডবনাথ ॥
... ...
আশ্বাসি আমারে যাও তুমি ঘরে,
জানাব আপন বল।
ধন্য লব কুশ, রাখিল পৌরুষ,
জিনি ভকত বৎসল।
... ...
অর্জুন নিন্দিল তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে, রহিব কেমনে,
সবাই নিন্দিবে আমা ॥ (অঃ)

অর্জুনের মত মহাবীর, যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের নিহত করেছেন, তাঁর সঙ্গে বালক পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে সম্মতি দিতে সন্তান বৎসল জননীর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

কিন্তু লাঞ্ছিত, অপমানিত, ক্ষুব্ধ বীর সন্তান বভ্রুবাহন মার অনুরোধেও কিছুতেই নীরবে সর্ব সমক্ষে পিতৃদত্ত অপমানের প্রত্যুত্তর না দিয়ে শান্তি পাচ্ছিল না। বীরের যোগ্য সন্তান বভ্রুবাহন।

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বভ্রুবাহন প্রতিদ্বন্দ্বী পিতাকে সম্বোধন করে বললেন :—

আপন জন্মের কথা মনে করিলে।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলে ॥
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥
... ...
শুনেছি প্রতিষ্ঠা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥

কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার।
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণেতে আমার ॥ (অঃ)

অর্জুন পুনরায় ভর্ৎসনা করে বভ্রুবাহনকে বললেন—

অহঙ্কার না করিহ বেশ্যার তনয় ॥ (অঃ)

অর্জুনের মত সম্ভ্রান্ত কুলজাত বীরের মুখে নিজের স্ত্রীকে 'বেশ্যা' এ অপবাদ বড়ই শ্রবণ কটু। অর্জুনের নিজের সন্তানকে 'বেশ্যা তনয়' বলাটা রুচি সঙ্গত নয়।

এ কথা শুনে বীর সন্তান পিতাকে বাণেতে জর্জরিত করে দিলেন। সন্তানের বীরত্ব দেখে অর্জুন নিজের জীবন সম্বন্ধে প্রমাদ গুণে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুকে সম্বোধন করে বললেন—

হস্তিনা নগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
... ...
তোমা বিনা বংশে আর নাহিক সন্তান।
তুমি জীনে পিতৃলোকে জল পিণ্ড স্থান ॥ (অঃ)

বৃষকেতু পিতৃব্যের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসলে বভ্রুবাহন তাঁকে বলেছিলেন—

বুঝিনু মরিবারে তুমি আমার সমরে।
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে ॥

বভ্রুবাহনের হাতে বৃষকেতু নিহত হন। অর্জুনকে বৃষকেতুর শোকে বিলাপ করতে দেখে বভ্রুবাহন পিতাকে উপহাস করে বললেন—

ক্ষত্রের এ ধর্ম নহে শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবে তুমি আপন সংশয় ॥
... ...
ক্রন্দন উচিত নহে সমর ভিতরে ॥
... ...

গত জীবে শোক যুক্ত না শোভে তোমাকে ॥
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।

... ...

চিন্তহ গোবিন্দ পদে ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয় ॥ (অঃ)

গঙ্গার অভিশাপে বভ্রুবাহনের হাতে গাঙ্গেয় অস্ত্রে অর্জুনের শির দ্বিখণ্ডিত হলো। পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে বীর পুত্র মাতৃ নিন্দার প্রতিশোধ নিয়ে সহাস্যে তাঁর জয়ের সংবাদ ও পিতার মৃত্যু সংবাদ মাতাকে জানালেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুন যখন নিজের পুত্র বভ্রুবাহনকে শ্লেষের সঙ্গে অপমান করছিলেন, তখন বভ্রুবাহন অধোবদনে রইলেন। সেই সময় নাগ কন্যা উলূকী অর্জুনের কথা শুনে তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে এবং পুত্রের প্রতি তাঁর (অর্জুনের) অন্যায় তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ভেদ করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। বভ্রুবাহনকে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণা দিলেন এবং যুদ্ধের দ্বারাই পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন জানালেন।

বিমাতার প্রেরণায় মহাতেজস্বী রাজা বভ্রুবাহন মনে মনে যুদ্ধ করার জন্য স্থির করলেন। সুবর্ণময় কবচ বন্ধন করে শিরস্ত্রাণ ধারণ করে তেজস্বী বভ্রুবাহন শত শত তূণীর পরিপূর্ণ উত্তম রথে আরোহণ করলেন।

সেই রথে সর্ব প্রকার যুদ্ধ সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, মনের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্ব যোজিত ছিল। চক্র ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যও প্রস্তুত ছিল এবং স্বর্ণের ভাণ্ড তাঁর শোভা বর্ধন করছিল। সেই রথ সুবর্ণ নির্মিত ছিল। তার উপর সিংহের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়ছিল। ঐ রথে আরোহণ করে রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের সম্মুখীন হবার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি অনুচরদের সঙ্গে গিয়ে

যজ্ঞের অশ্ব হরণ করলেন। অর্জুন এতে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন। পিতা পুত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল।

বভ্রুবাহন নিজের বীর পিতাকে বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত ও শাণিত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে অনেকবার পীড়িত করলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করছিলেন। এই দুজনের যুদ্ধ তখন দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

বভ্রুবাহন হাসতে হাসতে অর্জুনের স্কন্ধের এক পার্শ্ব ভাগে একটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন।

সোঽভ্যগাৎ সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ।
বিনির্ভিদ্য চ কৌন্তেয়ং প্রবিবেশ মহীতলম্॥

(অঃ) ৭৯।২২

—যেমন সর্প বল্মীক ঢিপি মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সেই বাণ অর্জুনের দেহে পক্ষ সহ প্রবেশ করল এবং তা ভেদ করে ভূতলে প্রবেশ করল।

এতে অর্জুন তীব্র বেদনা অনুভব করলেন। অর্জুন নিজের ধনুক অবলম্বন করে দিব্য তেজে সমাবিষ্ট হয়ে মৃতবৎ হলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে মহাতেজস্বী অর্জুন নিজের পুত্রের প্রশংসা করতে করতে বললেন—

সাধু সাধু মহাবাহো বৎস চিত্রাঙ্গদাত্মজ।
সদৃশং কর্ম তে দৃষ্টা প্রীতিমানস্মি পুত্রক॥

(অঃ) ৭৯।২৫

—মহাবাহু চিত্রাঙ্গদা কুমার, তোমায় সাধুবাদ। বৎস, তুমি ধন্য। তোমার যোগ্য পরাক্রম দেখে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি।

পুত্র, এখন আমি তোমার উপর বাণ নিক্ষেপ করছি। তুমি সাবধানে থেকে যুদ্ধে স্থির ভাবে অবস্থান কর। এই কথা বলে অর্জুন বভ্রুবাহনের উপর নারাচ বর্ষণ করতে লাগলেন।

কিন্তু রাজা বভ্রুবাহন গাণ্ডীব ধনু হতে নিক্ষিপ্ত সেই সব নারাচকে নিজের ভল্ল সমূহের দ্বারা দুই তিন খণ্ডে খণ্ডিত করে ফেললেন। তখন অর্জুন হাসতে হাসতে ক্ষুর নামক দিব্য বাণ সমূহের দ্বারা বভ্রুবাহনের রথের ধ্বজ ছেদন করলেন। সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত বেগগামী বিশাল দেহ অশ্বগণের প্রাণ হরণ করলেন। তখন অশ্ব হতে অবতরণ করে রাজা বভ্রুবাহন ক্রুদ্ধ হয়ে পাদচারী অবস্থায় পিতা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন পুত্রের পরাক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রকে অধিক পীড়িত করলেন না। বভ্রুবাহন পিতাকে যুদ্ধ হতে বিরত মনে করে বিষধর সর্প তুল্য বিষাক্ত বাণের দ্বারা তাঁকে পুনরায় পীড়িত করতে লাগলেন। তারপর বভ্রুবাহন সুন্দর পক্ষযুক্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পিতার বক্ষ সবলে বিদ্ধ করলেন। এই বাণাঘাতে অর্জুন মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। কুরুবংশের ভারবহনকারী অর্জুন ধরাশায়ী হলে, চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বভ্রুবাহন যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রম করে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও অর্জুনের বাণের দ্বারা পূর্ব হতেই অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। সুতরাং পিতাকে নিহত দেখে তিনিও অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনের নাগ পত্নী উলূপীর পরামর্শে পাতাল হতে মণি এনে অর্জুনের প্রাণ ফিরিয়ে আনবার পরামর্শে বভ্রুবাহন বললেন—

……মণি সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব॥
পিতৃহত্যা পাপ মোর হইল যখন।
একে মাতামহ হত্যা হবে তে কারণ॥ (অঃ)

পাতালে গিয়ে নাগেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বভ্রুবাহন মণি এনে দেখলেন অর্জুনের ও বৃষকেতুর মাথা কে নিয়ে গেছে।

স্বামীর মৃত্যুতে সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর বিলাপ করতে থাকলে পরস্পর পরস্পরকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। উলূপীর পরামর্শে মণি এনেও পিতার মুণ্ডহীন দেহ দেখে বভ্রুবাহন অধোমুখে বিলাপ করে বলেছেন—

পিতৃহত্যা কৈনু আমি হইয়া সন্ততি ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মঘাতী হ'ব আমি শুন মাতা তুমি ॥
বীর বংশে হইলাম হীন কুলাঙ্গার।
... ...
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার ॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা লয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননি ॥ (অঃ)

কুন্তী স্বপ্নে বৃষকেতু ও অর্জুনের নিধন দেখে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। কৃষ্ণ মণিপুরে আসলেন। বভ্রুবাহন আত্মহত্যা করতে চাইলেন, কৃষ্ণ তাঁকে বিরত করে বললেন—

.........মুণ্ড লইল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥
অর্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক। (অঃ)

যে দুই নাগ মস্তক দুটি চুরি করেছিল। তাদের মস্তক খসে পড়ল। অনন্ত নিজে বৃষকেতু ও অর্জুনের মস্তক দুটি নিয়ে এল— উভয়ের স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া লেগে গেল।

কৃষ্ণ বভ্রুবাহনের বীরত্বের জন্য তাঁর প্রশংসা করে বললেন—

ক্ষত্রধর্ম আচরিলে নাহি ধর্মভয় ॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ চিতে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম সম্মুখে-যুদ্ধেতে ॥ (অঃ)

উপরোক্ত উক্তি হতে বভ্রুবাহন যে সত্যিকারের ক্ষত্রিয় সন্তান তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদব্যাসের মহাভারতে পতিকে নিহত এবং পুত্রকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখে চিত্রাঙ্গদা অত্যন্ত ভীত চিত্তে রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। এবং পতি বিয়োগ দুঃখে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিতা হলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে চিত্রাঙ্গদা নাগকন্যা উলূপীকে সম্মুখে দেখে বললেন, উলূপী, দেখ, যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বামী ভূতলে শুয়ে আছেন। তোমারই প্রেরণায় আমার পুত্র সমর বিজয়া এই বীরকে বধ করেছে। ভগ্নি, তুমি আর্য ধর্ম জান এবং পতিব্রতা, তথাপি তোমারই জন্য তোমার পতি বর্তমানে নিহত হয়ে রণভূমিতে পতিত আছেন। কিন্তু এই অর্জুন যদি তোমার নিকট সর্ব প্রকার অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তুমি আজ তাঁকে ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করছি। তুমি ধনঞ্জয়কে জীবিত করে দাও। (ক্ষমস্ব যাচ্যমানা বৈ জীবয়স্ব ধনঞ্জয়ম্)। তুমি ধর্মাজ্ঞা ও ত্রিভুবনে বিখ্যাত। তথাপি আজ পুত্রের দ্বারা পিতাকে হত্যা করিয়ে তুমি শোক বা অনুতাপ করছ না। এর কারণ কি? আমার পুত্রও নিহত হয়েছে। তথাপি তার জন্য আমার শোক হচ্ছে না। আমি কেবল পতির জন্যই শোক করছি। আমার এই রাজ্যে এই ভাবে তাঁর আতিথ্য সৎকার করা হয়েছে। এই কথা বলে চিত্রাঙ্গদা পতির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে এই ভাবে বিলাপ করে বললেন—

কুরুরাজের প্রিয়তম ও আমার প্রাণ প্রিয়, তুমি উঠ। মহাবাহো আমি তোমার অশ্ব মুক্ত করে দিয়েছি। প্রভু তোমাকে তো মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যেতে হবে, তবে কেন ভূতলে শয়ন করে রয়েছ? আমার ও কৌরবগণের প্রাণ তোমারই অধীন। তুমি অন্য ব্যক্তিদের প্রাণদাতা, তবে তুমি কি করে নিজের প্রাণ ত্যাগ করলে?

উলূপীকে তিনি বললেন, স্বামী নিহত হয়ে ভূতলে পতিত আছেন। তুমি তাকে ভাল ভাবে দেখো। তুমি এই পুত্রকে

উত্তেজিত করে তাকে দিয়ে স্বামী হত্যা করিয়ে কেন শোক করছ না? আমার এই বালক চিরকালের জন্য মৃত্যুর মুখে পতিত হোক, কিন্তু নিদ্রাজয়ী, জয়শীল ও অরুণ নয়ন এই অর্জুন অবশ্যই জীবিত হোন—ইহাই উত্তম।

নাপরাধোঽস্তি সুভগে নরাণাং বহুভার্যতা।
প্রমদানাং ভবত্যেষ মা তেঽভূদ বুদ্ধিরীদৃশী॥

(অশ্ব) ৮০।১৪

—সৌভাগ্যবতি, কোনও পুরুষের বহু স্ত্রীর সঙ্গে যদি সম্বন্ধ থাকে তবে তার পক্ষে তা অপরাধ বা দোষ হয় না। কিন্তু স্ত্রীরা এরকম করে (অর্থাৎ বহু পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে) তবে তাদের পক্ষে অবশ্যই দোষ বা পাপ হয়ে থাকে। অতএব তোমার বুদ্ধি যেন এরূপ না হয়।

তুমিই পুত্রের দ্বারা যুদ্ধে এই পতিকে হত্যা করিয়েছ। এই সব করে আজ যদি তুমি পুনরায় তাঁকে জীবিত না কর, তাহলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

দেবি, আমি পতি ও পুত্র এই উভয় হতেই বঞ্চিতা হয়ে দুঃখে নিমজ্জিতা হয়েছি। আমি তোমার সাক্ষাতেই আমরণ উপবাস করব। এতে কোনও সংশয় নেই। এই কথা বলে চিত্রাঙ্গদা উপবাসের সঙ্কল্প করে নীরব রইলেন। পতির চরণ যুগল ধারণ করে দীন ভাবে উপবেশন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পুত্রের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর বভ্রুবাহন পুনরায় সংজ্ঞালাভ করে জননীকে রণভূমিতে উপবিষ্টা দেখে বিলাপ করে বললেন—

হায়, যিনি আজ পর্যন্ত কেবল সুখেই পালিতা হয়েছেন সেই আমার মাতা চিত্রাঙ্গদা এখন মৃত্যুর অধীন হয়ে ভূতলে পতিত নিজের বীর পতির সঙ্গে মৃত্যু বরণের জন্য উপবেশন করছেন। এরূ

চেয়ে আর অধিক দুঃখ কি হতে পারে? (ইতো দুঃখতরং কিং নু যন্মে মাতা সুখৈধিতা)

নিহন্তারং রণেঽরীণাং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ময়া বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্মরং বত॥

(অশ্ব) ৮০।২২

—যুদ্ধে যাকে বধ করা অন্যের পক্ষে নিতান্ত কঠিন কর্ম, যিনি যুদ্ধে শত্রুদের বিনাশ করেন এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীরবৃন্দদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আমার পিতা অর্জুন আজ আমারই হাতে নিহত হয়েছেন।

যাঁর বক্ষ বিস্তৃত ও বাহুদ্বয় বিশাল, সেই পতিকে নিহত দেখেও আমার এই মাতা চিত্রাঙ্গদা দেবীর হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না, এতে আমি মনে করি, বিনাশকাল উপস্থিত না হলে কোনও মানুষের পক্ষেই মৃত্যু বরণ করা দুঃসাধ্য। যে জন্য এই সঙ্কট কালেও আমার মাতার প্রাণ বাহির হচ্ছে না। হায়, হায় আমায় ধিক, মানবরা এই দেখ, পুত্র আমার দ্বারা নিহত কুরু বীর অর্জুনের স্বর্ণ নির্মিত কবচ এই ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে পতিত আছে।

হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা দেখুন, পুত্র আমার দ্বারা নিহত হয়ে ভূপতিত বীর অর্জুন বীর শয্যায় শয়ন করে রয়েছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অশ্বের পশ্চাতে গমনকারী যে সব ব্রাহ্মণ শান্তি কর্ম করবার জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁরা এর জন্য কি শান্তিকর্ম করছেন যে, ইনি রণভূমিতে আমার দ্বারা নিহত হলেন?

ব্যাদিশন্তু চ কিং বিপ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তমিহাদ্য মে।
সুনৃশংসস্য পাপস্য পিতৃহন্তু রণাজিরে॥

(অশ্বঃ) ৮০।২৮

—ব্রাহ্মণগণ, আমি অত্যন্ত নৃশংস, পাপী ও রণাঙ্গনে পিতৃ হত্যাকারী উপদেশ করুন, আমার পক্ষে এমন কি প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য?

পিতৃহত্যা করে আমার পক্ষে দ্বাদশ বর্ষ ব্রত পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পিতৃঘাতী ক্রূর আমার পক্ষে এটাই প্রায়শ্চিত্ত যে, আমি এঁরই চর্মে নিজের দেহ আচ্ছাদিত করে থাকব এবং পিতার মস্তকের দুই দিকের দুই অংশ ধারণ করে বার বৎসর ধরে বিচরণ করব। পিতাকে বধ করে এখন আর অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই।

উলূপীকে সম্বোধন করে বভ্রুবাহন বললেন, নাগরাজকুমারি। দেখুন আমি যুদ্ধে আপনার স্বামীকে বধ করেছি। আজ রণাঙ্গনে এইভাবে অর্জুনকে বধ করে আমি আপনার প্রিয় কাজই করেছি বোধ হয়।

কিন্তু এখন আমি আর এই দেহ ধারণ করে থাকতে পারব না। আজ আমিও সেই পথে গমন করব, যে পথে আমার পিতা গমন করেছেন।

মা, আমি ও গাণ্ডীবধারী অর্জুন নিহত হলে পর আপনি প্রসন্ন হোন। আমি সত্যের শপথ করে বলছি যে পিতা ব্যতীত আমি জীবন ধারণ করব না।

অতঃপর দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে রাজা বভ্রুবাহন আচমন করে জগতের সমস্ত চরাচর প্রাণীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আজ আমার কথা শোন। নাগরাজ কুমারী মাতা উলূপী, আপনিও শুনুন। আমি সত্য কথা বলছি যদি আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আর জীবিত হয়ে না উঠেন, তবে আমি রণাঙ্গনে উপবাস করে নিজের দেহকে শুষ্ক করে দেব। পিতৃহত্যা করে আমার আর উদ্ধারের কোন উপায় নেই।

নরকং প্রতিপৎস্যামি ধ্রুবং গুরুবধার্দিতঃ ॥

(অশ্ব) ৮০।৩৭

—গুরু (পিতৃ) বধ করে সেই পাপে পতিত হয়ে নিশ্চয়ই আমি নরকে পতিত হব।

কোনও এক বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করে বিজয়ী বীর শত গোদান করে সেই পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পিতৃ হত্যা করে সেই ভাবে এই পাপ হতে মুক্তি লাভ হবে, এটা আমার পক্ষে সর্বদা দুর্লভ।

এষ একো মহাতেজাঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
পিতা চ মম ধর্মাত্মা তস্য মে নিষ্কৃতিঃ কুতঃ॥ (আশ্ব) ৮০।৩৯

—এই আমার পিতা পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় বীর মহাতেজস্বী ও ধর্মাত্মা। ইহাকে বধ করে আমি মহাপাপ করেছি। এখন আমার উদ্ধার কি ভাবে হবে?

এই কথা বলে বভ্রুবাহন পুনরায় আচমন করে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করে নীরব হয়ে রইলেন।

বভ্রুবাহনের মধ্যে এই যে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরণ অনশনব্রত এর দ্বারা তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে পিতা তাঁকে স্নেহের পরিবর্তে ধিক্কার দিয়েছিলেন সেই পিতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা যথার্থই প্রশংসনীয়।

বভ্রুবাহন যখন জননী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ করবার জন্য উপবেশন করলেন, তখন নাগকন্যা উলূপী সঞ্জীবনী মণিকে স্মরণ করলেন। সেই মণি তাঁর স্মরণ মাত্র সেস্থানে এসে উপস্থিত হল। সেই মণি নিয়ে উলূপী বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করে বললেন, পুত্র বভ্রুবাহন, উঠ, শোক কর না। অর্জুন তোমার দ্বারা পরাজিত হননি। অর্জুন সমস্ত মনুষ্য ও ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবতাদের পক্ষেও অজেয় আজ আমি তোমার যশস্বী পিতা ধনঞ্জয়ের প্রিয় করবার জন্য মোহিনী মায়া প্রদর্শন করেছি। তুমি তাঁর পুত্র। কুরুকুল তিলক অর্জুন সংগ্রামে যুদ্ধ করতে করতে তোমার ন্যায় পুত্রের বল পরাক্রম জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেইজন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেছিলাম। তুমি নিজের মধ্যে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা কর না। (মা পাপমাত্মনঃ পুত্র শঙ্কেথা হ্যণ্বপি

স্থৎপি প্রভো)। ইনি মহাত্মা নব পুরাতন ঋষি, সনাতন ও অবিনাশী। যুদ্ধে ইন্দ্রও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। আমি এই মণি এনেছি। এই মণি সত্ত যুদ্ধে মৃত নাগরাজগণকে জীবিত করে থাকে। তুমি এটা নিয়া তোমার পিতার বক্ষে রাখো। তাহলে তুমি পুনরায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে জীবিত দেখতে পাবে। (সঞ্জীবিতং তদা পার্থং স ত্বং দ্রষ্টাসি পাণ্ডবম্)।

এই কথা উলূপী বললে পর, বভ্রুবাহন নিজের পিতা পার্থের বক্ষে স্নেহ বশতঃ সেই মণি রেখে দিলেন।

তস্মিন্ ন্যস্তে মণৌ বীরো জিষ্ণুরুজ্জীবিতঃ প্রভুঃ।
চিরসুপ্ত ইবোত্তস্থৌ মৃষ্টলোহিতলোচনঃ॥ (অশ্ব) ৮০।৫২

—সেই মণি রাখতেই শক্তিশালী বীর অর্জুন বহুকাল নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের ন্যায় স্বীয় রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় রগড়াতে রগড়াতে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠলেন।

নিজের পিতা অর্জুনকে সচেতন ও সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে বভ্রুবাহন তাঁর চরণে প্রণাম করলেন। অর্জুন জাগ্রত হয়ে উঠলে তাঁর উপর পাকশাসন্ (ইন্দ্র) দিব্য ও পবিত্র পুষ্প সমূহ বর্ষণ করলেন। চতুর্দিক হতে সাধু সাধু ধ্বনি হতে লাগল।

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনও জীবন ফিরিয়ে পেয়ে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে বললেন—

আমার নন্দন তুমি বড় বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
... ...
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রী বভ্রুবাহন। (অঃ)

বভ্রুবাহনের সঙ্গে লবকুশের চরিত্রের এই স্থানে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুন সুস্থ হয়ে উঠে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। কিছু দূরে বভ্রুবাহনের

শোকাকুলা মাতা চিত্রাঙ্গদা উলূপীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন তাঁকে দেখে বভ্রুবাহনকে জিজ্ঞেস করলেন, বীর পুত্র, এই রণাঙ্গন শোক, বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল দেখছি। যদি তুমি এর কারণ জান, তবে তা আমাকে বল, তোমার জননী কি জন্য রণাঙ্গনে এসেছেন? এবং এই নাগরাজকন্যা উলূপীর এ স্থানে আগমনের কারণ কি? আমি জানি তুমি আমার কথায় এই যুদ্ধ করেছ। কিন্তু এ স্থলে রমনীদের আসবার কি কারণ? এটা আমি জানতে চাই।

পিতার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মণিপুরপতি বভ্রুবাহন বললেন, পিতা, এই বৃত্তান্ত আপনি মাতা উলূপীকে জিজ্ঞেস করুন।

অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁকে জানান যে অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীষ্মকে অন্যায় ভাবে বিনাশ করেন। কারণ ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীকে দেখে নিবস্ত্র হন, তখন অর্জুন শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে ভীষ্মকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। এই পাপের শাস্তি, ভোগ না করে যদি অর্জুনের মৃত্যু হোত, তবে তাঁকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত। বসুগণ ও গঙ্গাদেবী সেই পাপের শাস্তি এই ভাবে স্থির করেন যার জন্য অর্জুন পুত্রের নিকট পরাজিত হয়েছেন।

একদিন উলূপী গঙ্গাতীরে গিয়েছিলেন। তখন বসুগণ গঙ্গাতীরে এসে অর্জুন সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন যে শান্তনু নন্দন ভীষ্ম অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ রত ছিল। অর্জুনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেনি, তবু সব্যসাচী তাকে বধ করেছে, এই অপরাধের জন্য আমরা আজ অর্জুনকে শাপান্ত করছি। গঙ্গা দেবী এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। (শাপেন যোজয়ামেতি তথাস্ত্বীতি চ সাব্রবীৎ।) তাঁদের এই কথা শুনে উলূপী ব্যথিত চিত্তে পাতালে প্রবেশ করে তাঁর পিতাকে এ সংবাদ জানালেন, এতে তাঁর পিতা অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বসুদের নিকট গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করে বারংবার অর্জুনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন বসুরা তাঁকে বললেন—

পুত্রস্তস্য মহাভাগ মণিপুরেশ্বরো যুবা ॥
স এনং রণমধ্যস্থঃ শরৈঃ পাতয়িতা ভুবি।
এবং কৃতে স নাগেন্দ্র মুক্তশাপো ভবিষ্যতি ॥

(আশ্ব) ৮১।১৭-১৮

—মণিপুরের মহাভাগ যুবক রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের পুত্র। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বাণের দ্বারা যখন অর্জুনকে ভূপাতিত করবে, তখন অর্জুন আমাদের শাপ হতে মুক্ত হবে।

উলূপীর পিতা এসে তাঁকে এই কথা জানালেন। তা শুনে উলূপী সেই অনুসারে অর্জুনকে শাপমুক্ত করলেন।

উলূপী অর্জুনকে বললেন, দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করতে পারে না। পুত্র তো নিজেরই আত্মা। তাই তুমি তার দ্বারা পরাজিত হয়েছো। (আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাৎ তেনেহাসি পরাজিতঃ।)

উলূপী পুনরায় বললেন, এতে আমার কোনও অপরাধ হয়নি। তুমি কি মনে কর? আমি কি এই যুদ্ধ ঘটিয়ে অপরাধ ঘটিয়েছি। উলূপী এই কথা বললে অর্জুনের চিত্ত প্রসন্ন হল এবং তিনি তাঁকে এই কথা বললেন—

উলূপী যা করেছেন তা তাঁর প্রিয় কাজই করেছেন। তিনি চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে শুনিয়ে শুনিয়ে পুত্র বভ্রুবাহনকে বললেন—

আগামী চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হবে। তাতে তুমি নিজের এই দুই মাতা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে অবশ্যই যাবে।

উত্তরে বভ্রুবাহন বললেন, আপনার আজ্ঞায় আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে অবশ্যই উপস্থিত হব এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন পরিবেশনের কাজ করবো। (অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে দ্বিজাতিপরিবেষকঃ।) অর্জুনকে তাঁর দুই ধর্মপত্নীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করে কিছুদিন তথায় বাস করতে বভ্রুবাহন অনুরোধ করলেন।

অর্জুন জানালেন তিনি দীক্ষা গ্রহণ করে বিশেষ নিয়ম পালন করে বিচরণ করছেন। যতদিন সেই দীক্ষা পূর্ণ না হয়, ততদিন তিনি বভ্রুবাহনের নগরে প্রবেশ করবেন না। তিনি যজ্ঞের অশ্বের অনুসরণ করবেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে বিশ্রাম গ্রহণ সম্ভব নয়।

মণিপুরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে লালিত বভ্রুবাহনের জীবন সরল ও উদার ছিল। অর্জুনকে মণিপুরে কিছুদিন যাপনের নিমন্ত্রণে এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে পিতা তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, সেই পিতার প্রতি এতটা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করা বভ্রুবাহনের মত বীর সুপুত্রের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব।

এখানে অর্জুনের সংযত চরিত্রের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল পর পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আপন কর্তব্য জ্ঞানে তাঁদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে দুটো দিন সুখে বাস করার সুখ হতে নিজেকে বঞ্চিত করলেন।

অতঃপর বভ্রুবাহন অর্জুনকে বিধি অনুসারে পূজা করলেন এবং অর্জুন নিজের দুই পত্নীর অনুমতি নিয়ে সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন।

যথাসময়ে বভ্রুবাহন নিজের মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীকে নিয়ে কুরুদেশে উপস্থিত হলেন। তিনি কুরুবংশের বৃদ্ধদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিধি অনুসারে প্রণাম করেন ও তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে আনন্দচিত্তে পিতামহী কুন্তী দেবীর সুন্দর ভবনে প্রবেশ করলেন।

চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী একসঙ্গে বিনীতভাবে কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে প্রণাম করলেন। সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুকুল রমনীরা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কুন্তী দেবী তাঁর দুই পুত্র বধূকে নানা প্রকার রত্ন উপহার দিয়ে তাঁদের কুরুকুলে বরণ করলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য নারীরা নানা প্রকার উপহারে তাঁদের সম্মানিত করেন।

কুন্তীদেবীর দ্বারা সম্মানিত হয়ে রাজা বভ্রুবাহন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডুপুত্রদের সম্মুখীন হয়ে বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের অভিবাদন জানালেন।

তাঁরা সকলেই বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করলেন এবং যথাবিধি তাঁর সৎকার করলেন। বভ্রুবাহনের উপর প্রসন্ন হয়ে পাণ্ডব মহারথীরা তাঁকে বহু ধন প্রদান করলেন।

অতঃপর বভ্রুবাহন কৃষ্ণকে বিধি অনুসারে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ রাজা বভ্রুবাহনকে একটি বহুমূল্য রথ দিলেন। স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত এই রথটি দিব্য অশ্ব দ্বারা সজ্জিত ছিল। সকলেই এই উত্তম রথের প্রশংসা করছিল।

বভ্রুবাহনও লবকুশের মত মাতৃভক্ত ও বীর যোদ্ধা। বভ্রুবাহনও পিতা অর্জুনকে লবকুবশের মত (কৃত্তিবাসী রামায়ণানুসারে) আত্মীয় পরিজন সহ নিহত করেছিলেন। এই দুই মহাকাব্যের পিতৃ অনাদৃত সন্তানদের মধ্যে একটা মাত্র পার্থক্য লক্ষণীয়।

বভ্রুবাহন পিতৃ পরিচয় জেনেই পিতাকে মাতৃ অবমাননার ও ও তাঁর বীরত্বের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে হত্যা করেছিলেন। লবকুশের পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। লবকুশ বার বার পরিচয় দান কালে নিজেদের ঋষি কুমার ও বাল্মীকির শিষ্য বলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্ভীক উক্তি, রণকৌশলে, বীরোচিত ব্যবহার হতেই তাঁদের শরীরে যে ক্ষত্রিয় রক্ত ছিল তা সকলেই অনুমান করেছিলেন।

মাতৃবৎসল পুত্ররা জননীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে পিতৃবধের শাস্তি স্বরূপ আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বভ্রুবাহনকে নিবৃত্ত করেছিলেন কৃষ্ণ, লবকুশকে ঋষি বাল্মীকি।

লবকুশ ও বভ্রুবাহন তাঁদের স্ব স্ব পিতার গর্বের বীর ক্ষত্রিয় সন্তান —শোকাতুরা জননীর চোখের মণি বিরহী মাতৃ হৃদয়ের পরম সান্ত্বনা।

অর্জুনকে শাপমুক্তির জন্য পুত্রের হাতে নিহত হতে হয়েছিল— এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য হলেও বালক লবকুশের হাতে রামের বা তাঁর বীর ভ্রাতাদের পরাজয় ও মৃত্যুর কি কারণ ঘটেছিল—কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে তার উল্লেখ করেননি।

সরমা ও সুভদ্রা

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

—Gray.

কবির এ আক্ষেপ পরোক্ষে মানব সমাজের প্রতি কঠিন ধিক্কার। কত না প্রতিভা সমাজের অবহেলা, উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের জন্য বিকশিত হতে না পেরে অকালে ঝরে পড়ে। তাঁদের জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে না বা কেউ তাঁদের কোন কীর্তি গাথা রচনা করে না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাঁরা অভাবে প্রতিহত দারিদ্র্যের তাড়নায় অলক্ষ্যে শুকিয়ে যায়।

সেই রকম ভারতের দুই মহাকাব্যের দুইটি অতীব সুন্দর চরিত্রকে কবি বাল্মিকী ও কবি বেদব্যাস বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে পাঠকের চোখের অন্তরালে রেখে চরিত্রদ্বয়কে পাঠকের অভিনন্দন থেকে বঞ্চিত করেছেন।

মহাকাব্য রামায়ণে সরমা চরিত্র ও মহাকাব্য মহাভারতে সুভদ্রা চরিত্রকে কাব্যে উপেক্ষিতা বলা যায়। এই দুই মহাকাব্যের কবিদ্বয় এই দুই নারী চরিত্রকে পূর্ণ ভাবে আত্মবিকাশের কোন সুযোগই দেননি। এই রমনীদ্বয়ের ঔদার্য ও ত্যাগ উভয় মহাকাব্যে উপেক্ষিত হয়েছে।

সরমা গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের নন্দিনী। সরমার জন্মের সময় মানস সরোবরে জলস্ফীতি ঘটে। সেই সরোবর তীরে সরমার জন্ম হয়। সরমার জননী আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে বলেন—

সরো মা বর্ধয়স্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ। (উঃ) ১২।২৭

—সরোবর, তুমি স্ফীত হয়ো না, সেইজন্য তাঁর নাম হলো সরমা।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সরমা তাঁর স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী ছিলেন।

রামায়ণের পাঠকবর্গের সঙ্গে সরমার প্রথম পরিচয় অশোকবনে সীতার সান্নিধ্যে—

সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।
রক্ষন্তী রাবণদিষ্টা সনুক্রোশা দৃঢব্রতা॥ (যুঃ) ৩৩।৩

—রাবণের আদেশে দৃঢ়ব্রতা ও দয়াময়ী সরমা অশোকবনে সীতাকে রক্ষা করার সময় তাঁর (সীতার) সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো।

বিভীষণ দারাপুত্রদের লঙ্কাপুরীতে রেখে একা রামের নিকট গিয়ে রামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী পুত্রের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

এই ব্যবস্থার দ্বারা বিভীষণের সরমার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু রাবণ, যে ভাই শত্রু শিবিরে তাঁর স্ত্রীকেই বন্দী সীতার রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সরমার প্রতি রাবণের অগাধ বিশ্বাস এ ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়। অন্য পক্ষে সরমা নির্ভীক নারী —তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বামীর শত্রু রাবণের রাজ্যে বাস করতে সরমা কোন প্রকার ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করেননি। তাঁর এই নির্ভীকতার উৎস— তিনি সাধ্বী সীতার সহচরী। এ ক্ষেত্রে কোন অকল্যাণ ঘটতে পারে না। অশোক বনে সরমা ছিলেন বিরহিনী সীতার একমাত্র সহায় ও সান্ত্বনা। তিনি যে ভাবে সীতার দুঃখের গুরুভার লাঘব করেছেন তাতে শুধু তাঁর দরদী মনের সাক্ষ্য মেলে না তাঁর নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার প্রমাণও পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে হনুমান যখন তাঁর লেজের আগুনে সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করলেন, সেই আগুন দেখে হনুমানের জীবন শঙ্কায় সীতা বিলাপ করতে থাকলে, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে সরমা বললেন—

বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ কাহিনী।
রাজারে সে বলিলেন দুরক্ষর বাণী॥
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিল হনুমান ঘরে ঘরে॥
হনুমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে। (সুঃ)

সরমার এ সংবাদ নানা দুঃখে ক্লিষ্টা সীতার মনের উৎকণ্ঠা দূর করল তা সহজে অনুমেয়।

কোন প্রকারে সীতার মন জয় করতে অসমর্থ হয়ে রাবণ মায়ার আশ্রয় নিলেন। সীতাকে বশে আনবার চেষ্টায় রাবণ সীতাকে রামের ছিন্ন মুণ্ড দেখালেন। এবং রামকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে তা নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করলেন। রাম যথার্থই নিহত হয়েছেন মনে করে সীতা ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে থাকেন। রাবণ এই ভাবে সীতাকে শোকাভিভূতা করেও বিফল মনোরথ হলে অশোক বন ছেড়ে গেলে পর সরমা ব্যথা বিধুর সীতার সমীপে উপস্থিত হয়ে অতি কাতর ভাবে বললেন—

সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া॥
সখীস্নেহেন তদ্ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্॥ (যুঃ) ৩৩।৬

—বৈদেহি, আপনি আশ্বস্ত হন, মনে ব্যথা পাবেন না। রাবণ আপনাকে যা বলেছেন এবং রাবণের কথার প্রত্যুত্তরে আপনি যা বলেছেন, সখী স্নেহে আমি তা সমস্তই শুনেছি।

শোকাভিভূতা সীতাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে তিনি আরও

বললেন—আপনাকে দেখা শোনার জন্য রাবণ আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অতএব আপনার জন্য যে সব কাজ করি তার জন্য রাবণের কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। আমি রাবণের সমস্ত ঘটনা জেনে এসেছি। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। সখি আপনাকে আপনার অতি প্রিয় সংবাদ জানাচ্ছি। রাম সসৈন্যে সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে এসেছেন।

সেই আত্মজ্ঞ সর্বান্তর্যামী রাম নিদ্রিত হলেও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও সকলেরই দুঃসাধ্য। এবং সেই পুরুষ ব্যাঘ্র রামকে বধ করাও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। (বধশ্চ পুরুষব্যাঘ্রে তস্মিন্ নৈবোপপদ্যতে।) রামের কথা দূরে থাকুক, সুরদের ন্যায় রাঘব রক্ষিত বৃক্ষদ্বারা যুদ্ধরত সেই বানরদের নিহত করাও দুঃসাধ্য। যাঁর বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও বর্তুল, সেই বিশাল বক্ষ, প্রতাপশালী, ধন্বী, যুদ্ধ সজ্জিত, বিক্রান্ত, নিয়ত আত্মপর রক্ষণ সমর্থ, ত্রিলোক বিশ্রুত, নীতিশাস্ত্রবিদ্ ও প্রখ্যাত কুল সম্ভূত রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে কুশলে আছেন।

হন্তা পরবলৌঘানামচিন্ত্যবলপৌরুষঃ।
ন হতো রাঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রুনির্বহণঃ॥ (যুঃ) ৩৩।১২

—হে সীতে, পরবলহন্তা, অচিন্ত্য-বলপৌরুষ ও শত্রুবধকারী শ্রীমান রাঘব নিহত হননি।

অযুক্তবুদ্ধি, ক্রূরকর্মা, সর্বভূতবিরোধী, ভীষণমূর্তি ও মায়াবী রাবণ আপনার নিকট মায়ার খেলা দেখিয়েছেন।

আপনার শোকের অবসান সময় এবং সুসময় উপস্থিত। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করবেন। আমি অন্তরীক্ষ হতে দেখেছি রাম ও লক্ষ্মণ সাগর তীরে বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত ও সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। রাবণের দূতরা এই সংবাদ এনেছে। সেইজন্যই তিনি সচিবদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে চলে গেলেন।

সরমা রাক্ষসদের যুদ্ধ যাত্রার তূর্য নিনাদের প্রতি সীতার মনোযোগ আকৃষ্ট করে বললেন—এখন আপনার ভাগ্য আপনার প্রতি প্রসন্ন। রাক্ষসদের বিনাশ আসন্ন।

রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ ॥
অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রাবণং সমরে হত্বা ভর্তা ত্বাধিগমিষ্যতি ॥

(যুঃ) ৩৩।২৯-৩০

—ইন্দ্র যেমন দৈত্য কবল হতে রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, পদ্মপলাশ লোচন জিতেন্দ্রিয় রাম অচিরেই রাবণকে সমরে বিনাশ করে আপনাকে লাভ করবেন। (ইহাতে আপনি কিছুমাত্র সন্দেহ করবেন না। কারণ রামের পরাক্রম অচিন্তনীয়।)

বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্তা তে সহলক্ষ্মণঃ।
যথা শত্রুষু শত্রুঘ্নো বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ ॥ (যুঃ) ৩৩।৩১

—বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র যেমন শত্রুদের উপর শক্তি প্রকাশ করে কৃতকার্য হয়েছেন, তেমনি আপনার স্বামী লক্ষ্মণের সাহায্যে রাক্ষসদের উপর বিক্রম প্রদর্শন করতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবেন।

আপনার শত্রু নিহত হলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এবং আপনাকে শীঘ্র আপনার স্বামীর অঙ্কে অবস্থান করতে দেখব। আপনি শীঘ্রই স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবেন।

দেবি, আপনি যে বহু মাস ধরে জঘনদেশ লম্বিত একটি মাত্র বেণী ধারণ করেছেন, মহাশক্তিশালী রাম শীঘ্রই সেই বেণী মোচন করবেন। (ধৃতামেকান্ বহূন্ মাসান বেণীং রামো মহাবলঃ) যেমন সর্পী খোলস ত্যাগ করে, তেমনি আপনি সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সেই স্বামীর মুখ দর্শন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবেন। রাম শীঘ্রই রণক্ষেত্রে রাবণকে নিহত করে আপনার সঙ্গে সুখ লাভ করবেন। (সুবর্ষেণ সমাযুক্তা যথা শস্যেন মেদিনী) শস্যপূর্ণ

বসুন্ধরার ন্যায় আপনি রামের দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হয়ে আনন্দ লাভ করবেন।

গিরিবরমভিতো বিবর্তমানো
হয় ইব মণ্ডলমাশু যঃ করোতি।
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি
দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্॥
(যুঃ) ৩৩৷৩৮

—যিনি গিরিবর সুমেরুর চারদিকে অশ্বের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই দিবাকরের শরণাগতা হও; কারণ, তিনিই প্রজাদের সুখ দুঃখের বিধাতা।

সরমা এই উক্তির মধ্যে তাঁর উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সরমা রাক্ষস পত্নী। সীতার জন্যই লঙ্কার এই যুদ্ধ। কিন্তু সেজন্য সরমার সীতার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ক্রোধ পোষণ করতে বা প্রকাশ না করে বরং তাঁর হিত কামনা করেছেন। লঙ্কাপুরীতে একমাত্র সরমাই সীতার হিতৈষিণী সখী। সরমা অকৃত্রিম দরদী। বিভীষণ দম্পতি যেন রামের দুর্দিনের দুঃখ ভার লাঘব করবার জন্যই সে সময়ে এসেছিলেন। রামের ও সীতার ঘোরতর সঙ্কট মুহূর্তে এই দম্পতি রাম ও সীতার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের উভয়কে মনে ও দেহে প্রভূত বল সঞ্চার করেছেন।

দাবানল দগ্ধ ধরিত্রী যেমন বারিপাতে শীতল হয়, তেমনি রাবণ বাক্যমোহিতা সীতার শোক সন্তপ্ত অন্তঃকরণ সরমার এই আশ্বাস বাক্যে শান্ত হল।

অতঃপর সখী সরমা সীতার হিত সাধন বাসনায় ঈষৎ হাস্য সহকারে বললেন—

উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্॥ (যুঃ) ৩৪৷৩

—হে অসিতক্ষণে, আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে রামের কাছে গিয়ে তোমার কুশল নিবেদন করে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হব।

এরূপ দুরূহ কাজ করবার অভিপ্রায় সীতার প্রতি সরমার প্রগাঢ় ভালবাসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন।

সরমা আরও বললেন, অধিক কি বলব, আমি যখন নিরাবলম্ব ভাবে আকাশে গমন করি, তখন পবন অথবা গরুড় আমার গতি নিরূপণ করতে পারেন না। সরমা এ কথা বললে, সীতা তাঁকে বললেন—

তুমি সর্বত্র যেতে পার তা জানি। যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চাও, তবে রাবণ কি করছেন কি বলছেন তা জেনে এসো।

যেরূপ লোকে সুরা পান করে মোহিত হয়, তেমনি মায়াবলে বলীয়ান রাবণ আমাকে মায়া দ্বারা মোহিত করতে চেষ্টা করছে। রাবণ সর্বদা দুষ্টাত্মা, ক্রুর, রাক্ষসীদের দ্বারা আমাকে রক্ষা এবং তাদের দিয়ে আমাকে তর্জন ও ভৎ'সনা করিয়ে থাকে।

সখি, আমি এই ক্ষুদ্র অশোক বন মধ্যে রাবণ ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্না ও শঙ্কিতা হয়ে রয়েছি, আমার মন কখনও সুস্থ থাকছে না। সভায় গিয়ে রাবণ কি পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করে, তুমি তা জেনে আমাকে জানালে, তবেই আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হবে।

সরমা অশ্রুসিক্ত সীতার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন যদি ইহাই আপনার অভিপ্রেত হয় তবে আমি এক্ষুনি চললাম এবং শত্রুর অভিপ্রায় জেনে শীঘ্র ফিরে আসব বলে তখনই রাবণের সভায় গিয়ে অল্পক্ষণ পর ফিরে এসে জানালেন—

জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥

(যুঃ) ৩৪।২০

—রাক্ষসদের জননী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ মন্ত্রী রাবণকে অতি শান্ত ভাবে বুঝালেন সীতাকে সসম্মানে রামের হাতে প্রত্যর্পণ কর। হনুমান যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার দর্শন ও রাক্ষস বধ করেছে, তা তাদের পরাক্রম তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছো। বল, কোন্ মানুষ রণক্ষেত্রে রাক্ষসদের নিহত করতে পারে? বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণের জননী এইরূপে রাবণকে বহু উপদেশ দিলেন।

কিন্তু রাবণ সেই উপদেশ শুনলেন না। অর্থগৃধ্নু যেমন অর্থ ত্যাগ করতে চায় না, তিনিও সেইরূপ আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন না। রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে একমত হয়ে পণ করেছেন যে, যুদ্ধে নিহত না হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। কেবল মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধ হতে বিরত থেকে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। ইহাই তাঁর সঙ্কল্প।

সীতার মনে আশার সঞ্চার করবার জন্যে সরমা বললেন—

নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রতিনিয়্যেতি রামস্ত্বামযোধ্যামসিতেক্ষণে ॥

(যুঃ) ৩৪।২৬

—হে অসিত লোচনে, রাম শীঘ্রই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা রাবণকে বিনাশ করে আপনাকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে সরমা রাবণের সভা হতে প্রত্যাগমন করে সীতাকে শোনালেন—

তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে ॥
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কানে।
সেই মত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে ॥
কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার ॥

বহু কষ্ট গেল সীতা অল্পমাত্র আছে।
দেখিবা রামের মুখ সুখ হবে পিছে ॥
ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে যাইও প্রভুস্থান ॥ (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে সরমার প্রসঙ্গ আর কোথাও নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে সরমাকে শেষবারের মত দেখা যায় পুত্র তরণী রাবণের পক্ষে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে মার আশীর্বাদ চাইতে গেলে। পুত্রের বিপদ আশঙ্কায় স্নেহাতুরা জননী বলছেন ঃ—

কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব নর বানরের রণে ॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
ধার্মিক তোমার পিতা জানে সর্বজন।
পাপসঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলকের পতি ॥
দুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহার।
দশরথের ঘরে বিষ্ণু রাম-অবতার ॥
এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ ॥
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥ (লঃ)

বিষ্ণু রূপী রাম রাক্ষসকুল সংহার করতে যে দশরথের গৃহে জন্ম নিয়েছেন, তা তিনি পুত্রকে জানালেন। ধার্মিক স্বামী রাক্ষস কুলের অবস্থা পূর্বেই জানতে পেরে রামের শরণাপন্ন হয়েছেন।

তিনিও পুত্রকে নিয়ে লঙ্কা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার সঙ্কল্প জানালেন। কিন্তু ব্যথাতুর মাতার অনুরোধ সত্ত্বেও বীর পুত্র তরণী জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধে যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করে যুদ্ধে গিয়ে রামের হাতে নিহত হলেন।

পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা।।
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষ।। (লঃ)

পুত্রশোকে কাতরা সরমাকে আর রামায়ণে দেখতে পাওয়া যায়নি। বিভীষণের অভিষেকের আনন্দ মুহূর্তেও সরমাকে তাঁর পাশে, সীতার অগ্নি পরীক্ষার দুঃখের মুহূর্তে সীতার পাশে বা আনন্দ মুখরিত মুহূর্তে সীতার পাশে বা আনন্দ মুখরিত মুহূর্তে রামের সঙ্গে সীতার অযোধ্যা যাত্রা কালে ও রাম সীতার অভিষেকের মত কোন প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রামায়ণের সরমাকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। সীতার অশোক বনের দুঃখের পসরা লাঘব করবার জন্যই যেন কবি সরমা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং সেই কার্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সুখের দিনে কবি যেন তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সরমার নিজস্ব আনন্দ বেদনার কোন আভাষই এই মহাকাব্যে ফুটে উঠেনি। স্বামীর রাজ্য প্রাপ্তির পর তাঁর পাশে সরমাকে দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীর সেই শুভদিনেও কোন কবিই পুত্রহীনা জননীকে আর পাঠক সমীপে উপস্থিত করেননি।

অতএব সরমা এই মহাকাব্যে উপেক্ষিতা হয়েছেন—এ সত্য তর্কাতীত।

রামায়ণ মহাভারত যুগ যুগ ধরে অনেক কবির অনুপম রচনার শাশ্বত উৎস।

সরমার প্রতি কবি বাল্মীকির ঔদাসীন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খুবই ব্যথিত করেছিল। তিনি কবির অকরুণ ব্যবহারে অতীব ক্ষুব্ধ। তিনি বিভীষণ পত্নী সরমাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর "মেঘনাদ বধ কাব্যে"।

অশোক কাননে সীতা যখন চেড়ী বেষ্টিত হয়ে ছিলেন, সেই সময় সরমা-সীতা এই উভয়ের মধ্যে যে সখ্য ভাব গড়ে উঠেছিল তার এক অনুপম চিত্র তাঁর কবি কল্পনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

সরমা সীতাকে বলছেন—

দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবী, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর-ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি তোমায় কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ—অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-যত্ন যথা!
ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম লক্ষ্মি! ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে।"

কবি মধুসূদনের কি রচনা কৌশল? দুরন্ত অশোক বনে চেড়ী বেষ্টিত সীতার কাছে কি সুন্দর ভাবে সরমা হাজির হলেন। এখানে বাঙ্গালী বধূর এয়োতির আচরণ অবধি কবির চক্ষু এড়ায়নি।

শত্রুপুরীতে বিরহ ও নানা ব্যথাতুর একটি নারী হৃদয়ের ব্যথা উপলব্ধি করে শত্রুপুরীর কুলবধূ যে ভাবে সীতাকে সমবেদনা জানাতে আসলেন—এ এক অপূর্ব নারী হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সরমার আচরণে। কবি এখানেই ক্ষান্ত হননি। সরমাকে অধিকতর সুন্দর করে ফুটিয়েছেন—

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ।

আবার আমরা কবিকে পাই বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও কৌলিন্যে যেন গদ্‌গদ্। গ্রাম বাংলার সন্ধ্যা দীপের তিনি এক নিখুঁত ছবি আঁকলেন —যা অতি বিরল।

সীতা উত্তর দিলেন—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে,
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই হেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—বীর রঘুনাথে;
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"

সরমা জিজ্ঞেস করলেন—

"দেবি! শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি?

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এই তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?

সরমার কৌতূহল মিটাবার জন্য সীতা তাঁর হতভাগ্যের কাহিনী বললেন—

হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি সখি ! পূর্ব কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।

... ...

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে।
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !

... ...

তুমি কুবলয়ে।
(অতুল-রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বন দেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুক।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?

... ...

হে দারুণ বিধি !
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”

দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে সীতা তাঁর চোখের জল সংবরণ করতে পারছেন না দেখে দরদী সরমার চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি চোখের জল মুছে রোরুদ্যমানা সীতাকে বললেন—

"স্মরিলি পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"

কবি কি সুন্দর ভাবে দুই দরদী প্রাণের বুকভরা বেদনা প্রকাশ করেছেন। সীতা নিজেকে অত্যন্ত অভাগিণী মনে করতেন। তাই বললেন কান্না তাঁর চোখেই শোভা পায়—

এ অভাগী, হায় লো, সুভগে।
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি শুন পূর্বের কাহিনী।
... ...
তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো, সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ—পুরে ?

দুঃখীর দুঃখের বোঝা হাল্কা হয় তা অপরের কাছে প্রকাশ করে। এ শক্রপুরীতে একমাত্র সরমাই সীতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অতএব তাঁর বনবাস জীবনের সব কথা সরমাকেই বললেন।

সীতা প্রথমে বনবাসে তাঁর সুখের দিনগুলির বর্ণনা করলেন। তাঁর মতে প্রকৃতির কোলে রামের বনবাস নয়—আনন্দ বাস ছিল। প্রকৃতির আপন সম্পদ নদী গিরিমালা ফল পুষ্প শোভিত নানা রঙ বেরঙের পশু পক্ষীর কূজন, গুঞ্জন তাঁদের ভুলিয়ে রেখে ছিল,

অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদ বা রাজপ্রাসাদের সুখ ও ঐশ্বর্য। এমন সুন্দর ও সরল ভাবে তিনি বনবাস জীবন বর্ণনা করলেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে সরমা উত্তর দিলেন—

"শুনিলে তোমার কথা রাঘব রমণি!
ঘৃণা জন্মে রাজ ভোগে, ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখে, যাই চলি হেন বনবাসে।
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে,
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে,
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি।
কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা?
জগৎ আনন্দ ভূমি ভুবন-মোহিনী!
কহ দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি?

সীতার বর্ণনার চমক—সরমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুললো। তাই তিনি আরও জানতে চাইলেন কি ছলনার দ্বারা রক্ষেন্দ্র তাঁকে হরণ করেছিলেন?

"দেখ চেয়ে নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি।
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত;
শুনিবারে এ কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"

সরমার মতে সমস্ত প্রকৃতি যেন সীতার এ কাহিনী শুনবার

উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে। তাদের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য তিনি সীতাকে অনুরোধ করলেন।

সুখের দিনের বন্ধু অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের দিনে এমন বুক ভরা সমবেদনা নিয়ে দুঃখীর দুঃখের কাহিনী শুনে তাঁর হৃদয়ের গুরু ভার লাঘব করতে আসে কয় জন? এ কালের মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সরমা কিন্তু সেই বিরলের অন্যতমা অনন্যা।.

সীতা তাঁর হরণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে দুঃখে শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

> কহিলা সরমা কাঁদি,—ক্ষম দোষ মম,
> মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
> হায়, জ্ঞানহীন আমি।"

নিজেকে সংবরণ করে সীতা উত্তর দিলেন—

> "কি দোষ তোমার, সখি? শুন মন দিয়া
> কহি পুনঃ পূর্বকথা।"

অতঃপর তিনি মারীচের স্বর্ণ মৃগের রূপ ধরা থেকে তাঁকে হরণ করা পর্যন্ত সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন। তা শুনে কহিলা সরমা—

> "এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি!
> দেহ সুধা—দান তারে। সফল হইল
> শ্রবণ—কুহর আজি আমার।"

সরমার আগ্রহ এখনও মিটেনি। তিনি আরও শুনতে চাইলেন। সীতা পুনরায় বললেন—

> শুনিতে লালসা যদি,—শুন লো, ললনে!
> বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—

এ শত্রু পুরীতে সীতা একজন দরদী শ্রোতা পেয়ে তাঁর দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করলেন। সীতা বিস্তৃত ভাবে রাবণ কি ভাবে তাঁকে

হরণ করে নিয়ে আসলেন তার বর্ণনা করে তাঁর এক অপূর্ব স্বপ্নের কথা বললেন—

দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী পাশে আমি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ! তোর হেতু সবংশে মজিবে
আমি, এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোর লঙ্কা বিনাশিতে।
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি! আশীষিনু তোরে,
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে!—
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চ জন, বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ... ...
... ...
... ... বীর পঞ্চ জনে।
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্র পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মরি সে দেশের রাজা তুমুল-সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ—বর পঞ্চ—জন মাঝে।
... ...
... ... কহিলা হাসিয়া
মা আমার—'কারে ভয় করিস্, জান কি?

সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই ইন্দ্র-তুল্য বলি—
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে … …
… … …
দেখিনু, সরমা সখি ভাসিল সলিলে
শিলা। … …
… … …
বাঁধিল অপূর্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে। অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি বীর—মদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরী-পদচাপে—
'জয় রঘুপতি, জয়' ধ্বনিল সকলে!
… … …
আছিলা সে সভাতলে ধীর ধর্মসম
বীর এক; কহিল সে,—'পূজ রঘুবরে।
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে! সংসার মদে মত্ত রাঘবারি।
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"

সীতার বিবৃতির উত্তরে সরমার মুখে যা প্রকাশ পেলো তাতে পাঠকের এক সংশয়ের নিরসন হলো। বিভীষণের লঙ্কা ত্যাগের আগে সরমার সঙ্গে বৈদেহীর দুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হয়েছিল। এ আলোচনায় সরমার হৃদয় সীতার দুঃখে গলে গিয়েছিল।

সরমা বললেন—

"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সত্যি, কত কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"

লঙ্কায় এক রাক্ষস দম্পতি যে সীতার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করেছেন তা জানালেন সরমা।

কৃতজ্ঞতা ভরে সীতা বিভীষণ দম্পতির দয়ার কথা স্বীকার করলেন—

জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম। সরমা সখি, তুমি ও তেমনি।
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে।
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন।—
... ...
বহিল শোণিত নদী পর্বত আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর!
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
... ...
কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ,—'হায় বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে জাগাও যতনে
শূলি—শম্ভু—সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।

কে রাখিবে রক্ষঃ কুলে সে যদি না পারে ?

... ...

প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তার শিরঃ। মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর।

... ...

"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন। কহিনু মায়ে ; ধরি পা দুখানি,—
'রক্ষ—কুল—দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার।
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম মোরে। "হাসিয়া কহিলা
বসুধা ; 'লো রঘুবধু। সত্য যা দেখিলি
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। ... ...

... ...

"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক—উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি।—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি ;
মোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার, আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে।
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?"

কবি মধুসূদন কি সুন্দর ভাবে এক স্বপনের মাধ্যমে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য অপূর্ব ভাবে চিত্রিত করেছেন। এ যেন ছায়া চিত্রের মত সীতা একের পর আর এক ছবি পর্দায় ফেলে সখী সরমার কাছে হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করছেন। দুঃখিনী সীতার তাঁর পতির জন্য এক আকুল আবেদন সরমাকে ব্যথিত করল।

... ... কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষো-বধূ-রূপে)
কহিলা ;—পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনী !
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে।
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ ! মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্মতি
সবংশে, এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।

সীতা পুনরায় তাঁর স্বপ্নের শেষ অধ্যায় বিবৃত করতে লাগলেন—

"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর—কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !
... ...
... ... জগৎ বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুল-বলে !
নিজ-দোষে মরে মূর গরুড়—নন্দন !
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?
'ধর্ম—কর্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে ;

রাবণ!—কহিলা শূর অতি মৃদুস্বরে,—
'সম্মুখে-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া।
শৃগাল হইয়া, লোভে, লোভিলি সিংহীরে,
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী রতনে।
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা;
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
...   .
...   ... কিন্তু কারাগারে যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ—বিহারিণী।
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি।
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ;
তবু বদ্ধ কারাগারে।"

সীতা স্বপ্নের সুখ থেকে কঠিন বাস্তবে ফিরে এসে অতি খেদে বললেন, রাজনন্দিনী রাজকুলবধূ আজ শত্রু কারাগারে। শেষের তিন পংক্তি কেবল বিষাদ পূর্ণ উক্তি নয়। যথার্থই এমন হতভাগ্য বিরল। দ্রৌপদীও রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী সঙ্গ কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। নল দময়ন্তীর মধ্যেও বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্তু সীতার মত এত দুর্ভোগ কারো অদৃষ্টেই ঘটেনি।

সীতার বেদনা ভরা এ দুঃখ কাহিনী সরমার চোখ অশ্রু সিক্ত করল। তিনি চোখের জল মুছে বললেন—

… দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি। বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি ? … …

… … দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি। কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ। … …

… … …

ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা—কামিনী
সরস—বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে।
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি। যত দিন বাঁচি.
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী—ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী।

সরমার আকুল আবেদনের প্রত্যুত্তরে সীতাও সরমার মতই সুন্দর ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—

… সরমা সখি, মম হিতৈষিনী
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ। সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।

মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে।
এ পঙ্কিল-জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন। দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?

সীতা সরমাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করলেন মহাকবি মধুসূদনের অপূর্ব লেখনী ব্যতীত অন্য কোন কবি সরমাকে এ ভাবে পদ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যদিও এটাই সরমার যোগ্য মর্যাদা। কিন্তু কবি বাল্মীকি বা কবি কৃত্তিবাস কেন সরমার এই উজ্জ্বল দিকটি অবহেলা করে তাঁকে এরূপ অখ্যাত অজ্ঞাত রাখলেন তা বুঝা যায় না।

ইন্দ্রজিৎ বধের পর সরমা পুনরায় সীতাকে জানালেন—

"তব ভাগ্যে ভাগ্যবতি! হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি!
কর্ব্বুর—ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুল নারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্য বলে,
পদ্মাক্ষি! দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে।"

এই শুভ সংবাদে সীতার অনুতপ্ত অন্তর তাঁর পূর্ব-অপরাধ স্খালনের জন্য বললেন—

... ... সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ! সদা লো এ পুরে।

ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিল সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগার দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে, দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কাণ দিয়া। ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।

অন্যত্র সীতা কি সুন্দর ভাবে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি! নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গল রূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
বনবাসী, সুলক্ষণে! দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি!
শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান। হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে, দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল।

এই বিলাপের মধ্যে কবি মধুসূদন কেবল বেদনা বিধুর সীতার হৃদয় দ্বারই উদঘাটিত করেননি, কবির কাব্য প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। কবি কল্পনায় ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলাকে সহমরণে পাঠালেন। তিনি কেবল মানব লক্ষ্মণ হতে ইন্দ্রজিৎকেই প্রাধান্য দেননি, প্রমীলার চরিত্র যা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস কবি সবার অগোচরে রেখেছেন, তাঁকে সর্ব সমক্ষে অতুলনীয় সতী রূপে তুলে ধরেছেন।

সরমা উত্তর দিলেন—

"দোষ তব"—কহ কি রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ ব্রততী
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব মানস পদ্ম এ রাক্ষস দেশে?
নিজ কর্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।
আর কি কহিব দাসী?

কবি বাল্মীকি ও কবি কৃত্তিবাস সরমাকে দিয়ে কেবল মাত্র লঙ্কা ও লঙ্কাপতির তৎকালীন অবস্থা ব্যবস্থার খবর সীতার কাছে পরিবেশন করিয়েছেন। নেপথ্যে বা অন্তরালে থেকে বা বায়ুপথে গিয়ে তিনি রাবণের ও যুদ্ধের যে সব খবরাখবর সীতাকে দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে সে সব খবর সীতার মৃতপ্রায় দেহে ও মনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সীতা সরমার সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর—

"কিন্তু এ কাননে
পাইনু সরমা সই পরম পিরীতি।
... ...
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে?
... ...

সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে ?

সীতা সরমার এ দরদী সম্পর্ক অন্য কবিদ্বয় একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন। অররুপুরে সরমাই কেবল সীতার দুঃখে দুঃখিনী, তাঁর দুঃখের ভাগ নিয়েছেন। এবং তাঁর দুঃখ হ্রাস করবার চেষ্টা করেছেন। সরমা সীতার বন্দী জীবনের এক অমূল্য রত্ন।

রোহিণী ও বসুদেবের কন্যা, বলরামের সহোদরা ও কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী এবং পঞ্চ পাণ্ডবের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের অন্যতমা স্ত্রী সুভদ্রা। সুভদ্রা পরমা সুন্দরী ও বীরাঙ্গনা ছিলেন। তাঁর রূপ মাধুর্যে অর্জুন প্রথম সাক্ষাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে যাতে বিবাদ সৃষ্টি ন হায় সেজন্য নারদের পরামর্শে তাঁরা সর্বসম্মতি ক্রমে ঠিক করলেন যে দ্রৌপদী যখন যে ভ্রাতার সঙ্গে সহবাস করবেন, তখন অন্য কোন ভ্রাতা সে কক্ষে যেতে পারবেন না। ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী একবার যখন দ্রৌপদী অগ্রজ যুধিষ্ঠিয়ের সঙ্গে বাস করছিলেন, তখন কোন ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার অনিবার্য কারণে দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের কক্ষে অস্ত্র আহরণের জন্য অর্জুনকে প্রবেশ করতে হয়েছিল। উপরোক্ত নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ অর্জুনকে বার বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত উদযাপনের জন্য বনে যেতে হলো।

যখন উপরোক্ত ব্রত পালনের জন্য অর্জুন বনবিহার করছিলেন তখন নানা স্থান ঘুরে ঘুরে অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হলেন। সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। প্রভাস থেকে অর্জুনকে বনবাসের জন্য কৃষ্ণ রৈবতক পর্বতে নিয়ে যান।

কয়েকদিন পর বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দের এক মহোৎসবে রৈবতক মুখরিত হয়ে উঠল। অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে সে উৎসব ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে উপভোগ করছিলেন। কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভদ্রাও সহচরী পরিবেষ্টিত হয়ে সে উৎসবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সুভদ্রার অনুপম সৌন্দর্য অর্জুনকে আকৃষ্ট করল। তিনি এক দৃষ্টে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ঘটনা কৃষ্ণের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। কৃষ্ণ উপহাস করে অর্জুনকে বললেন ; হে বনচারী পুরুষ, যে তোমার চিত্ত বিকল করেছে, সে আমারই ভগ্নি।

অতঃপর কামাতুর অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কি করে সুভদ্রাকে লাভ করা যায়। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—

স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষর্ভ।
স চ সংশয়িতঃ পার্থ স্বভাবস্যা নিমিত্ততঃ ॥
প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
বিবাহহেতুঃ শূরাণামিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥

(আঃ) ২১৮।২১-২২

—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ পার্থ, ক্ষত্রিয়দের বিবাহ স্বয়ংবর অনুসারে। কিন্তু স্বয়ংবরে সংশয় আছে, মেয়েদের স্বভাবের জন্য। অর্থাৎ কন্যা কাকে বরণ করে তার নিশ্চয়তা নাই। বীর ক্ষত্রিয়দের বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ ধর্ম সঙ্গত।

অর্জুন সুভদ্রার ভ্রাতা কৃষ্ণর ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। কৃষ্ণার্জুন যুধিষ্ঠিরের মত প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সম্মতি জানালেন।

অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। ঐদিকে সুভদ্রা পূজা সমাপান্তে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে প্রত্যাবর্ত্তন করবার জন্য দ্বারকার পথে, পথিমধ্যে অর্জুন তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে ধাবিত হলেন।

সুভদ্রা হরণ দেখে রক্ষীরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে দ্বারকার দিকে ছুটলো এবং সভাপালের কাছে পার্থের সুভদ্রাহরণ সংবাদ জানাল। এ সংবাদে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মহাক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য 'সাজ সাজ' রবে সভাস্থল মুখরিত করে তুলল। ঠিক সেই সময় বলরাম বললেন, হে নির্বোধের দল, তোমরা কি করছ? যেখানে জনার্দ্দন স্বয়ং চুপ, সেখানে তার মনোভাব না জেনে কেন বৃথা তর্জন গর্জন করছ। পূর্বে তার মতামত জান, পরে যা অভিপ্রেত হবে তা সর্ব প্রকারে চেষ্টা করবে।

বলরামের কথা শুনে সকলেই নীরব হলেন। এবং বলরাম কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন সব দেখে শুনেও তিনি নীরব কেন? বলরাম অভিযোগ করে বললেন, তুমি তাকে আদর আপ্যায়ন করেছ বলে আমরাও অর্জুনের সমাদর করেছি। কিন্তু সে কুলাঙ্গার, পূজার যোগ্য নয়। (ন চ সোঽহ ইতি তাং পূজাং দুর্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ) বলরাম কঠোর ভাষায় অর্জুনকে অভিযুক্ত করলেন। তিনি একাই পৃথিবী কৌরবশূন্য করবেন এবং এই আপমান কোন রকমে সহ্য করবেন না বলে গর্জন করতে থাকেন। তখন বাসুদেব যুক্তিযুক্ত উত্তর দিলেন।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন তাঁদের কুলের অবমাননা করেননি। বরং তিনি অধিক সম্মানই প্রদর্শন করেছেন। (সম্মানোঽভ্যধিকস্তেন প্রযুক্তোঽয়ং) কৃষ্ণ অর্জুনকে সমর্থন করে বললেন যে অর্জুন জানে ঐশ্বর্যের বিনিময়ে সুভদ্রা লাভ সুনিশ্চিত বা স্বয়ংবর সভায় সুভদ্রাকে লাভ করাও তদ্রূপ অনিশ্চিত। অতএব অর্জুন এসব বিবেচনা করে বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করেছেন এবং এ প্রথা ক্ষত্রধর্ম অনুযায়ীই বটে।

কৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে ওকালতি করে বললেন, অর্জুন ভরত—শান্তনুর বংশের পুত্র, কুন্তির গর্ভজাত, তিনি বীর যোদ্ধা, যুদ্ধে-অজেয়। এখন সুপাত্র সকলেরই কাম্য। আপনারা শীঘ্র গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন। অন্যথা তিনি যদি আপনাদের পরাজিত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তাতে আপনাদের যশ নষ্ট হবে। কিন্তু অর্জুনকে মিষ্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা বৃদ্ধি পাবে।

কৃষ্ণের পরামর্শে বলরাম শান্ত হলেন। সকলে মিলে পরম সমাদরে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন। দ্বারকায় তাঁদের বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হল। তারপর এক বৎসর দ্বারকায় তিনি বাস করে বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুষ্কর তীর্থে যাপন

করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রা সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে সুভদ্রার্জুনের মিলন অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্জুনকে দেখে সুভদ্রা মাটিতে বসে পড়লেন।

সত্যভামা বলে না আস ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিলা কি কারণে ॥ (আঃ)

উত্তরে—সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায়, বাহির করহ ॥ (আঃ)

সত্যভামার নিকট সুভদ্রা অর্জুনের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের কথা প্রকাশ করলেন। তা শুনে সত্যভামা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন :—

তোমার পিতা বসুদেব, ভাই বলরাম স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণ। ত্রিলোকে সকলে যাঁকে পূজা করে। সেই বংশের মেয়ে হয়ে পর পুরুষে মন সমর্পণ করলে।

উত্তরে—সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল ॥ (আঃ)

উপরোক্ত উক্তি হতে অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার গভীর প্রেম প্রকাশ পায়। সত্যভামা তাঁকে উচ্চ বংশের সুপুরুষ পণ্ডিতের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

ভদ্রা বলে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
কৌরব বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন ॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিতে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥ (আঃ)

তারপর সুভদ্রার নিশিথ রজনীতে অর্জুন সমীপে অভিসারে গমন ও গন্ধর্ব মতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন।

কৃষ্ণ সত্যভামার নিকট অর্জুন ও সুভদ্রার গান্ধর্ব বিবাহের কথা শুনে বললেন, বলরাম কখনই অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দিতে সম্মত হবেন না।

পরদিন সকালে কৃষ্ণ সকলের সমীপে সুভদ্রা বিবাহযোগ্যা হয়েছেন অর্জুন উপযুক্ত পাত্র তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলে সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন, কিন্তু বলরাম বললেন—

কৌরবকুলের শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন। (আঃ)

রূপে গুণে অর্থে তাঁর শতাংশও নয়। তিনি দূত পাঠিয়ে হস্তিনায় দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে কৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে কৃষ্ণের রথে হাস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করলেন। অন্য দিকে বলরামের আমন্ত্রণ পেয়ে দুর্যোধন সুভদ্রাকে বিয়ে করবার জন্য যাত্রা করবার ব্যবস্থা করে যুধিষ্ঠিরদের নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন।

যুধিষ্ঠির নিজে না গিয়ে ভীমকে সসৈন্যে যেতে বললেন। ভীম দুর্যোধনকে বরবেশে দেখে বললেন :—

হেথা হৈথে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ।
এই খানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
... ...
কোন কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকট দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণে সভা-মধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁই ও বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥ (আঃ)

এই ভাবে দ্ব্যর্থ ভাবে ভীম অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ের কথা দুর্যোধন ও কৌরব সভায় সবাইকে জানালেন।

ঐদিকে বলরাম যখন দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ের ব্যবস্থা

করছেন, তখন অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছেন এ খবর পেয়ে বলরাম অর্জুনের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করে নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। কৃষ্ণের পুত্র সসৈন্যে যুদ্ধ করতে এসেছে দেখে সারথি দারুক যুদ্ধের জন্য রথ চালাতে অস্বীকৃত হলে অর্জুন তাঁকে রথে বেঁধে নিজেই—

এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুগুর্ণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি॥ (আঃ)

তখন সুভদ্রা অর্জুনকে বললেন—

ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমায় চালাই অশ্বগণে॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিনীর সঙ্গে।
তিনপুর ভ্রমণ করিনু যথা রঙ্গে॥
স্নেহে মোর সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয়॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্য ধন্য বলি ব্যাখ্যা করেন বিস্তর॥
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোন্ পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে॥
চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে। (আঃ)

এইখানে বীর রমনী সুভদ্রা স্বামীর চরম বিপদে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে বিপদের সমাংশ গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় নারীর বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বিপদে অধীর না হয়ে ধৈর্য ধরে স্বামীর পাশে দাঁড়ান বীরাঙ্গনার নিদর্শন। তিনি বীরাঙ্গনা বলেই অভিমন্যুর মত বীর পুত্রের জননী হয়ে অমর হয়েছেন।

এখানে কেবল সুভদ্রার পতিপ্রেমই প্রকাশ পায়নি, তাঁর আত্মবিশ্বাস ও নিপুণ সারথির কাজ চালাবার যোগ্যতাও সকলকে

আকৃষ্ট করে। অর্জুন যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুভদ্রাকে আপন রাজ্যে নিয়ে গেলেন। দূত এসে যাদব পক্ষের পরাজয়ের কথা শোনাতে গিয়ে বলে—

... ... যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূত মুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমি তলে বসিলেন হৈয়া হেঁট মাথা॥ (আঃ)

কৃষ্ণ বলরামকে বুঝিয়ে বললেন—

... ... আমি জানি অর্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে॥
... ...
যে কহিলা সত্য পার্থ নাহি মারে প্রাণে॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জুন ত নাহি কিছু করে অবিহিত॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ॥
... ...
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মরিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
... ...

প্রিয় বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনাও তারে করাহ বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥ (আঃ)

কৃষ্ণের প্রস্তাবে সকলে পরম সমাদরে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনকে দ্বারকায় ফিরিয়ে এনে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করলেন। সুভদ্রা অর্জুনের মামাতো ভগ্নি ছিলেন। বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হলেন। সেই যুগে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নীতি বিরুদ্ধ ছিল না। তার প্রমাণ অর্জুন—সুভদ্রার বিবাহ।

এক বৎসরের অধিক কাল দ্বারকায় পরম সুখে বাস করে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসলেন।

সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌশেয়বাসিনীম্।
পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপলিকাবপুঃ॥ (আঃ)
২২০।১৯

—সুভদ্রাকে রক্ত কৌষেয় বস্ত্র পরিয়ে তাড়াতাড়ি গোপবধূর বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কুন্তী পরম সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রা প্রথমে কুন্তীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিলেন। তারপর

ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষ্যাহমিতি চাব্রবীৎ। (আঃ)
২২০।২১

—দ্রৌপদীকে প্রণাম করে তিনি বললেন—আমি তোমার দাসী।

সুভদ্রার উপরোক্ত আচরণে তাঁর বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্রৌপদী সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শত্রু না থাকে। সুভদ্রা দ্রৌপদীর অনুগতা ছিলেন। দ্রৌপদীও তাঁকে প্রীতির ও স্নেহের চোখে দেখতেন।

যথাকালে সুভদ্রার সুদর্শন মহাবীর পুত্র অভিমন্যু জন্মগ্রহণ

করলেন। পাণ্ডবদের বনবাসের সুদীর্ঘ সময় পুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সহ সুভদ্রা তাঁর পিত্রালয়ে বাস করছিলেন।

বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহের সময় কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদের শিবিরে অবস্থান করছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হলে অর্জুন কৃষ্ণকে তাঁর ভগ্নী সুভদ্রাকে ও বধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দিতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ—

বীরসূর্বীরপত্নী ত্বং বীরজা বীরবান্ধবা।
মা শুচস্তনয়ং ভদ্রে গতঃ স পরমাং গতিম্॥ (দ্রোঃ ৭৭।১৭

—তুমি বীর জননী, বীর পত্নী, বীর কন্যা, বীরের বান্ধবা অর্থাৎ ভগ্নী। তুমি পুত্রের জন্য শোক কর না। তোমার পুত্র উত্তম গতি লাভ করেছে।

সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিরূপ অন্যায় ভাবে অভিমন্যুকে বধ করা হয়েছে কৃষ্ণ তা বর্ণনা করে বললেন, রাত্রি প্রভাতে দিন হলেই জয়দ্রথ তাঁর বন্ধু বান্ধব সহ তাঁর কাজের ফল পাবেন। জয়দ্রথের শিরচ্ছেদ কচ্ছি। অতএব ভগ্নি, তুমি শোক করো না। আমরা ক্ষত্রিয়েরা যা পেতে ইচ্ছা করি, তোমার পুত্র সেই পরম গতি লাভ করেছে। অতএব তুমি তার জন্য চিন্তা বা শোক করো না।

জনার্দন সুভদ্রাকে পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দিতে বললেন এবং আগামী কাল এক আনন্দ সংবাদ তাঁরা শুনবেন এবং শোক শূন্য হবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু তবু পুত্রহারা জননীকে শোক হতে কেউ নিবৃত্ত করতে পারলেন না। শোকে অভিভূত সুভদ্রা কেঁদে কেঁদে বললেন—

হা পুত্র মম মন্দায়াঃ কথমেত্যাসি সংযুগে।
নিধনং প্রাপ্তবাংস্তাত পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ॥ (দ্রোঃ)
৭৮।২

—হা পুত্র, হা বৎস অভিমন্যু, তুমি এই অভাগিনীর গর্ভে এসে পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপে নিহত হলে?

পুত্রহারা জননীর মন কোন প্রকার প্রবোধ না মেনে ব্যাকুল ভাবে বিলাপ করতে থাকে। অভিমন্যুর ভুবন মোহন রূপের বর্ণনা করে সুভদ্রা বিলাপ করতে থাকেন এবং খেদ করে বলেন, অভিমন্যুর নীল পদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুন্দর দন্তে শোভিত মনোহর নয়ন যুক্ত বদন রণক্ষেত্রের ধূলি ধূসরিত হয়ে কি রকম দেখাচ্ছে? হে পুত্র! তুমি বীর, তোমার শির গ্রীবা, বাহু ও স্কন্ধাদি সব অঙ্গই অতীব সুন্দর, বিশাল তোমার বক্ষ, উদর নত সর্বাঙ্গ তোমার মনোহর, তোমার নয়নযুগল অত্যন্ত মনোহর এবং তোমার সমস্ত দেহ অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত। এইভাবে তুমি পতিত আছ এবং পৃথিবীর সব প্রাণী উদিত চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে দেখছে।

পুত্রের বর্তমান শয্যার সঙ্গে পূর্বকার শয্যার তুলনা করে সুভদ্রা আক্ষেপ করে কেঁদে কেঁদে বললেন, তোমার শয্যা বহু মূল্যবান আস্তরণে ঢাকা থাকত এবং এমন সুখ ভোগকারী হয়েও বাণবিদ্ধ হয়ে তুমি আজ ভূতলে শুয়ে আছ। যে বীরশ্রেষ্ঠের পাশে পূর্বে সুন্দরী রমণীরা অবস্থান করতো আজ তাকে শৃগালেরা ঘিরে বসে আছে (সোহদ্য শিবাভিঃ পতিতো মৃধে)। যাকে পূর্বে সূত ও মাগধ বন্দীরা স্তুতি করত তাকে আজ বিকট গর্জনকারী ভয়ঙ্কর মাংসাশী জন্তুগণ উপাসনা করছে। (উপাস্যতে)।

ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্পার্থস্য ধনুষ্মতাম্।
ধিগ্ বীর্যং বৃষ্ণিবীরাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ ধিগ্ বলম্॥
(দ্রোঃ ৭৮।১২

—ভীম সেনের বলকে ধিক্, অজুনের ধনুর্ধারণকে ধিক্, বৃষ্ণি বংশীয় বীরদের পরাক্রমকে ধিক্ এবং পাঞ্চাল সৈন্যদের শক্তিকে ধিক্।

এ দুর্ধর্ষ বীরমণ্ডল তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না। তুমি স্বপ্ন লব্ধ ধনের মত দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলে। মানুষের জীবন—জল বুদ্‌বুদের ন্যায় চঞ্চল। তোমাকে দেখতে না পেয়ে সমস্ত পৃথিবী আজ শূন্যা ও শ্রীহীনা মনে হচ্ছে।

বৎস, তুমি তৃষ্ণার্ত্ত তোমাকে দেখে দেখে অতৃপ্তা ও এ মন্দ ভাগিনীর কোলে বসে দুগ্ধপূর্ণ এ স্তনদ্বয় পান কর। (এহ্যেহি তৃষিতো বৎস স্তনৌ পূর্ণৌ পিবাশু মে অঙ্কমারুহ্য মন্দায়া হ্যতৃপ্তায়াশ্চ দর্শনে॥)

তোমার তরুণী স্ত্রী তোমার বিরহে কাতরা হয়েছে। সে বৎসহীন গাভীর ন্যায় ব্যাকুল। আমি কি বলে তাকে ধৈর্য ধারণ করাব (সন্ধারয়িষ্যামি)।

হে পুত্র যখন তোমার পুত্রলাভের সময় আগত তখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। কালের গতি অতিশয় জ্ঞানীগণের ও দুর্বোধ্য। নচেৎ কৃষ্ণের মত রক্ষক বিদ্যমান থাকতে রণাঙ্গণে তুমি অনাথের মত মৃত্যুর অধীন হলে।

নূনং গতিঃ কৃতান্তস্য প্রাজ্ঞৈরপি সুদুর্বিদা
যত্র ত্বং কেশবে নাথে সংগ্রামেঽনাথবদ্ধতঃ ॥ (দ্রোঃ)
৭৮।২০

অতঃপর সুভদ্রা কেঁদে কেঁদে পুত্রের সৎগতি ও শুভগতি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

সুভদ্রার বিলাপের মধ্যে শোকার্তা জননীর হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে।

যখন সুভদ্রা ব্যাকুলভাবে কাঁদছিলেন, কখনও বিহ্বলা হয়ে কাঁপছিলেন বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হচ্ছিলেন, তখন ভগ্নির এই অবস্থা দেখে

কৃষ্ণ সুভদ্রার চোখে মুখে জল দিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, তুমি উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। অভিমন্যু সর্বশ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেছে।

অশ্বত্থামার অস্ত্রে সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা বিলাপ করে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। এখানে দেখা যাচ্ছে সুভদ্রা কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রূপে জানতেন। অবশেষে পরিক্ষিৎ জীবন লাভ করেন।

আশ্রমস্থিতা শাশুড়ী কুন্তীকে দেখতে সুভদ্রাও দ্রৌপদীর অনুগমন করেছিলেন। এবং তথায় ব্যাসদেবের কৃপায় পরলোকগত পুত্র অভিমন্যুকে দেখতে পেয়েছিলেন।

হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্তির পঁয়ত্রিশ বৎসর পর দ্রৌপদী সহ পঞ্চ-পাণ্ডব মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করে পরিক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে ও যদুবংশীয় বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠির সুভদ্রার উপর তাঁদের রক্ষার ভার দিয়ে ধর্ম পথে থাকতে উপদেশ দিয়ে মহাপ্রস্থান করলেন।

সুভদ্রা চরিত্রটিও মহাভারত মহাকাব্যে উপেক্ষিতা বলা যেতে পারে। সমস্ত মহাভারত দ্রৌপদীর প্রাধান্যের সাক্ষ্য বহন করে। সুভদ্রা যেন তাঁর পাশে নিষ্প্রভ।

তের বছরের জন্য দ্রৌপদী স্বামীদের সঙ্গে বনে গমন করে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। (জয়দ্রথ, কীচক প্রভৃতি হতে)। মহাপ্রস্থানেও দ্রৌপদী স্বামীদের অনুগমন করবার সুযোগ লাভ করেন কিন্তু সুভদ্রাকে কোথাও স্বামীর অনুগমন করতে দেখা যায়নি।

যুদ্ধ সম্বন্ধে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে উত্তেজিত করেছেন। দূত কৃষ্ণকেও তিনি তাঁর লাঞ্ছনার কথা জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গে সুভদ্রার মতামত কোথাও প্রকাশ পায়নি। সর্বত্র তিনি নীরব। অর্জুনের অন্যতম সহধর্মিনী ও কৃষ্ণের ভগ্নি বীর প্রসবিনী সুভদ্রাকে একেবারে নীরব দেখা যায়।

সুভদ্রার ভূমিকা এই বিরাট মহাকাব্যে এতই নগণ্য যে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দ সম্ভবত ভুলে যেতেন যদি না বীর অভিমন্যুর অকাল মৃত্যু না ঘটতো।

মহাপ্রস্থানের পথে গমনের পূর্বে যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে উপদেশ দিয়া গেলেন। তাঁর উপর গুরু দায়িত্বও রেখে গেলেন। কিন্তু স্বামী অর্জুনের প্রেমময়ী সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি কি কিছুই কর্ত্তব্য বা বক্তব্য ছিল না ?

কবি বেদব্যাস ও কবি কাশীদাসের মহাভারতে সুভদ্রা চরিত্রটি উপেক্ষিত হলেও বাংলার অন্যতম কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর কুরুক্ষেত্র রৈবতক গ্রন্থে তাঁকে যোগ্য সমাদর দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কেবল কবির সমবেদনাই প্রকাশ পায়নি, তাঁর নিভৃত ব্যথার সঙ্গে সুভদ্রার নেপথ্য ভূমিকার উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে যদিও কবি নবীনের চিত্রিত সুভদ্রাকে পাঠকেরা দেখতে পান না তবু বীর ভ্রাতা, বীর পুত্রের উপযুক্ত মহিয়সী নারীর যে চিত্র আমরা নবীনের কলমে পাই, তা-ই যেন সুভদ্রা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি।

কবি নবীন সেনের কল্পনায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুমূর্ষু পিপাসার্ত এক সৈন্যকে অভিমন্যু জল দিলে সৈনিক বলেছিল—

"এমন না হবে কেন, অভিমন্যু তুমি পুত্র
আমাদের মাতা সুভদ্রার।

সামান্য সৈনিকের এই উক্তিটির মধ্যেই সুভদ্রা চরিত্র পূর্ণ প্রসারিত হয়েছে। সুভদ্রা অভিমন্যুকে বলছেন—

... ... তুচ্ছ ভদ্রা, সুলোচনা,
জগতজননী মা তোমার।

মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বুকে দেখিয়া তাঁহার মুখে
পরিপূর্ণ অখিল সংসার,

ঢালিও এ প্রেমধারা তখন দেখিবে মাতা
দুই নহে, অসংখ্য তোমার।"

সুভদ্রা সন্তানকে দেশ প্রেমের প্রথম পাঠ দিলেন—দেশকে মাতৃরূপে দেখতে হবে। সুভদ্রা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা।

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় পড়ে অভিমন্যু সুভদ্রাকে বলছেন—

বুঝিলাম এতদিনে, না হয় প্রবৃত্তি মম
কেন এই মহাযুদ্ধে? যথায় ক্ষত্রিয়গণ
জগতের এক ক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত,
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কারুর এত!
কেন সিংহ শিশু আমি, শুনি বীর সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম। ... ...
... ...
... ... পিতার করুণ হৃদয় মম,
কেন করিছেন বল এই মহাপাপ রণ?
স্বয়ং নারায়ণ কেন, হইয়া সারথি তাঁর,
করিছেন এইরূপে সংহার মা! এ সংসার?"

এ স্থানে কবি নবীন সেনের 'রৈবতক' গ্রন্থে রুক্মিণী ও সত্যভামার সংলাপ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সুভদ্রার চরিত্র বিশ্লেষণ করে রুক্মিণী বললেন—

"তাহা বড় মিথ্যা নয়, ভগিনী ভ্রাতার মত,
কি পবিত্র উভয় হৃদয়।
উভয় অমৃত ভরা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
কি মহিমা কি দেবত্বময়!!
সুভদ্রা রমণী-কৃষ্ণ রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি,
সব্যসাচী যোগ্য পতি তার।"

এই জন্য অভিমন্যুর প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রা বলতে সমর্থ হলেন—

"ভক্তি ভরে পড় বৎস। এই গ্রন্থ জ্ঞানাধার,
বুঝিবে রহস্য তুমি পাইবে উত্তর তার।"

অভিমন্যু তখন একাগ্র চিত্তে ভগবদ্‌গীতা পাঠ করতে লাগলেন।

"সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল, পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্ত্বরাশি,—
নিত্য, সত্য, সনাতন,—ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি।"

কবি নবীন যেন দ্রৌপদীর সমভাবে সুভদ্রাকে ধার্মিকা, শাস্ত্রজ্ঞা বিদুষী রূপে চিত্রিত করেছেন।

অভিমন্যু আবার জননীকে প্রশ্ন করলেন—
"এক কৃষ্ণ রূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,
অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট পুরুষবর।
... ...
... .. বিরাট শব্দ হইতেছে বিচূর্ণিত।
স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্টি, স্থিতি, লীন, দেহে, জলে জলবিম্ব মত।
অনন্ত করাল মূর্তি করিছে বিশ্ব সংহার,
উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার।
করুণানিধান কৃষ্ণ, মা গো! জগন্নাথ হরি,
কেন নাশিছেন বিশ্ব এ ভীষণ রূপ ধরি?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধ্বংসের এক বিকট ও ভয়ঙ্কর ছবি দেখে পুত্র শিউরে উঠলে, জননী সুভদ্রা কি সরল ও সুন্দর ভাবে পুত্রের এই শিহরণকে দূর করলেন—

"অদ্বিতীয়, সর্বময়, সর্বভূত-মূলাধার
যদি বৎস! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তব রূপ তাঁর।

জ্ঞানাতীত 'বিশ্বনাথে' মানবের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস। সোপান দ্বিতীয় আর।
দেখিলে এ বিশ্ব রাজ্য! অভিন্ন চেতনে জড়ে,
নির্মম সংহার নিত্য সর্বত্র নয়নে পড়ে।
নহে নির্দ্দয়তা, বৎস! ধ্বংস নীতি দয়াধার।
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!
রুদ্ধ কর ধ্বংসদ্বার; মুহূর্ত্তেতে জীবগণ
অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ
দারুণ যন্ত্রণাভোগ! মাগিবে দয়া মৃত্যুর
কাতরে, সলিল যথা মরু-দগ্ধ তৃষ্ণাতুর।
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার, অধর্মের অভ্যুত্থান
করিবে, ভারত মত, জগতে মহাশ্মশান।
কৌরবের লোভ হ'তে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার,
ধ্বংস বিনা বল, বৎস! আছে কি উপায় আর?
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল।
নির্লিপ্ত পরম ব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতি চক্রে বিচরণ।
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা, সৃষ্টি তথা সংখ্যাতীত
হতেছে মুহূর্ত্তে, স্থিতি এরূপে হয় সাধিত।
সর্বভূতহিত তবে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয়;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময়।
ধ্বংসনীতি ধর্মনীতি, ধ্বংস রূপী নারায়ণ।
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধ এই রণ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টকে রক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল সুভদ্রা সুন্দরভাবে পুত্রকে তা বুঝিয়ে দিয়ে অভিমন্যুকে প্রশ্ন করলেন—

বুঝিলে কি অভিমন্যু!—অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।
কল্প ক্ষয়ে সর্বভূত তাঁহার প্রকৃতি পায়;
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায়।
এইরূপে চরাচর জন্মি জন্মি হয় লয়;
সৃষ্টি স্থিতি. লয়, বৎস। এরূপে সাধিত হয়।"

ভ্রাতা কৃষ্ণ স্বামী অর্জুনকে যেভাবে গীতার কর্মফলের ব্যাখ্যা করেছিলেন সুভদ্রাও ঠিক সহজ সরল ভাবে পুত্রকে তা বুঝিয়ে বললেন—

"স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম সনাতন।
ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম নিষ্কাম যে কর্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত।
সর্বভূতস্থিত ব্রহ্ম, সাধ সর্বভূত—হিত।
হইবে তোমার কর্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত।
জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দু হিত,
জগতের হিত বৎস। তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত,
জগতের হিত করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম কর পালন,
এইরূপে কর্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।
... ...
জগতের হিতে সাধি স্বধর্ম মোক্ষ পরম।

বীরত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার ;
ধর্মযুদ্ধ হতে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।
সুখে দুঃখে অনাসক্ত, লাভালাভে জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি বৎস। যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
বুঝিলে কি অভিমন্যু! গীতামৃত করি পান,—
নিবারিতে ধর্ম গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান ;
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন ;
স্থাপন করিতে বৎস! জগতে ধর্ম-সাম্রাজ্য,—
এই মহারণ ?"

অভিমন্যু যোগ্যা জননীর প্রশ্নোত্তরে বললেন—

"... ... বুঝিনু আমার
মাতা দেবী, পিতা দেব, মামা নারায়ণ,
বুঝিলাম ক্ষুদ্র শুক্তি জন্মে রত্নাকরে ;
কুফল অশ্বত্থে, বটে ; তৃণ মহীধরে।
দিলে আজি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্ঠধর,
শিরে দিয়া দুই হাত আশীর্বাদ কর,—
স্বধর্ম পালন মা গো। করি প্রাণদান,
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।"

এইভাবে সুভদ্রা বীর পুত্র অভিমন্যুকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করলেন, আশীর্বাদ করে সুভদ্রা বললেন—

"লও আশীর্বাদ—করি স্বধর্ম পালন।
গীতার সাম্রাজ্য কর জগতে স্থাপন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, অর্জুন তনয়,
তোর মাতা—হ'ক মম এই পরিচয়।"

সুভদ্রার পক্ষে এটাই শ্রেষ্ঠ গৌরব তিনি অভিমন্যুর জননী।

অন্যত্র কবি নবীন সেন সেবাব্রতী সুভদ্রার একটি অপূর্ব চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—নাগবালা ঋষিপত্নী জরৎকারু যখন প্রশ্ন করলেন—

"কেমনে আমি আসিনু এখানে ?"

সুভদ্রা উত্তর দিলেন—

হত ও আহতদের করিয়া সৎকার সেবা,
ভীষ্মদেব পাদপদ্ম করি প্রদক্ষিণ,
শিবিরে যাইতেছিনু ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন,
দেখিলাম আঁধারে কি হইল পতন।
কাছে গিয়া দেখিলাম নিরাশ্রিতা লতা মত
রয়েছ ভগিনি! তুমি পড়িয়া ধরায়—
মূর্ছিতা, ধূলি-লুণ্ঠিতা ; দয়াময় ভ্রাতা মম
তোমায় লইয়া-অঙ্কে আনিলা হেথায়।
'ভ্রাতা কে ?' - জিজ্ঞাসে কারু। কহে ভদ্রা—বাসুদেব!

অনার্যা জরৎকারু যখন সুভদ্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, তখন—

'সে কি কথা —কহে ভদ্রা—মূর্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া ?
একটি হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া ?"

উত্তরে জরৎকারু আক্ষেপ করে বললেন—

"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্যা, আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্যার!
পশু, পক্ষী, যেই দয়া পায় আর্যদের কাছে,
আমরা অনার্য নাহি পাই বিন্দু তার।

… … …

মানব তাহারা নহে যদি নাথ। তবে কেন
এক রূপ রক্ত মাংস করিলা সৃজন?
কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?"

আজ ভারতের নগরে গঞ্জে অস্পৃশ্যতা বর্জনের যে ধুয়া উঠেছে কবি নবীন বহুকাল পূর্বে সুভদ্রার মুখ দিয়ে তার কি সুন্দর অকাট্য যুক্তি রেখে গেছেন—

"না বোন! অনার্য; আর্য্য—কহিতে লাগিলা ভদ্রা—
একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়,
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের
এক আত্মা; এক জল, ভিন্ন জলাশয়।
স্থান—ভেদে, কাল ভেদে, কর্মভেদে জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্মল,
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল,
মানুষের যে গুণবলে অন্য জীব হতে শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মনুষ্যত্ব এই গুণচয়
করিছে ধারণ, ভগ্নি! উহাই মানব ধর্ম,
সে গুণের মহাদর্শ সর্ব বিশ্বময়
বিরাজিত নারায়ণ, অনন্ত, অপরিজ্ঞাত।
আমরা মানব ক্ষুদ্র নৌকাযাত্রীগণ,
ভাসি এই গুণ স্রোতে, চলেছি অনন্ত পথে;
এই যাত্রা মানবের ধর্ম সনাতন।
যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর
এই মহাধর্ম-পথে, তত নিরমল
আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধর্ম—মনুষ্যত্ব;
এই মনুষ্যত্বে নর বিভিন্ন কেবল।

এই ধর্মে, মনুষ্যত্বে, আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠতর
অনার্য হইল হীন এই হীনতায়।
তথাপি আর্য্যের ধর্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার
জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায়!

নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ, তীক্ষ্ণ অসি দুই ধার,
অপরের প্রতি তুমি কর সঞ্চালন,
পাবে তুমি প্রতিঘাত,—প্রতিঘাত কি ভীষণ!—
দেখ তার সাক্ষী এই কুরুক্ষেত্র রণ।

মানুষ মানুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে
উভয়েই মনুষ্যত্বে হয়েছে পতিত।
প্রস্তরে ও পরস্পরে আঘাতিলে, দেখিয়াছ
কেমন উভয়ে হয় চূর্ণিত, ধ্বংসিত।

ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! ঘৃণিয়া অনার্য্যগণে,
আজি পরস্পরে ঘৃণা করিছে কেমন
ওই দেখ আর্যজাতি। দেখ মহা আত্মহত্যা,
অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের পতন।

ঈশ্বর মঙ্গলময়। এই ঘোর অমঙ্গলে
কি মঙ্গল নীতি তাঁর আছে বিদ্যমান!
এই ঝটিকার শেষে কিবা শান্তি বিরাজিবে!
করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান!

অবতীর্ণ নারায়ণ! ভস্মিয়া অধর্ম যবে
এ মহাশ্মশান হায়! হবে নির্বাপিত;
প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় সুধাময়,
কি মহান্ ধর্মরাজ্য হইবে স্থাপিত!

তখন অনার্য আর্য্য··· ···
··· ··· ···

বুঝিবে মানবগণ সর্বজীবে নারায়ণ,
সর্বজীব-হিত মহাধর্ম নিরমল।
এই নব ধর্মে, ভগ্নি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে; স্বর্গে এই ধরাতল।"

জরৎকারু সুভদ্রার কাছে নিজের হৃদয় দ্বার উন্মেলিত করলেন। জরৎকারুর পরিচয় পেয়ে সুভদ্রা আশ্চর্যান্বিত হলে জরৎকারু বললেন—

ভগিনি! বলিতে আর পারিলে না পাপিনীরে।
গেল সুভদ্রার মুখ-লজ্জায় ছাইয়া।
"না না, ভগ্নি! পাপিনী যে তাকে সর্বাধিক ভাল
বাসি আমি, তার তরে কাঁদে এ মরম।
অনন্ত মানবধর্ম; কে পায় তাহার অন্ত,
কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম পালন?
... ...
তুমি আমি, কে আমরা? যিনি করিলেন সৃষ্টি।
তিনি করিবেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অনন্ত নক্ষত্র রাশি আকাশে ফুটিয়া ওই,
আপনার কি কামনা করিছে সাধন?
চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, তারা মস্তক পাতিয়া সদা,
মঙ্গল কামনা তাঁর করিছে পালন।

একটি ব্যর্থ হৃদয়ে সুভদ্রা আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছেন। উশৃঙ্খলতার স্রোতে তিনি ভেসে যেতে উপদেশ দেননি। বরং পার্থিব বস্তু সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়ে সুভদ্রা বোঝাতে চেয়েছেন স্রষ্টা আমাদের যে ভাবে চালাবেন, আমরাও সেই ভাবেই চলে থাকি! মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

সুভদ্রার সখী শৈলজা সুভদ্রাকে জানালো—

শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম দিয়া বিসর্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের ; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জয় গাণ্ডীব বল।

সুভদ্রা সখীর মুখে পুত্রের বিপদের সম্ভাবনার কথা শুনে নির্ভীক ভাবে উত্তর দিলেন।

অন্ধের সন্তান
হতভাগ্য কৌরবের, অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাই হায়! তারা গাণ্ডীবের বল
নহে শিশু অভিমন্যু। গাণ্ডীবের বল
জনার্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সনাতন,
জ্ঞান শৈল। ধর্ম যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী ; অভিমন্যুর জননী ?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী ?"

শৈলজা প্রশ্ন করলেন—

"ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,
একি ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ?"

বীর মাতা, বীর জায়া সুভদ্রার উত্তরও বীরোচিত হয়েছে। সুভদ্রা বীরাঙ্গনা বলেই এরূপ দৃপ্ত উত্তর দিতে, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা থাকলেও তাঁর বুক কাঁপেনি।

"ধর্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম, ধর্ম কেশরী-শিশুর।

ষোড়শ বর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি। ষোড়শ বর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী, ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্বান অঙ্গের ভূষণ।
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ।
কৃষ্ণ সুভদ্রার যত্ন যাইতেছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে

... ...

চক্ষুর নিমেষে ভস্ম হবে কুরুকুল।
আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই কর
করিয়াছি আশীর্বাদ বীর পুত্রে মম,
পালিয়া স্বধর্ম, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম রাজ্য করিতে স্থাপন।

সন্তানের জয় লাভ সম্বন্ধে বীর রমণী সুভদ্রার প্রত্যয় কি গভীর! কারণ তিনি জানতেন ধর্মযুদ্ধে তাঁর নন্দন তাঁর স্বামীর মত অজেয়! অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন—

"বড়ই কঠিন ধর্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের।
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী ; পুত্র না।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নয়, পতি বিশ্বেশ্বর।
সেই বসুন্ধরা আজি কি পাপ আধার!
মানব সমাজ আজি দুঃখ পারাবার।
দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,—
জগত আনন্দ রাজ্য, সুখ প্রস্রবণ।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি জানালেন পৃথিবী সুখের আকর।

দুঃখ বিধাতার নির্মম বিধান নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন—

কেবল মানব পথ-ভ্রষ্ট নিয়তির।
তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর!
মানবের সুখ পথে অধর্মের সৃজন
করিয়াছে মহাবল, করিতে দাহন
সে খাণ্ডব, জ্বলিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ,—
শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ।
সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক,
করি ধরাতলে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন;—
তবে শৈল ভাগ্যবতী! পুণ্যবতী আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার?

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। তার কর্মফলই তার দুঃখের কারণ। অধর্মের আশ্রয় নিয়েই মানুষ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। সুভদ্রা উদাহরণ দিয়ে জানালেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দুঃখও এই কারণে।

বীর জননীর উপযুক্ত কিশোর মহারথী অভিমন্যুকে কবি নবীন সেন কিভাবে চিত্রিত করেছেন তাও উপভোগ্য। যুদ্ধ যাত্রার প্রাকালে অভিমন্যু স্ত্রী উত্তরাকে বললেন—

"উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!
ষোড়শ বৎসর মম; সেনাপতি—পদে
করেছেন ধর্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্বাদ, গলে বীর বাঞ্ছনীয় হার।

দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার,
কোন ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে কোন ক্ষত্রিয়ার?

দে বিদায় হাসি মুখে! খেল্ ততক্ষণ
পুতুল লইয়া তোর; পুতুলের সনে
খেলিয়া আমার খেলা আসিব এখন।"

কিশোর অভিমন্যুর গর্ব মাত্র ষোল বছর বয়সে সেনাপতি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে বিরাট পাণ্ডব বাহিনীর। এমন গৌরব কদাচিৎ কোনও ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

কিন্তু উত্তরা স্বামীর এই মর্য্যাদায় আনন্দিত হতে পারেননি বরং তিনি জানালেন জীবন থাকতে তিনি সেদিনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বামীকে যেতে দেবেন না। প্রিয়জনরা সর্বদা অমঙ্গলের ইঙ্গিত পূর্বাহ্ণেই পেয়ে থাকে। হয়ত এই ক্ষেত্রে উত্তরাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বীর অভিমন্যুর স্ত্রী, মহাবীর অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা যিনি নিজেও কম বীর নন—তিনিই স্বামীকে বাধা দিতে লাগলেন।

অভিমন্যু উত্তর দিলেন—

"... ... একি কথা? বীরের দুহিতা,
বীরের বনিতা তুমি; এই কাতরতা
সাজে কি তোমার, পুত্রবধূ অর্জুনের?
ষড়যন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক সনে
করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিয়োজিত
ঘোরতর এদিকে, অস্ত্রগুরু দ্রোণ
অন্য দিকে চক্রব্যূহ করিয়া নির্মাণ
করিছেন মহারণ। শুন হাহাকার
করিছে পাণ্ডব সৈন্য। সঙ্কট ভীষণ
দেখিয়া পাণ্ডব—পতি করিলা বরণ

এই দাসে ; আজি আমি না করিলে রণ,
ধর্মরাজে বন্দী আজি করিবেন দ্রোণ।"

অভিমন্যু উত্তরার সামনে এক মহা সঙ্কটের ছবি তুলে ধরলেন এবং বললেন এখন যুদ্ধ না করলে দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন।

উত্তরা জানালেন এখনও পাণ্ডব পক্ষে অগণিত রথী মহারথী রয়েছেন। তাঁরা আজের যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন।

অভিমন্যু উত্তরাকে বুঝিয়ে বললেন দ্রোণের পরাক্রম একমাত্র পিতা অর্জুন ব্যতীত কেউই সহ্য করতে পারবেন না। তখন উত্তরা জিজ্ঞেস করলেন—

"করিবে কেমনে তুমি পরাভব তারে ?"

অভিমন্যু সদর্পে উত্তর দিলেন—

"অভিমন্যু আমি, আমি অর্জুন কুমার।
বাম করে শেল, অসি করি নিষ্কাসিত
অন্য করে, শিবিরের চারু গালিচায়
অসি অগ্রে চক্রব্যূহ করিয়া অঙ্কিত
দেখাইলা—বীর বক্ষ উৎসাহে পূরিত,—
কোন রূপে চক্রব্যূহ করিয়া ছেদন
পশিবেন দ্রোণ সৈন্যে। ... ...
... ...

এইরূপে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,
লঙ্ঘে যথা সিংহ-শিশু ব্যাধের বন্ধন।
কিম্বা লঙ্ঘি অবরোধ মেষ পালকের
পশে যথা মেষ পালে কেশরি কুমার,
প্রবেশিব কুরু—সৈন্যে। দেখিবেন দ্রোণ
আজি রণে অগ্নি শিশু অগ্নি-পরাক্রম।

দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভুজ বিশাল
অর্জুনের, অর্জুনের এই বক্ষ মম,
প্রদীপ্ত পার্থের বীর্য্যে শোণিত আমার ;
এ ধনু গাণ্ডীব শিশু, এ তূণীর মম
অক্ষয় তূণীর-পুত্র, পূর্ণ বজ্র জালে,
অর্জুনের অস্ত্র-শিশু, বিষধর-শিশু
পিতৃসম তীব্র বিষধর, দেখিবেন দ্রোণ
এই ধনু, এ তূণীর, এই শরজাল,
অর্জুনের পরাক্রম অরাতির কাণে
পারে কহিবারে বজ্র নির্ঘোষে ভীষণ ;
পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষরে
অরাতির বুকে। নাহি থাকুন অর্জুন,
দেখিবেন দ্রোণাচার্য, অর্জুনকুমার
করিবে বিফল আজি প্রতিজ্ঞা তাঁহার
তুচ্ছ এক মহারথী, মহারথী দশ
হয় যদি হত আজি, তথাপিও দ্রোণ
ধর্মরাজ কেশাগ্রও ছুঁইতে কখন
নাহি পারিবেন। প্রিয়ে! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ
একে একে আজি রণে করি পরাজিত,
রাখিব ক্ষত্রিয় কুলে কীর্ত্তি অতুলিত।”

ভয় কম্পিত বক্ষে উত্তরা জিজ্ঞেস করলেন—

“কিন্তু সাত জনে যদি করে আক্রমণ?”

অভিমন্যু হেসে উত্তর দিলেন—

“এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম ; জাতিতে কেশরী
ক্ষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগালের
নহে কর্ম ক্ষত্রিয়ের। আসে সপ্ত জন,

আসে সপ্তদশ জন,—কি ভয় উত্তরে ?
একা সিংহ নাহি ডরে শিবা অগণন।"

অভিমন্যুকে আবার দেখা গেল স্বামীর মঙ্গল ব্রতে যখন পূজায় রত, তখন অভিমন্যু সবেগে প্রবেশ করলেন। অস্ত্রের ঝঙ্কারে সুভদ্রার ধ্যান ভঙ্গ হল। অভিমন্যু মাকে প্রণাম করে বললেন—

"মা ! দ্রোণাচার্য ঘোরতর রণ
করিছেন চক্রব্যূহ করিয়া নির্মাণ।
পিতার অবিদ্যমানে, সেনাপতি পদে
ধর্মরাজ এই দাসে করিলা বরণ।
দেও মা ! বিদায় রণে, কর আশীর্বাদ,
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অর্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা-তনয়,
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য। স্বধর্ম পালন
করি, ধর্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন।"

সুভদ্রা বীর পুত্রের বীর উক্তি শুনে, বীর জননী সমান দর্পে উত্তর দিলেন—

"বুঝিলাম হইয়াছে পাণ্ডব বাহিনী,
কৃষ্ণার্জুন বিনা, যেন বিপন্না তরণী
সিন্ধু গর্ভে ঝটিকায় নাবিক—বিহীনা।
হইয়াছে পাণ্ডবের মহা সৈন্য হায় !
যেন মহারথ রথি—সারথি বিহীন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, শিষ্য প্রিয়তম,
অর্জুনের পুত্র তুই, নিজে মহারথী,
নির্ভয়ে ধরিয়া কর্ণ, আরোহিয়া রথে,
হেলায় সমর সিন্ধু করি অতিক্রম,
আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার !

নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন
তোর জননীর মত ? ভ্রাতা নারায়ণ,
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী, ধর্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,
জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি ! শোভিছে তাহার
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক।"

এদিকে যেমন বীর পুত্রের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত হয়েছেন, অন্য দিকে মাতৃ হৃদয়ের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন—

পিতৃ গুরু দ্রোণ, অতি সাবধানে
বাছা রে ! করিস্ রণ।
না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।
করি আশীর্বাদ,— সুভদ্রার বুক
হইবে কবচ তোর ;
সুভদ্রার অঙ্ক হবে তোর রথ ;
শত্রু শরজাল ঘোর
হবে সুকুমার যেন সুভদ্রার
স্নেহ মাখা পুষ্পহার ;
হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অর্জুন,
লক্ষ্য নর-সমুদ্ধার।
সমর প্রাঙ্গন সয়ম্বর সভা
হইবে যাদু আমার !"

কবির লেখনীতে কি সুন্দর ভাবে সুভদ্রার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। মাতা পুত্রের অপূর্ব সংলাপ পাঠকের হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

গোপকন্যা সুলোচনা অভিমন্যুকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। তিনিও উত্তরার মত সেদিন যুদ্ধে যেতে দিতে অসম্মত হলে অভিমন্যু তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—

"অর্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা কুমার,
কৃষ্ণের ভাগিনা শিষ্য, কি ঘৃণা মা! তুই
ডরিস্ ব্রাহ্মণ দ্রোণে! ভাবিস কেমনে
সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্রোণে ফেলিবে উপাড়ি
এই শাল বৃক্ষ তোর পালিত বর্ধিত?
যাদব পাণ্ডব শক্তি, যমুনা জাহ্নবী;
মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি,
বহিতেছে এই ভুজে ধারা সম্মিলিত,—
দ্রোণের কি সাধ্য, গতি রোধিবে তাহার?
একা পার্থে, একা কৃষ্ণে, ডরে বৃদ্ধ দ্রোণ,
একাধারে কৃষ্ণার্জুন দেখিবেন আজি।
দেখিবেন পার্থ রথী, গোবিন্দ সারথী,
একাধারে মম রথে; এই ভুজে মম
দুর্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের।
তুচ্ছ দ্রোণ; বিশ্বজয়ী পিতা ও মাতুল
আসেন সমরে যদি, নাহি ডরি আমি।
একা পার্থ, একা কৃষ্ণ পারে জিনিবারে
ত্রিভুবন এক রথে, কে সহিবে তবে
কৃষ্ণ—পার্থ—সম্মিলিত পরাক্রম মম?
তুচ্ছ চক্রব্যূহ, ওই বালির বন্ধন,
উড়াইয়া মুহূর্তে মা! সিন্ধু—পরাক্রমে
প্রবেশিব দ্রোণ,—সৈন্যে মহা সিন্ধু বেগে
উদ্বেলিত, ভাসাইয়া বালি তৃণ মত

অরাতির অনীকিনী, রথী, মহারথী
দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য। করিব না আমি
পিতার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ। বধিয়া পরাণে,
মরণ অধিক যুদ্ধে হইয়া লাঞ্ছিত
পলাইবে দাঁতে তৃণ লইয়া কেমনে,
... ... হাসিবে জগত।

বেদব্যাস মহাভারতে বীর অভিমন্যুর সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, অভিমন্যুর উপরোক্তি অত্যুক্তি নয়—তাই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে কৌরবরা সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করলেন।

জননী সুভদ্রা বীরাঙ্গনা হলেও বাস্তবে তিনি মানবী, নারী। পুত্রকে যুদ্ধে মাতিয়ে তুলে নিজ কর্তব্য, বংশের কর্তব্য করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু রণে পুত্র নিহত হলে তখন মানবীর মন শোক ভারে নুয়ে পড়ল। পুত্রহারা সুভদ্রার শোকার্ত হৃদয়ের বিলাপ—

"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার।
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীষণাহবে
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?
... ...

সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।

এক নর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর।

বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ!
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার।

অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে শিখাইব নাম নিরমল ;

কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব-মঙ্গল "

সুভদ্রার কি অপূর্ব শোক গাথা! সন্তানের বীরত্বের গৌরব জননীর শোককে নিষ্প্রভ করেছে। শুধু তাই নয় সন্তান হারা মা বিশ্বের সব সন্তানের মধ্যেই খুঁজে পেলেন আপন বীর সন্তান অভিমন্যুকে, পুত্র হারা জননীর পুত্র স্নেহ বিশ্ব পুত্রদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। এ যেন সীমার মাঝে অসীমের স্পর্শ তিনি অনুভব করলেন।

সুভদ্রার এই উপেক্ষিত চরিত্রটিকে কবি নবীন সেন যেন পূর্ণ মর্য্যাদায় তাঁর ত্যাগ, প্রেরণা, উদারতা, সহিষ্ণুতার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন—যা মহাভারত পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট করবে।

সরমা, সুভদ্রা উভয়েই তেজস্বিনী, আত্মবিশ্বাসী, ধার্মিকা মহিলা। উভয়েই পুত্রশোকে শোকাতুরা। উভয়ের প্রতি স্বামীর উপেক্ষা সমান।

পুত্রহারা জননী সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দেবার ভার অর্জুন কৃষ্ণের উপর ন্যস্ত করলেন। অর্জুন নিজে একটি ও প্রবোধ বাক্য বললেন না। এটা কি অর্জুনের দুর্বলতা। কারণ তিনি নিজেও অভিমন্যু বধে কাতর হয়ে পড়ে ছিলেন। হয়ত তখন সুভদ্রাকে প্রবোধ দেবার ভাষা তাঁর ছিল না।

বিভীষণ রামের শিবিরে যাবার পূর্বে সরমার কাছে বিদায় নিয়েছিলেন কিনা কবি কিছুই জানালেন না। যুদ্ধ জয়ের পর বা অভিষেকের সময়ও সরমার প্রতি বিভীষণের কোনই কর্তব্য বা বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তেমনি বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে বা যুদ্ধ জয়ের পর বা মহাপ্রস্থানের পূর্বে অর্জুনের সুভদ্রার প্রতি কোন কর্তব্য বা বক্তব্যের বা বিদায় সম্ভাষণের তথ্য পাওয়া যায় না।

এই দুই মহাকাব্যের এই দুই বীর প্রসবিনী পুত্রহারা শোকাতুরা রমণীকে কেবল মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্যের জন্যই যেন কবি বাল্মীকিও কবি বেদব্যাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের যোগ্য মর্যাদা হতে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন।

দ্রৌপদী যখন তের বৎসর স্বামীদের সঙ্গে বনবাস যাপন করছিলেন, তাঁর পঞ্চ পুত্র সুভদ্রার সঙ্গে দ্বারকায় ছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে যাবার প্রাক্কালে পৌত্র পরীক্ষিৎ ও যদুবংশীয় বজ্রকে তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব দেওয়া হলো সুভদ্রার উপর, এটা হতে উপলব্ধি করা যায় যে কেবল মাত্র কর্তব্য সাধনের জন্যই যেন কবি সুভদ্রা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সুভদ্রা চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছিল কেবল মাত্র অভিমন্যুর জননী রূপে তাঁকে চিত্রিত করা।

সেরূপ বিভীষণ যখন রামের শিবিরে চলে গেলেন, সীতার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রাবণ তখনও সরমার উপর দিয়েছিলেন।

শত্রুর আশ্রয়ে থেকে সরমা স্বীয় পুত্রদের ও সীতার তত্ত্বাবধান করেছেন। সরমা চরিত্রটিও যেন সুভদ্রা চরিত্রের মত কেবল কর্তব্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল।

কর্তব্য সমাপান্তে সুভদ্রা ও সরমার পরবর্তী জীবনে কি ঘটেছিল কবিদ্বয় পাঠকদের সেই সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে রেখেছেন।
